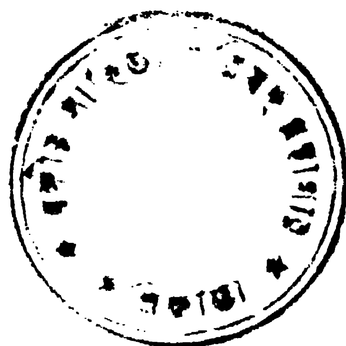


দ্বিম
১৪৬
মূল্য
আনা

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী


"তোমার কাছে গোপন কিছু নাই
তোমার পূজায় সাহস এত তাই
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি
অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ"
'সুষমা'
তেলই
আধুনিক
রুচি

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষাণ্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাকখরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতিমাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা
ফোন : কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

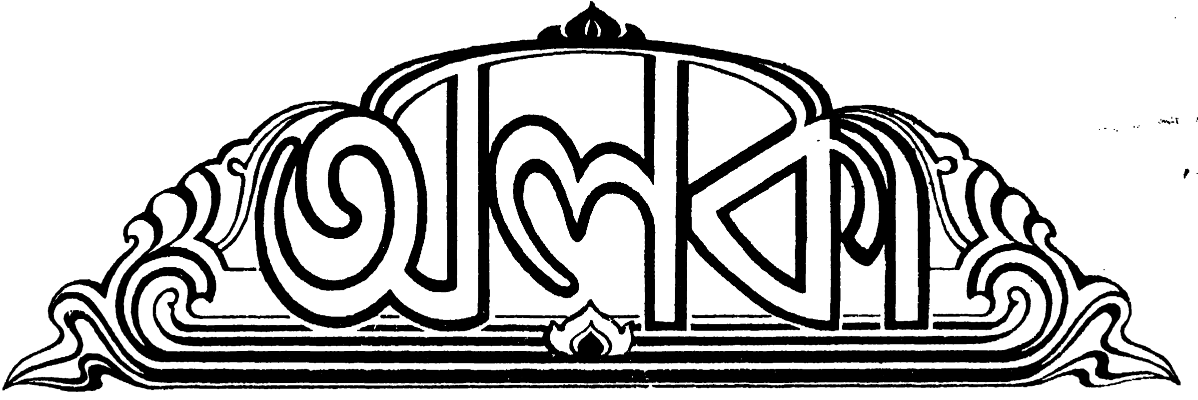
সূচী

আশ্বিন ১৩৪৬





শিবাজী ও রামদাস শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী



দ্বিতীয় বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৬ { প্রথম সংখ্যা

পাপীয় দিবস

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সংস্কৃত ভাষায় মধ্যে মধ্যে এমন কতকগুলি শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের শক্তি ও সৌন্দর্য্য যুগে যুগে মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ইংরাজিতে যে এ ধরণের শ্লোক পাওয়া যায় না, তার কারণ অল্প কথায় অনেক কথা বলবার কৌশল classical সাহিত্যের যেমন ছিল, বর্ত্তমান সাহিত্যের তেমন নেই। ভাষা সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা classical সাহিত্যের প্রধান গুণ। বাচালতা হচ্ছে একালের লেখকদের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বেশির ভাগ বিলেতী লেখকদের।

এই জাতীয় একটি শ্লোক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত আছে। আনন্দ-বর্দ্ধনাচার্য্য বলেন—শ্লোকটি "মহর্ষের্ব্যাসস্য।" এ শ্লোকটির সাক্ষাৎ আমি সম্প্রতি মহাভারতের আদিপর্ব্বে পেয়েছি; এবং এ স্থলে সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ প্রত্যুপস্থিতা দারুণাঃ।
শ্ব শ্ব পাপীয়দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা॥"

অস্যার্থ,—সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, দারুণ কাল উপস্থিত। দিনের পর দিনগুলি সব পাপীয় দিবস। এক কথায়, পৃথিবী এখন গতযৌবনা।

এই কি আজকের দিনের প্রকৃত অবস্থা নয়? আর বর্ত্তমানের যথার্থ অবস্থার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা আর কি হ'তে পারে? পৃথিবী "গতযৌবনা,"—ঐ একটি বিশেষণেই আমাদের কালের বিশ্রী রূপকে প্রকাশ করেছে।

(২)

আমাদের, এমন কি সমগ্র মানবজাতির যে দারুণ কাল উপস্থিত, এ জ্ঞান আমার অনেক দিন থকেই হয়েছে। গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তার প্রমাণ

জগৎজোড়া economic depression এবং বঙ্গোপসাগরের depressionকে যেমন আমরা ধমকে দূর করতে পারি নে, এ ইকনমিক depression দূর করাও প্রায় তাদৃশ দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য বলছি এই জন্যে যে, ইউরোপে ইতিমধ্যে অসংখ্য economics-এর বই লেখা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্বমানবের গোলা ধানে ভরে ওঠে নি। প্যাটরাও বস্ত্রপূর্ণ হয় নি। মানুষের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কারণ নাকি অন্নবস্ত্রের হ্রাস নয়,—অতিবৃদ্ধি। ইংরাজীতে যাকে বলে Poverty amongst Plenty—এর কোন প্রতিকার আছে কি?—ধনী সম্প্রদায় বলেন,—ফসলের জন্মনিরোধ কর। এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, কেন না আমি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Economics-এর M. A. নই। আর যদি হতুম, তাহলেও নীরব থাকতুম। কারণ এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে সুরু করলে সাহেবলোকে বলত,—মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসি পড়ে তাঁতি। তবে এ দারিদ্র্য যে গত যুদ্ধের কুফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩)

বোধ হয় এ দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার পাবার এক মাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধ। গত যুদ্ধে যে ক্ষতি করেছে, আগামী যুদ্ধে তা' পূরণ করবে। বিষস্য বিষমৌষধং, এ কথা তো সেকেলে চিকিৎসাশাস্ত্রের মহাবাক্য, একালেরও তাই। Auto-vaccine-এর অর্থ কি?

সে যাই হোক, আগামী যুদ্ধের মূলে যে ধনলিপ্সা আছে, তা বলা বাহুল্য। যদি ধরে' নাও যে তা' নয়, নিষ্কাম ধর্ম্ম হিসাবেই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছে,—তাহলে তো ব্যাপার আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এই আসন্ন যুদ্ধের ফলে যে মানবজাতির সর্ব্বনাশ হবে, এ ভয় আমি পাই। যুদ্ধকালে ভয় সকলেই পায়,—বিশেষতঃ এই বোমাবৃষ্টির যুগে। এমন কি, যোদ্ধারাও বোধ হয় পায়।

গত যুদ্ধ হয়েছিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। এবার কিন্তু অনেক দিন থেকেই পৃথিবীর পলিটিকাল আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, সুতরাং যে কোন দিন বজ্রপাত হতে পারে, এ ভয় পাবার জন্য কোনরূপ দিব্য দৃষ্টি থাকবার প্রয়োজন নেই। অনেকের যেমন ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাস নেই, আমি তেমনি জাতীয় অমরতায় বিশ্বাসহীন। আমি অদম্য optimist নই।

(৪)

আগামী যুদ্ধের মূল দুর্ব্বার ধনলিপ্সাই হোক, আর রণলিপ্সাই হোক, এ যুদ্ধ দু'চারদিন মুলতবি থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধ কিছুতেই হবে না। ইউরোপীয় সভ্যতা যখন আত্মহত্যার জন্য লালায়িত হয়েছে, তখন সে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। লোকের মন যখন অধঃপাতের দিকে ঝোঁকে, তখন তার মুখের কথা কেতাদুরস্ত হলেও, তার মতিগতি উজান বয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও কেউ স্থগিত করতে পারেন নি, যদিও কুরুবৃদ্ধদের এ যুদ্ধে অমত ছিল। ঋষিদের ধর্ম্মোপদেশ, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছিল; শান্তির স্বপক্ষে আজ যে-সব কথা বলা হচ্ছে, সেকালেও সে-সব কথা বলা

হয়েছিল ; কিন্তু কোনও ফল হয় নি। আজও হবে না। ভালমন্দের জ্ঞান দুদিন আগে জন্মায় নি; আজ শুধু সে জ্ঞান নষ্ট হতে বসেছে।

আজ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর। আজও বজ্রপাত হয় নি, কিন্তু পৃথিবীর আকাশ বাতাস electricity-তে পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় শুনতে পাই চতুষ্পদ পশুরা অস্বস্তি বোধ করে। আর আজকাল দ্বিপদ ও চতুষ্পদে তফাৎ তো দু' পা মাত্র। তাই আকাশ যে আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে না, এ ভরসা আমি পাচ্ছি নে।

(৫)

মিউনিকের আপোষ-মীমাংসার পিঠপিঠ আমি "শান্তি না শাস্তি" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, সেটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তার পরেই আমি আর একটি প্রবন্ধ লিখি, যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে রাসিয়ার সন্ধির প্রস্তাব করি। আমার ধারণা ছিল যে, Bolshevism-এর গতি হচ্ছে ভবিষ্যৎ ডিমোক্রাসির দিকে। অবশ্য ইংলণ্ডে আজ যে ডিমোক্রাসি আছে, তার সংশোধিত সংস্করণ। সে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করিনি, কারণ বই পড়ে রাসিয়ার বর্ত্তমান হালচাল ঠিক বোঝা যায় না। অতএব সে বিষয় নীরব থাকাই শ্রেয়।

সম্প্রতি Chamberlain কিছুকাল ধরে রাসিয়ার সঙ্গে গুফ্‌তগু করেছিলেন, সে কথোপকথনের ফলে দেখলুম যে Stalin-এর সঙ্গে Hitler-এর সন্ধি হয়ে গিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। যদিও Bolshevism-এর সঙ্গে Nazism-এর অনেক মিল আছে, তাহলেও Communism-এর মারাত্মক শত্রু হচ্ছে Fascism। ইতালি, জার্ম্মানি ও জাপান, এই তিন শক্তি হাতে মিলিয়ে Communism-কে ধ্বংস করে' পৃথিবীময় অধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই জার্ম্মানির সঙ্গে রাসিয়ার সখ্যের কথা শুনে মনে হয়েছিল—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

(৬)

আজ আবার শুনছি Soviet-এর মন্ত্রীসভা এ চুক্তিতে রাজি হন নি। আর যে যে কারণে রাজি হন নি, তার অন্তরে moral কারণও আছে। Art for Art কথাটি গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু politics for politics একটা সর্ব্বনেশে কথা। সে politics-এর অন্তরে morality-র সংস্রব নেই, সে পলিটিক্স তির্য্যকসামান্য।

এর থেকে অনুমান করছি যে, রাসিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির যদি কোনও মিটমাট না হয়, তাহলে 'যুদ্ধ বন্ধ' হলেও হতে পারে। কারণ রাসিয়ায় দেহও প্রকাণ্ড, শক্তিও বিপুল।

কিন্তু রাসিয়া যে এ সময় শান্তিরক্ষা করতে পারবে, এ আশা করা যায় না, কারণ আজকের দিন পাপীয় দিবস। তা ছাড়া রাসিয়ানরাও ইউরোপীয়, অতএব অবিশ্বাস্য।

সকালে যা অনুমান করেছি, বিকেলে শুনছি তা ঘটেছে।

আমি এ প্রবন্ধ ব্যাসদেবের একটি কথা দিয়ে আরম্ভ করেছি, এখন ব্যাসদেবের আর একটি কথা দিয়ে তা' শেষ করি। যখন কুরুপাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন :—

সামদানের দ্বারা বিজয় শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা বিজয় মধ্যম, আর যুদ্ধের দ্বারা বিজয় জঘন্য।

সুতরাং এ যুদ্ধে কে হারে কি জেতে তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যাপারটাই জঘন্য। এর পরে কি আসবে ?—পাপীয় দিবস।

অশোকাবদান

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

[সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দিব্যাবদান' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এ গ্রন্থের পুঁথি নেপাল হতে আবিষ্কৃত হয় এবং Cowell ও Neil নামক দুজন পণ্ডিতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'দিব্যাবদান' মূলতঃ বিনয় গ্রন্থ, 'মূল সর্বাস্তিবাদ' নামক এক প্রাচীন কাশ্মীরী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের অংশ বিশেষ। কিন্তু 'দিব্যাবদানে'র শেষভাগে এমন কয়েকটি অবদান সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঘনিষ্ট যোগসূত্র নেই। এ অবদানগুলি মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোক সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এ সব গল্পের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও আছে, একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। অশোকাবদান এই অবদানমালার শেষ ভাগ। এ অবদানের যথাযথ অনুবাদ করেছি, এই কারণে যে, তার মধ্যে রাজা অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপাদান থাক্ বা না থাক্, অন্ততঃ মানুষ অশোকের কিছু খোঁজ পাওয়া যায়। মূল অবদান অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তার কাব্যরস ক্ষুণ্ন হয় নি, তবে অনুবাদে তা কতটা রাখা সম্ভব হয়েছে, তা বলতে পারি না।]

মহারাজ অশোক ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে বুদ্ধশাসনে বেশী দান করেছে ?

ভিক্ষুরা বললেন, অনাথপিণ্ডদ নামক গৃহপতি।

অশোক জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধশাসনে তিনি কত দান করেছিলেন ?

ভিক্ষুরা বললেন, তিনি বুদ্ধশাসনে শতকোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করেছিলেন

একথা শুনে রাজা অশোক চিন্তাকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন, সে গৃহপতি হয়েও বুদ্ধশাসনে শতকোটি সুবর্ণ দিয়েছে।

তখন অশোক ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, আমিও বুদ্ধশাসনে শতকোটি দান করব।

এর পর অশোক চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করলেন, নানা স্থানে শত-সহস্র সুবর্ণ দান করলেন, জাতি-বোধি-ধর্ম্মচক্র ও পরিনির্বাণের উদ্দেশ্যে সর্বত্র শত সহস্র দান করলেন ও পঞ্চবার্ষিক অনুষ্ঠান করলেন। এই পঞ্চবার্ষিকেও চার শত সহস্র সুবর্ণ দান করলেন, তিন শত সহস্র সুবর্ণ ভিক্ষুদের ভোজন করাবার জন্য, এক শত সহস্র অর্হৎদের এবং দ্বিশত সহস্র শিক্ষার্থী এবং পৃথক্ জনদের কল্যাণের জন্য দান করলেন, এই রূপে তিনি ৯৬ কোটি সুবর্ণ বুদ্ধশাসনে দান করলেন। শতকোটি পূর্ণ হতে তখনও চার কোটি বাকী আছে, অথচ তিনি আর দীর্ঘকাল রাজা থাকবেন না বুঝতে পেরে চিন্তান্বিত হলেন।

তাঁকে এই ভাবে বিষণ্ন দেখে মন্ত্রী রাধগুপ্ত এসে অশোকের পদবন্দনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—

প্রবল শত্রুসংঘের দ্বারা পরিবৃত হলেও প্রচণ্ড দিবাকরের আভাযুক্ত যে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যেত না পদ্মাননের শত শ্রীর দ্বারা উদ্ভাসিত সে মুখে আজ উদ্বেগের চিহ্ন কেন ?

রাজা বললেন, রাধগুপ্ত, ঐশ্বর্য্যনাশ কিংবা রাজ্যনাশের জন্য যে আমি শোক করছি তা নয়, আমার অনুশোচনার কারণ, আমি আর্য্যদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি। মানুষ ও

দেবতাদের দ্বারা পূজিত, সর্বগুণোপপন্ন সংঘকে আমি আর যে উত্তম অন্নপানের দ্বারা পূজা করতে পারব না, সেই চিন্তাতেই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি।

রাধগুপ্ত, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বুদ্ধশাসনে শতকোটি মুদ্রা দান করব, কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার পূর্ণ হয় নি।

অতঃপর অশোক "চারকোটি পূর্ণ করব" বলে কুক্কুটারামে সুবর্ণ মুদ্রা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে কুণালের পুত্র সম্পদি যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁকে তাঁর অমাত্যেরা বললেন, অশোক রাজা অল্পকালই বাঁচবেন, অথচ তিনি সমস্ত সম্পত্তি কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কোষাধ্যক্ষকে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। এ কথা শুনে যুবরাজ ভাণ্ডাগারিককে নিষেধাজ্ঞা পাঠিয়ে দিলেন।

এই নিষেধাজ্ঞার পর কোষাধ্যক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পাঠান বন্ধ করে দিলেন। তখন যে সুবর্ণপাত্রে অশোককে খেতে দেওয়া হ'ত তিনি সেই সুবর্ণপাত্রই কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন, তারপর সুবর্ণপাত্র বন্ধ করে রৌপ্যপাত্রে খেতে দেওয়া হ'ল, অশোক সে রৌপ্যপাত্রও কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিলেন, যখন রৌপ্যপাত্র বন্ধ করে লৌহপাত্রে খেতে দেওয়া হল, অশোক সে লৌহপাত্রও কুক্কুটারামে পাঠালেন, তারপর অশোককে সমস্ত বন্ধ করে মৃৎপাত্রে অর্দ্ধ-আমলক ফল খেতে দেওয়া হ'ল। তখন অশোক উদ্বিগ্ন হয়ে সমস্ত অমাত্য ও পৌরজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন পৃথিবীর অধীশ্বর কে?

অমাত্যগণ আসন ত্যাগ করে উঠে রাজা অশোকের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে বললেন, দেব, আপনিই পৃথিবীর অধীশ্বর।

তখন অশোক সাশ্রুনয়নে শোকাতুরভাবে অমাত্যদের বললেন—

দাক্ষিণ্যবশবর্ত্তী হয়ে আপনারা মিথ্যা কথা কেন বলছেন? আমি এখন ভ্রষ্টরাজ্য। পরিশেষে এই অর্দ্ধ আমলকে আমার প্রভুত্ব পর্য্যবসিত হয়েছে। ধিক ঐশ্বর্য্য, আমার ন্যায় পৃথিবীর অধীশ্বরকেও বন্যার উদ্ধত নদীস্রোতের ন্যায় দারিদ্র্য অভিভূত করতে পারে।

অথবা ভগবান বুদ্ধের বাক্যকে লঙ্ঘন করে যে সমস্ত সম্পত্তি, তা' বিপত্তি ও বিনাশের কারণ। সত্যবাদী গৌতম যা বলেছেন তা অবিসংবাদী। এক সময়ে আমার আজ্ঞায় কেউ প্রতিরোধ পারত না, কিন্তু এখন মহান্ পর্বতশিলাতলের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত নদীর মত সে আজ্ঞা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে।

তখন আমি একাতপত্র পৃথিবীতে ছিলাম সকলের রক্ষক, গর্বোদ্ধত অরিগণের উচ্ছেদ করে দীনাতুরকে আশ্বস্ত করতে পারতাম, আর আমি এখন ভগ্নরথের ন্যায় আয়তনহীন। [শুনুন] কৃপণ অশোক নৃপতি এখন শোভাহীন, ছিন্ন, ম্লান এবং বিশীর্ণ পত্রকুসুমবিশিষ্ট অশোকবৃক্ষের মতই শুষ্ক হয়ে গেছেন।

তারপর রাজা অশোক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, ভদ্রমুখ, আমি ভ্রষ্টৈশ্বর্য্য বটি, কিন্তু পূর্বানুরাগবশতঃ আমার এই শেষ কার্য্য তোমাকে করতে হবে। এই অর্দ্ধামলক নিয়ে কুক্কুটারামে বৌদ্ধসংঘের নিকটে যাও, আমার পক্ষ হতে সংঘকে বন্দনা করে বলবে, জম্বুদ্বীপের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের যিনি ছিলেন রাজা, বর্ত্তমানে তাঁর এই হচ্ছে একমাত্র সম্পত্তি, এই শেষ দান তাঁরা যেন এমনভাবে ভোজন করেন, যাতে আমার এই সংঘদক্ষিণা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের বলবে—

আজ আমার এই দান শেষ দান, রাজ্য নাই, আরোগ্য, বৈদ্য, ঔষধ প্রভৃতি হতে বঞ্চিত আমার এখন আর আর্য্যসংঘ ব্যতীত আর কোন ত্রাতা নাই। সুতরাং এই শেষ দান তাঁরা এমনভাবে গ্রহণ করুন যাতে বিস্তীর্ণ সংঘ সে দক্ষিণার ভাগী হতে পারে।

'দেব, তাই হবে' বলে রাজা অশোককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্দ্ধামলক নিয়ে সেই ব্যক্তি কুক্কুটারামে গেল। সেখানে সংঘবৃদ্ধদের নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে সংঘকে সেই অর্দ্ধামলক দান করে বললে—

যিনি এক সময়ে একচ্ছত্রধারী হয়ে সমস্ত বসুমতীকে আজ্ঞাধীন করেছিলেন এবং মধ্যাহ্নের ভাস্করের মত সমস্ত মনুষ্যলোকের উপর তাপ বিকিরণ করবেন সেই নৃপতি আজ ভাগ্যচ্ছিদ্রের বশে নিজ কর্ম্মফলে ঐশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হয়েছেন, দিবাবসানে সূর্য্যের মত তিনি আজ বিগতপ্রভ। তিনি ভক্তিভরে সংঘকে নমস্কার করে লক্ষ্মীকাপণ্যচিহ্নিত এই অর্দ্ধামলক পাঠিয়েছেন।

তখন সংঘস্থবির ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, ভদন্ত, আপনাদের মনে এখন সহানুভূতির উদ্রেক হ'তে পারে। কেননা ভগবান বুদ্ধই বলেছেন, পরবিপত্তি সহানুভূতিযোগ্য, আর কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির এতে সহানুভূতি না হবে, কারণ—

মৌর্য্যকুঞ্জর নরেন্দ্র অশোক ছিলেন ত্যাগবীর, জম্বুদ্বীপেশ্বর হয়েও তাঁর ঐশ্বর্য্য এখন অর্দ্ধামলকে পর্য্যবসিত। ভৃত্যেরা তাঁর অধিকার হতে তাঁকে আজ বঞ্চিত করেছে। সেই কারণে তিনি যেন ঐশ্বর্য্যমদগর্বিত পৃথকজনের মনে ভীতি-উৎপাদনের জন্যই এই আমলকার্দ্ধ পাঠিয়েছেন, আপনারা এখন এই অর্দ্ধামলক চূর্ণ করে যূষে নিক্ষেপ করুন, যাতে সমস্ত সংঘই এর ভাগ পায়।

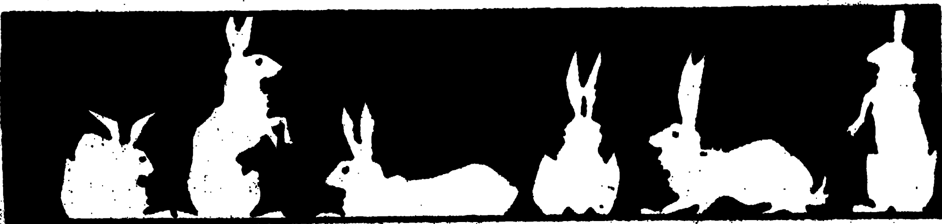
এর পর রাজা অশোক রাধগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাধগুপ্ত বল ত এখন পৃথিবীর ঈশ্বর কে? রাধগুপ্ত অশোকের পদবন্দনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেব, আপনিই পৃথিবীর ঈশ্বর।

অনন্তর রাজা অশোক কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠে চতুর্দিকে অবলোকন করে সংঘের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, তা হলে এখন আসমুদ্র মহাপৃথিবী বুদ্ধশাসনে দান করছি।

সমুদ্রের উত্তমনীলকঞ্চুকধারী বহুরত্নাকরভূষিত মহাপৃথিবী সংঘকে দান করলাম—যাতে সংঘভিক্ষুরা তার ফলভোগ করতে পারেন।

দ্রুতবারিবেগচপল রাজ্যশ্রী দান করে, আমি ইন্দ্রভবন বা ব্রহ্মলোকের ফল কিছুই চাই না। মহৎ ভক্তিপূর্ণ এই দানের ফলের দ্বারা যেন চিত্তৈশ্বর্য্য লাভ করি, যার পরিণাম আর্য্যসম্মত হয়।

অতঃপর রাজা অশোক দানপত্র লিখে তা মুদ্রাঙ্কিত করলেন এবং এইভাবে মহাপৃথিবী সংঘকে দান করে কালগত হলেন।



প্রতীক্ষমানা

শ্রীকানাই সামন্ত

তোমারে দেখেছি আমি সন্ধ্যার আঁধারে
নিরানন্দ দেহলীর ধারে
আছ প্রতীক্ষিয়া।
চিনি নাই, চিনি নাই, প্রিয়া।

পূতিগন্ধি বক্র শীর্ণ গলি।
দূরে দূরে উঠিল উজ্জ্বলি'
নগরের বৈদ্যুত আলোক।
আবর্তিত ঘূর্ণস্রোতে চলিয়াছে লোক
দূরে ও নিকটে
কোন্ মহাশূন্যে কোন্ ব্যর্থতার তটে
মৃত্যুকামনায়।
হায়,
তোমার কি মোহ নাই, মায়া নাই, নারী।
দাঁড়াইলে প্রান্তে এসে তারি?
নিরুৎসুক নিরানন্দ চোখে
কপট কজ্জললেখা; রক্ত অলক্তকে
রঞ্জিত অধর-ওষ্ঠ; ব্যর্থ বিভূষণ
অঙ্গে অঙ্গে করে উদ্‌ঘোষণ:
নিরুদ্দেশ প্রতীক্ষায়
দাঁড়ায়েছ হায়!
বিধাতার দান এ জগতে—
কানায় কানায় পূর্ণ, হায় কত বসন্তে শরতে
পুষ্পগন্ধে কুহুস্বরে নদীকলস্রোতে
পূর্ণেন্দু-আলোকে।
সে মোহিনীমূর্তি শুধু পড়েছিল চোখে
অন্য মনে যেতে যেতে।...
আমারে কি ছিলে প্রতীক্ষিয়া?
হায় কেন, চিনি নাই, চিনি নাই, প্রিয়া।

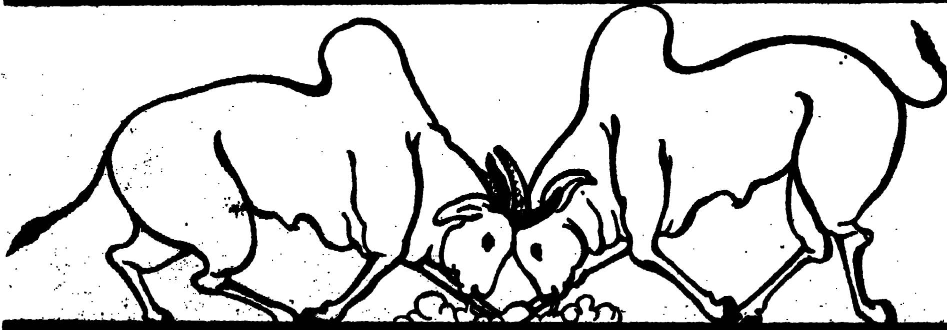
আমি শুধু কবি নই কল্পনাবিলাসী;
নির্বাণউৎসুক নহি—বিরক্ত উদাসী
অমলিন নহি গো কুমার।
বঞ্চিত এ যৌবন আমার
হাহাকার করে
সংগীত উৎসারি' জীর্ণ পঞ্জরে পঞ্জরে;
দীর্ঘ উপবাসী
চায় দেহ, চায় প্রাণ, আত্মা অবিনাশী;
একাধারে দ্যুলোক ভূলোক
মূর্তিময় প্রাণময় প্রেমময় হোক—
সুচিরবাঞ্ছিতা নারী, অনন্তপ্রেয়সী
হায়, সে কোথায় আছে বসি'
জন্মবিরহিণী—চিররাহুগ্রস্ত শশী—
কারাকক্ষতলে?—
অথবা পথের প্রান্তে?—নিশি নিশি তপ্ত অশ্রুজলে
হেথা শুধু তিতিল শিথান
স্বপ্নে স্বপ্নান্তরে শুধু নিষ্ফল সন্ধান।

কে তুমি?—তুমি কি বালা,
যৌবনলাবণ্যপণ্যা, প্রাণঘাতী মরীচিকামালা
ব্যর্থ কামকামনার অনির্বাণ চিতা
বারবধূ?—হে অপরিচিতা,
নহ মাতা, নহ কন্যা, বধূ নহ তুমি;
নরকের বিষবাষ্পে উঠেছ কুসুমি'
দিশাবিস্মরণী বুঝি আলেয়ার আলো?
তুলসীর মূলে নাহি জ্বালো
সন্ধ্যাদীপ; আপনারে কভু নাহি ঢালো
ধন্য করি' কোনো ভাগ্যবানে
সেবায় সোহাগে সুখে প্রণয়ে কল্যাণে।

কেই-বা না জানে।—
তব প্রণয়ের ভাণ,
হাসি, গান,
আত্ম-অপমান।—
ক্লেদখিন্ন রজনীর শেষে—
তন্দ্রাতুর নয়ননিমেষে
বিন্দু অশ্রুবারি
দিবে না দিবে না দেখা নারী।
করুণায় অথবা বিষাদে।
কেই বা না জানে—
নিজেরে করো নি দান প্রণয়ে কল্যাণে।

তবু কাঁদে...
'কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাংগনা-বুকে'।...
রুদ্ধ যার ভবনসম্মুখে
নরকউৎসব নিশিদিন—
যে কুমারী তন্দ্রায় বিলীন
অতারক অচন্দ্রমা গূঢ় মর্মতলে,
সে কি জাগিত না কভু পূত অশ্রুজলে.
শরৎ-শিশিরধৌত প্রসূনের সম
যদি তার চির প্রিয়তম
একবার দাঁড়াইত দ্বারে
চুমিত তাহারে
দূর করি' স্বপ্নঘেরা ঘুম ?

ত্রিদিবকুসুম
মর্ত্যে নারী
সন্ধানে তাহারি—
ফিরিয়াছি পথ হতে পথে।...
সে সন্ধ্যায় আঁধারে আলোতে—
কে তুমি, কাহার লাগি' ছিলে প্রতীক্ষিয়া ?
হায়, তোরে চিনি নাই, প্রিয়া।



দেবাঃ ন জানন্তি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, পণ্ডিতলোক, নামডাকও এই অল্প বয়সে যথেষ্টই হইয়াছে, কিন্তু বেতন মাত্র এক শত টাকা। যাহাকে বলে কায়ক্লেশে চলা—তেমনি ভাবেই সংসার চলে। গৃহিণী নীলিমা বড় গোছালো মেয়ে—সে এই অল্প আয়েই বেশ পারিপাট্যের সহিত সংসারটি চালাইয়া থাকে। কিন্তু বিপদ তাহার স্বামীকে লইয়া, অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন মুক্তহস্ত পুরুষ, যেদিন বেতন পান, সেদিন কম করিয়া দশ টাকার নূতন বই কিনিয়া ফেলিবেনই, তাহার উপর গোটা একটা টাকার পয়সা ট্রাম-বাসে ভ্রাম্যমান Poor Box ও রাস্তাঘাটের কাণা-খোঁড়াকে দিয়া উননব্বইটি টাকা লইয়া বাড়ী ফেরেন। কখনও কখনও বা নীলিমার জন্য দশ পনের টাকার শাড়ী ব্লাউস কিনিয়া স্ত্রীর হাতে পঁচাত্তরটি টাকা দিয়া অপ্রতিভের মত হাসিতে হাসিতে বলেন, এ মাসে একটা লেখার জন্যে পঁচিশ টাকা পাব কিনা! সৌরীন্দ্র বাঙলা দেশের একজন খ্যাতনামা লেখকও বটেন।

নীলিমা কিছুই বলে না, অত্যন্ত মিষ্ট হাসি হাসে। কাপড় ও জামাটি লইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া দেয়। রাত্রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলে, কেন আমার জন্যে ওগুলো কিনে মিছি-মিছি এতগুলো টাকা খরচ করলে বল তো? কি প্রয়োজন ওসবের?

সৌরীন্দ্র নীলিমার কপালের উপর খসিয়া-পড়া চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলে, জান নীলিমা, আমার ইচ্ছে করে, রত্নালঙ্কার দিয়ে তোমাকে আমি সোনার সিংহাসনে সাজিয়ে রাখি। কিন্তু পারলাম কই? সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সুখে নীলিমার চোখ ভরিয়া জল আসে, সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ হাসি হাসিয়া সে বলে, ওই রকম ক'রে বললে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু। জান, তোমার গৌরবই হ'ল আমার হীরে মুক্তো। হাটে বাজারে যা বিক্রি হয়—সে গয়না আমি চাই না।

পরম সুখে তৃপ্তিতে দম্পতিযুগল পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। কতক্ষণ পরে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-চমকে উভয়ের খেয়াল হয়—আকাশে মেঘ করিয়াছে, বড় গরম বোধ হইতেছে।

নীলিমা হাসিয়া বলে, ও, ঘনঘটা ক'রে মেঘ করেছে, তাই বলি এত ঘেমেছ কেন? দাঁড়াও, পাখাটা আনি।

সৌরীন্দ্র হাসিয়া ফেলে, তারপর খানিকটা চিন্তা করিয়া বলে, দাঁড়াও, একটা টেবিল-ফ্যান কালই কিনে ফেলব। মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে দামটা শোধ করলেই হবে।

নীলিমা বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়া বলে, না, ওসব হবে না। আমার অধিকার আমি ওই কলের পাখাকে দেব না কি? তা হ'লে একটা ইক্‌মিক কুকার কিনো, রান্না ক'রে দেবে। কিম্বা বিলেত-টিলেতের মত হোটেলে বাস ক'র, পয়সা দিলেই সব হবে।

সৌরীন্দ্র খুশি হইয়া বলে, আজ একখানা বই এনেছি নীল, কাল রাত্রে তোমাকে প'ড়ে শোনাব; পৃথিবীর সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ বই।

নীলিমা মৃদু হাসিয়া বলে, না, আমি পড়ব, তুমি শুনবে। ভুলচুক হ'লে মাস্টারমশাই ব'লে দেবেন।

কিছুক্ষণ পরই সে আবার বলে, এবার কিন্তু আমি বি. এ. পরীক্ষা দেবই। আজকাল তুমি মোটেই আমার পড়ার ওপর নজর দাও না। কেবল সভা-সমিতি, ওসব আর চলবে না।

সৌরীন্দ্র মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া উত্তর দেয়—

এ রাজ্যের রাণী তুমি ; তোমার ইচ্ছাই হেথা
অলঙ্ঘ্য আদেশ। তাই হবে, তাই হবে দেবী।

নীলিমা কি উত্তর দিতে গেল, কিন্তু দেওয়া হইল না ; একটা দীপ্ততর বিদ্যুৎ চমকিয়া চোখ যেন ধাঁধিয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিবার জন্য উঠিল ; সৌরীন্দ্র বলিল, না থাক। চমৎকার মেঘ হয়েছে। শুয়ে শুয়ে মেঘ দেখা যাবে। আষাঢ়ের মেঘ—মেঘদূত আবৃত্তি করি শোন।

সৌরীন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীলিমা বলিল, একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ কর।

সৌরীন্দ্র বলিল, না। সামনে কলিকাতা মহানগরীর মাথার ওপরে মেঘের মেলা ; অলকাপুরীর বর্ণনাটাই বড় ভাল লাগবে এখন।

সত্যই নগরীর সৌধ-শিখরগুলির মাথায় যেন মেঘ মদমত্ত ঐরাবতের মত শুণ্ডান্দোলন করিতে করিতে আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে।

* * *

প্রবল বৃষ্টিতে কলিকাতা যেন ভাসিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাস্তায় স্থলচারী যানবাহন অচল হইয়া রহিল ; স্থানে স্থানে সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা নৌকা লইয়া খেয়া দিয়া ফিরিল। প্রায় সমস্ত দিনটা কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিয়া অপরাহ্ণের দিকে তবে শহরের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

নীলিমা পাঁপর নিমকি তৈয়ারি করিয়াছিল ; স্বামীকে খাবার ও চা খাওয়াইয়া বলিল, বেড়িয়ে এস দেখি একটু। আজ বর্ষার ওজর পেয়ে সারাদিন বইয়ে আর মুখে ব'সে আছ।

সৌরীন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, উঁহু, আবার বৃষ্টি আসবে।

—না, আসবে না। আসে তো না হয় ছুটে বাড়ী চ'লে আসবে, বেশ একটু একসারসাইজ হবে।...না ভারী কুঁড়ে তুমি, শরীরের ওপর একটুও নজর দেবে না। ওঠ বলছি, ওঠ।

অগত্যা সৌরীন্দ্রকে উঠিতে হইল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল। নীলিমা স্তব্ধ পরিতৃপ্ত মুখে জানালা দিয়া স্বামীর গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আপনার ভাগ্য-গৌরবের তৃপ্তি যেন তাহার অন্তরে আর ধরিতেছে না, কূল ছাপাইয়া অধরের তটভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহসা সে চকিত হইয়া উঠিল। এ কি, সৌরীন্দ্র দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিতেছে কেন ? সে তাড়াতাড়ি সব ফেলিয়া দরজার মুখে আগাইয়া গেল।

সৌরীন্দ্র দরজার মুখ হইতেই বলিল, You naughty girl, make haste—make haste।

—কি ? Make haste কেন ? কথার সুরে আশ্বস্ত হইয়াও নীলিমা বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, Make haste কেন ?

—Lake—Lake; লেকটা নাকি ভ'রে উঠে কূলের ওপর ছাপিয়ে উঠেছে। Make haste—কাপড় জামা পাল্টে নাও। চল, বেড়িয়ে আসি।

—এই দেখ, পাগলের মত খেয়াল দেখ। বাড়ীতে কত কাজ রয়েছে বল তো? আমার কি বেড়াতে গেলে চলে?

—নি-শ্চয় চলে। আজ না হয় রান্নাবান্না হবেই না। তাতে আপত্তি থাকলে—ফিরে এসে একজনের কাজ দুজনে ক'রে নেব।

নীলিমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, লঙ্কা বাঁটতে হবে কিন্তু।

—তাতেই রাজি। কিন্তু তুমি চটপট কর দেখি।

নীলিমা আর আপত্তি করিল না, স্বামীর এ আগ্রহ দেখিয়া তাহারও অন্তর যেন স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পাল্টাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে পরিয়াছিল অত্যন্ত সাদাসিধে একখানি ছাই রঙের লালপাড় ঢাকাই শাড়ি, ব্লাউসের রঙটা ছিল—ঘন নীল। পায়ে একজোড়া অল্প উঁচু-হিল চামড়ার ফিতা-বাঁধা জুতা।

সৌরীন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বলিল, নাঃ, এ পোষাক তোমার ভাল হ'ল না। একখানা ভাল শাড়ি পরলে না কেন? এই কাল যেখানা এনেছি।

—না, এই বেশ ভাল হয়েছে। ও প্রজাপতির মত রঙ-চঙ আমি ভালবাসি না।

রাস্তায় আসিয়াই সৌরীন্দ্র চলন্ত একখানা ট্যাক্সিকে ডাকিল, এই ট্যাক্সি!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীলিমা বলিল, ট্যাক্সি কেন? এই তো লেক দশ মিনিটের রাস্তা, দিব্যি—

—না। সব তাতে আপত্তি তোমার আমি শুনব না।

ট্যাক্সিটা আসিয়া পড়িয়াছিল, বাদানুবাদ এ ক্ষেত্রে অশোভন হইবে বিবেচনা করিয়া নীলিমা আর আপত্তি করিল না।

সত্যই লেকটা ভরিয়া উঠিয়াছে কানায় কানায়।

চারিদিকে ভ্রমণবিলাসীর ভিড়ে যেন একটা উৎসবক্ষেত্র সাজিয়া উঠিয়াছে। উপরের জনসমারোহের ছবি লেকের নিস্তরঙ্গ জলতলে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে প্রবালপুরীর দৃশ্যের মত। ইউরোপীয়ান রোয়িং ক্লাবের প্রাঙ্গণে লাউড-স্পীকারের সাহায্যে গ্রামোফোন-রেকর্ডে বিলাতী অর্কেস্ট্রা বাজিতেছে। রাস্তার উপর দিয়া নূতন ঝকঝকে মোটর ঝড়ের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফিরিওয়ালার গান, চীৎকার, কূলের উপর মানুষের ভিড়। কোথাও একটু বসিবার আসন খালি নাই। ঘাস এখনও ভিজা, সেখানেও বসা চলে না। খানিকটা বেড়াইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাদের ভাগ্যে একখানা আসন মিলিল।

বসিয়া অনুযোগের সুরে নীলিমা বলিল, এমন তোমার খেয়াল বাবু, খামখেয়াল। দিব্যি বাড়ী গেলেই হ'ত, না, চাঁদ ওঠা পর্য্যন্ত থাকতে হবে।

একটু দূরে বসিয়া আর একটি দম্পতি;—মহার্ঘ অলঙ্কারে ভূষিতা দামী বেনারসী সুটে সজ্জিতা নীলিমার বয়সীই একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা ও তাহার পাশে খাঁকী হ্যাফপ্যাণ্ট সাদা শার্ট পরিয়া তাহার স্বামী মৃদুস্বরে গল্প করিতেছে।

নীলিমা মেয়েটির দেহ ও পোষাকের বহর দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। ওদিকের মেয়েটি বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীলিমার দিকে চাহিল। নীলিমা কিন্তু হাসিয়াই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইল ইচ্ছা করিয়াই।

ওদিকের মেয়েটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে গম্ভীরভাবে বলিল, শুনুন।

নীলিমা গভীর মনোযোগের সহিত লেকের জলের দিকে আঙুল দেখাইয়া সৌরীন্দ্রকে বলিল, আচ্ছা, কতটা জল হবে বল তো?

সৌরীন্দ্র হাসিল, কয়েকজনই ইতিমধ্যে মাপবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফিরে আসেন নি কেউ।

—শুনছেন!—ওপাশের মেয়েটি কিন্তু তখনও ছাড়ে নাই।

নীলিমা এবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমাকে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি—। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নীলিমার দিকে চাহিয়া মেয়েটি কথাটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল, আপনার নামটি জানতে পারি কি?

—কেন বলুন তো?

এবার মেয়েটি হাসিয়া বলিল, আলাপ করতে ইচ্ছা করছে আপনার সঙ্গে। মানে আপনাকে বেশ ভাল লাগছে আমার, আমার মত বিশ্রী মোটা নন তো আপনি! বেশ নীলিমা-নীলিমা চেহারা আপনার।

নীলিমা ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল, মেয়েটি তাহার নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিল, আর সে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছে না, অথচ সে যে চেনা মানুষ তাহাতে আর ভুল নাই। দুই দিকে দুইজনের স্বামীদ্বয়ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। ফিস ফিস করিয়া উভয়েই প্রশ্ন করিল, কে বল তো?

স্মৃতির সাগর মন্থন করিয়া অকস্মাৎ হারানো মানুষকে বুকে করিয়া যেন নীলিমা ভাসিয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া একেবারে সে মেয়েটির কাছে আসিয়া বলিল, অতসী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই কুপোই আপনার সখী অতসী!

* * *

বাস্তব এমনই করিয়াই কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর দুই সখীতে দেখা হইয়া গেল। অথচ দেখা হইবার সম্ভাবনাও কেহ কোন দিন কল্পনা করে নাই।

পশ্চিমের একটি বড় শহরে পাশাপাশি বাড়ীতে অতসী ও নীলিমা পাঁচ হইতে পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়াছে, এমন কি একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নীলিমার বাপ ছিলেন একটি বড় ইন্সিওরেন্সের একজন প্রধান এজেন্ট, সমগ্র বেহার প্রদেশটার তিনি ছিলেন চীফ এজেন্ট। উপার্জ্জনও ছিল প্রচুর। এই সময়েই তাহার পাশের বাড়িতে শহরের একটা প্রধান স্কুলের হেডমাস্টাররূপে আসিয়া বাসা গাড়িলেন অতসীর বাপ। পাঁচ বৎসরের দুইটি মেয়ে একসঙ্গে মিলিত হইয়া দিন কয়েকের মধ্যেই দুই বাড়ীর মধ্যে একটা সমারোহ জুড়িয়া দিল। নীলিমার পুতুল-কন্যার সহিত অতসীর পুতুল-পুত্রের বিবাহ। নীলিমার বাপ যেমন উপার্জ্জন করিতেন, খরচও করিতেন তেমনই, তাঁহার পাঁচ বৎসরের মেয়েটি সে সংবাদটি জানিত বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী। সে ধরিল, বাবা, আমার মেয়ের বিয়ে।

বাবা হাসিয়া বলিলেন, বল কি মা? মেয়ের বিয়ে যে ভীষণ ব্যাপার, তা আমায় কি করতে হবে?

কি করিতে হইবে সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে মেয়ে পারিল না, বাপ নিজেই সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন।

কন্যার হাত ধরিয়া অতসীর পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, আমার এই মেয়েটির মেয়ের বিয়ে আপনার মেয়ের ছেলের সঙ্গে। বরযাত্রী তো যাবেনই, তবু শরীর খারাপ কি কাজের অজুহাতে যদি না যান, তাই বলতে এলাম। যেতেই হবে আপনাকে।

মাস্টার মানুষটি হা হা করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপরই পরিচয়টা হইয়া উঠিল প্রগাঢ়। রাত্রি দশটার পর তাঁহাদের মজলিস বসিত। মেয়ে দুটিও নিজেদের মজলিস সন্ধ ভাঙিয়া আপন আপন বাড়ি যাইত। মজলিসে আলোচনা হইত হরেক রকম; কিন্তু একটা মূল সুর ফল্গুধারার মত অহরহ প্রবহমান ছিল। সেটা ছিল, উঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে, এই কি জীবন?

মাস্টার বলিতেন, সেই একঘেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আর সেই ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি রিপীটিং এভরি ইয়ার, এভরি ডে!

ইন্সিওরেন্স-এজেন্ট বলিতেন, যা বলেছেন মশাই, সেই এক গৎ মুখস্ত বলা আর আচণ্ডাল মানুষের তোষামোদ করা, লাইফ মিজারেব্‌ল হয়ে উঠেছে!

—না, আপনাদের লাইন অনেক ভাল। অনেক বৈচিত্র্য আছে। পয়সা আছে।

—গুড হেভেন্স, বলেন কি আপনি? বৈচিত্র্য? পয়সা? বোগাস্‌, অল বোগাস্‌!

মেয়ে দুইটি এদিকে একই সঙ্গে খেলা করিত, ক্রমে একই সঙ্গে একই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। স্কুলের অন্য মেয়েরা ক্রমে তাহাদের নামকরণ করিল জোড় মাণিক। উভয়ে একই সঙ্গে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িল; তখন তাহারা দুইজনেই পনেরোয় পা দিয়াছে। এই সময়ই অতসীর বাপ হুগলী জেলায় এক নামকরা স্কুলে অধিক বেতনে হেড-মাস্টারী পাইয়া এখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতসী নীলিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সপ্তাহে একখানা করিয়া পত্র দিবেই। ছয় মাস প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে বজায় ছিল, তাহার পরই পত্রের সংখ্যা কমিল। ক্রমে কমিতে কমিতে দেড় বৎসরের মধ্যেই পত্র দেওয়া একরূপ বন্ধই হইয়া গেল। তাহার পর পরস্পরের বিবাহ হইয়াছে, কেহ কোন খবর রাখে নাই।

সমস্ত স্মৃতিকথা বলা হইয়া গেলে সৌরীন্দ্রই হাসিয়া বলিল, কবিরাই এঁদের চারিদিকে একটা মনোরম রহস্যের আবরণ মাখিয়ে দিয়েছেন। আসলে কিন্তু সব ভুয়ো। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের স্ত্রী কখনও বিরহে কাতর হয়ে শীর্ণা হয়ে যান নি। তিনি তাঁকে ভুলেই গিয়েছিলেন, স্বর্ণ-বালুকণাময় নদীচরে নিশ্চয় তিনি কলরোল তুলে চেল ডিগ্‌ ডিগ্‌ খেলে বেড়াতেন সখীদের সঙ্গে!

তাহার কথায় অতসীর স্বামী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ বলেছেন মশায়। খাঁটি সত্য কথা।

অতসী কুপিত হইয়া বলিল, বেশ গো মশায়! তা ব'লে আপনাদের মত নই আমরা। ষাট বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণের মত অপরাধ আমরা করতে পারি না।

নীলিমা পরম খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল, Rightly served ! বেশ বলেছিস ভাই অতসী। এই রকম কথা আমার মনেই পড়ে না কাজের সময়।

অতসী হাসিয়া বলিল, পণ্ডিত লোকের গিন্নী তুই ভাই, এ সব কোঁদলের কথা তুই জানবি কি ক'রে ? যাকগে, চল, এখন আমার বাড়ীতে চল। ডাক না গো, সোফারকে গাড়ী আনতে বল।

অতসীর স্বামী কণ্ট্রাক্টার মানুষ, তিনি হিসাব নিকাশ, কুলী মজুর প্লান, ইট কাঠ লোহা যেমন বুঝেন, সাধারণ জীবনে তিনি তেমনই পঙ্গু। তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, গাড়ীটা ডাকা তো সত্যই উচিত হইয়াছে। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, এই হরকিষণ, গাড়ী লে আও।

অতসী নীলিমা ও সৌরীন্দ্রকে একেবারে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া তুলিল। নিঃশব্দ সুবৃহৎ আরামপ্রদ গাড়ীখানা পিচের রাস্তার উপর লেকের বুকের নৌকার মতই যেন পিছলাইয়া চলিয়াছিল।

* * *

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। কণ্ট্রাক্টারের নিজের বাড়ী, নানা নূতন কায়দায় বাড়ীখানিকে সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সৌরীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল, সপ্রশংস হাসি হাসিয়া বলিল, মিস্টার চ্যাটার্জ্জীর রুচির আমি প্রশংসা করি। এ যেন মনে হচ্ছে, সাগরপারের কল্পলোকে এসে পড়েছি।

অতসী বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে না অধ্যাপকপ্রবর, ও প্রশংসাটা ওঁর প্রাপ্য মোটেই নয়। ওটা প্রাপ্য ষোল আনা আমার। কণ্ট্রাক্টার লোকে বাড়ীর খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে লাভ করতেই জানে, খরচ বাড়িয়ে বাড়ী ভাল করতে জানে না।

অতসীর স্বামী মিস্টার চ্যাটার্জ্জী অপ্রতিভের মত হাসিয়া বলিল, প্রশংসাটা হয়তো সত্যই তোমার প্রাপ্য ; কিন্তু খরচ বাঁচানো এবং বাড়ানোর পরিমাপটা কি কথার ভঙ্গির মধ্যে অনেকটা বেশী বেড়ে যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের একটা অ্যাকাউণ্টে তোমার সই চলে, এবং সেটার হিসেব লাগে না কাউকে। কৃপণ অপবাদটা পরে দেয় দিক, কিন্তু তুমিও দেবে ? বিশেষ এঁদের সম্মুখে।

অতসী ইহাতেই একটু আহত হইল, সে বলিল, দাতাকর্ণ তুমি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট বলে টাকার পরিমাণটা তুমিও কি বড় ক'রে তুললে না ? ব্যাঙ্কও বটে, অ্যাকাউণ্টও বটে, কিন্তু টাকাটা কত শুনি ? শোন ভাই নীলি, আমাকে সংসার-খরচে, আমার হাত-খরচে মাসে তিনশ টাকা উনি দেন। টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকে, তাই বলেন, একটা অ্যাকাউণ্টে আমার সই চলে।

সৌরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, বেশ। আমরা দুজনে এসে পড়লাম দেখছি নাটার ফলের মত। এ যে আপনারা দুজনে রীতিমত ঝগড়া সুরু ক'রে দিলেন।

অতসী বলিল, করব না! আপনারা অন্যায় বলবেন আর আমরা কেবল সহ্যই ক'রে যাব বুঝি ?

চ্যাটার্জ্জী করুণভাবে বলিল, কথাটা তোমার অর্দ্ধসত্য হ'ল অতসী, অন্যায় মধ্যে মধ্যে ব'লে ফেলি, চামড়ার মুখ তো ; কিন্তু ওই সহ্যের কথাটা যা বললে, ওটা মিথ্যে, ওটাও সেই এই হতভাগ্যদেরই করতে হয়। কোনও কালেই সহ্য তোমরা কর না।

সৌরীন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বড় ভাল বলছেন। বনে এক কালে বাঘ ছিল, সে

মানুষ খেত, সুতরাং বনে চিরকালই বাঘ আছে এবং মানুষ খায় এ অপবাদ বনের আর গেলই না। অথচ সুন্দরবনই অর্দ্ধেক সাফ হয়ে গেল।

অতসী বলিল, আপনি পণ্ডিত লোক আপনার সঙ্গে তর্কে কে পারবে বলুন। আমার যাঁর সঙ্গে কারবার, তিনি কুলি-মজুরের মালিক, ধমক দিয়ে কথা না বললে কানে কথা ঢোকেই না।

নীলিমা আপনার মনেই সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল, এই সব কথাবার্ত্তা তাহার কানে বড় প্রবেশ করিতেছিল না।

অতসী রাত্রে একটা ভোজ করিয়া ফেলিল। নীলিমা ও সৌরীন্দ্রকে খাওয়াইবার জন্য সেই রাত্রেই একেবারে খাস হগসাহেবের বাজার হইতে তিন চার রকমের মাছ, মাংস, বড় দোকান হইতে দই-মিষ্টি আনিবার জন্য মোটর পাঠাইয়া দিল।

নীলিমা বলিল, কেন ভাই অতী, এত সব হাঙ্গামা করছিস? যাই বলিস, তুই ভয়ানক খরচে।

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, খরচের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি অনেক রাত্রি হবার সম্ভাবনার কথা।

সৌরীন্দ্র কিন্তু অতসীকে সমর্থন করিয়া বলিল, আমার কিন্তু হাঙ্গামাতেও আপত্তি নেই, আর বেশী রাত্রি হ'লেও আপত্তি নেই। মানে, এ ক্ষেত্রে আমি সেই আদিম কালের ব্রাহ্মণ-সন্তান।

অতসী খুব খুশি হইল। সে নীলিমাকে টানিয়া লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। বলিল, উড়িষ্যাবাসী আমাদের মন্দ রাঁধেন না, তবু বরাত ক'রে দেখিয়ে শুনিয়ে ক'রে না নিলেই মুস্কিল বাধায়। আয়, ওঁরা দুজনে থাকুন। আমরা ভেতরে যাই।

চ্যাটার্জ্জী হাসিয়া বলিল, অতসী এই সবই বেশী ভালবাসে। একটা গোলমাল, সে আপনার অতিথি-সজ্জন নিয়ে হোক, বা ফিরিওয়ালার সঙ্গে ছিটের দর নিয়ে হোক, মোট কথা একটা হৈ চৈ তার চাই। ভেরি গুড গার্ল। নীলিমা দেবী দেখলাম, বড় শান্তপ্রকৃতির মানুষ।

সৌরীন্দ্রও হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। অশান্ত হবার অবশ্য সুযোগও নেই, মানে, অবসর কোথায়? তার ওপর বাপ ছিলেন ভারী খরচে লোক, ইন্সিওরেন্সের এজেণ্ট ছিলেন, হৈ চৈ করাটাও ছিল তাঁর প্রকৃতিগত। ও কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে পৈত্রিক দুটো গুণ বা দোষ যাই বলুন, একেবারেই পায় নি।

ভিতরে অতসী হৈ হৈ করিয়া নীলিমাকে লইয়া ঘুরিতেছিল। ঠাকুরের কাছে বসেই নাই, সে নীলিমাকে লইয়া সিঁড়ির কোলাপ্সিব্‌ল গেট হইতে জুয়েলারির বাক্স পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া দেখাইতেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর, পরদিন রাত্রে পাল্টা নিমন্ত্রণ দিয়া নীলিমা ও সৌরীন্দ্র বাড়ী ফিরিল।

অতসী নীলিমার বাড়ী দেখিয়া অবজ্ঞা এবং দুঃখ সত্ত্বেও বিস্মিত হইয়া গেল। বই—বই আর বই! আলমারির মধ্যে ঝকঝকে বই, ঘরের জানালার মাথায় কাঠের থাক লাগাইয়া তাহার উপর রাশি রাশি কাগজ, একটা বাক্স খুলিয়া নীলিমা আবার দেখাইল, এক বাক্স পুরানো পুঁথি। দেওয়ালে সভা-সমিতির ফোটো, তাহার অধিকাংশের ভিতরেই মাল্যশোভিত সৌরীন্দ্র সভাপতিরূপে বসিয়া আছে। অতসী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে বলিল, বেশ আছিস ভাই। পণ্ডিতের স্ত্রী হয়ে তুইও পণ্ডিত হয়ে গেছিস। এবার তুই বি. এ. দিবি বলছিলি না?

নীলিমা বলিল, এক একবার ভাবি, দেব। আবার মনে হয়, কি হবে? সেই তো উনোনশাল আর বিছানা-পাড়া!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অতসী বলিল, কেন, সে সব চাকর বাকরে করবে।

—বেশ! এতেই কুলায় না, তার ওপর চাকর। দেবতাটির আমার টিকিট খরচই মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা। দেশ বিদেশ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী, সার্ সি. ভি. রামন, ফ্রান্সে রোমা র‍ঁলা এই সব চিঠিপত্র চলছেই—চলছেই!

অতসীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বলিল, বলিস কি? কই, দেখি না ভাই, ওসব লোকের চিঠি! এ কি সাধারণ কথা রে!

নীলিমা একটি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স খুলিয়া বড় বড় খাম বাহির করিয়া বসিল।

* * *

আকাশে মেঘ জমিয়া অপরাহ্নটাকে চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

অতসী বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। চ্যাটার্জী কাজ হইতে ফিরিয়া বলিলেন, চল, আজ অনেক দূর বেড়িয়ে আসব।

অতসী বলিল, না। হৈ হৈ করতে আর ভাল লাগে না বাবু। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। রাত্রে সে বলিল, দেখ, আমাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।

চ্যাটার্জী শঙ্কিতভাবে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এখন যে টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে অতু।

অতসী একটু ভাবিয়া বলিল, বেশ, আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি, জড়োয়া নেকলেসটা বেচব। ওইটেই বেচে দেব। বাড়ীতে একটা লাইব্রেরি না করলে লোকের বড় হীন ধারণা হয়। আমি একটা লাইব্রেরি করব।

চ্যাটার্জী হতভম্ভ হইয়া গেল। অতসী বলিল, আমি কিন্তু প্রাইভেটে আই. এ. দেব। চ্যাটার্জী অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতসী তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অকস্মাৎ রাগে যেন পাগল হইয়া গেল, বলিল, টাকাই চিনলে শুধু সংসারে। আর কিছু চিনলে না! ছি! ছি!

ঠিক সেই সময়েই সৌরীন্দ্র চায়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া জানালার ধারে বসিয়া ছিল। আকাশে আবার মেঘ জমিয়াছে। নীলিমা চা ও জলখাবার আনিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিল। টেবিলের একদিকে একটি নূতন বইয়ের প্যাকেট, সেটাকে টানিয়া লইয়া সে রূঢ়স্বরে বলিল, আবার আজ বই নিয়ে এলে তো?

সৌরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, তোমার বি. এ.র কোর্স গো দেবী।

—ফিরিয়ে দিয়ে এস এগুলো।

—মানে?

—মানে, পরীক্ষা আমি দেব না।

—পরশু রাত্রে যে বললে?

—ঘাট হয়েছে। বলিয়া সে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপেই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া বলিল, কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত—লোকগুলো এই জন্যেই চিরকাল না খেয়ে চরম দুর্দ্দশায় মরেছে!

সৌরীন্দ্র কথার অর্থ বুঝিল না, হতভম্ভ হইয়া গেল। নীলিমা বলিল, নিজের একটা বাড়ী না, ঘর না, ভবিষ্যৎ বলতে সঞ্চয় না; কেবল বই—বই আর বই! ছি ছি ছি!

আকাশে ঝিকমিক করিয়া একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘের ডাক, সৌরীন্দ্রের মনে হইল, কে যেন অট্টহাসি হাসিতেছে।



ষষ্ঠী পূজা

শিল্পী—শ্রীসমর ঘোষ

শঙ্খ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মন্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

*

আজি প্রশান্ত মধু-সন্ধ্যায়
কে গো কল্যাণি বাজাও আমায়
তুলিয়া ছু'খানি বর্ত্তুল পাণি
শোভিত শুভ্র বলয়ে?
উন্মুখ মুখ-মারুতের ঘায়ে
তুলিছ এ বুকে সাগর জাগায়ে!
বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন-প্রলয়ে—

নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ
অসংখ্য মূক-শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক।
থামায়ো না তবে, নামায়ো না আর
ধ্বনিয়া আমারে তোল' বারবার
তুমুল হউক আহ্বান তব
মরণে করুক ধন্য।
অয়ি কল্যাণি, কুটীর-কন্যা
মুক্ত করো গো বেদনবন্যা,
পার্থের রথে কুরুক্ষেত্রে
বাজুক পাঞ্চজন্য।
সন্ধ্যা ঘনায় মুদ্রিত প্রায়
পদ্মযোনির পদ্ম—
চক্রপাণির চক্রের ডরে
রজনী খুঁজিছে ছদ্ম।

মানুষের মীন্‌নেস

সম্বুদ্ধ

প্রসিদ্ধ শিকারী ৺কান্তি চৌধুরীর একটি কাহিনী আপনাদের শুনাইতেছি।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

শিকারীকে সব রকম বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, বিপদ আগে থেকে জানান দিয়ে আসে না, সত্যিকার বিপদ আসে হঠাৎ। সেই সময় যে মাথা স্থির রেখে চলতে পারে, সেই বাঁচে ; না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু।

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে, রোজাকে বাগে পেলে ভূতে ছেড়ে কথা কয় না। জানোয়ারদেরও তাই। শিকারী যেমন তাদের মারবে ব'লে তাকে তাকে থাকে, তারাও শিকারী দেখলেই চিনে নেয়, ও তাদের প্রায় একটা ইন্‌স্টিংক্‌টের মত। বাগে পেলেই তারা শিকারীকে আক্রমণ করে। শিকারীর প্রাণ ঝুল্‌ছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর,—চারিদিকে হুঁস রেখে তাকে চলতে হয়, কখন যে কোন জিনিসটা কি ভাবে কাজে লেগে যায়, তার কিচ্ছু ঠিক নেই। এই ধর নেপালের সেই ভালুকের ব্যাপারটা।

হঠাৎ-বুদ্ধি খাটিয়ে আর একবার কি ভয়ানক বেঁচে গিয়েছিলাম, সেই গল্প বলি শোন।

বার্মার একটা জঙ্গল আমাদের কোম্পানি থেকে ইজারা নেওয়া হচ্ছিল। জায়গাটা আপার বার্মায়, মিচিনা থেকে কিছু দূরে। ওদিকটাতে বার্মা রেলওয়ের শেষ স্টেশনই মিচিনা, সেখানে নেমে আরও অনেকটা যেতে হয়।

হাজার দশেক একর নিয়ে বন, সেই বন মেপে জুপে চৌহদ্দি ঠিক ক'রে নিতে হবে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করতে হবে, কাঠ কাটাবার জন্যে লোকজন ঠিক করতে হবে, কাঠ কাটিয়ে কোন্ পথে চালান দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে—সে এক এলাহি ব্যাপার। যাকে তাকে দিয়ে সে কাজ হয় না। তায় আবার জায়গাও খারাপ, না আছে লোকালয় না আছে পথঘাট, বনে ভর্ত্তি ময়াল সাপ হাতী আর বাঘ। জেনে শুনে সেই মৃত্যুপুরীতে কোন কর্ম্মচারী যেতে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল আমিই যাব।

আমরা বলিলাম, কিন্তু বার্মাতেও কি বাঘ আছে? রয়াল বেঙ্গল?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, রয়াল বেঙ্গল বল কাকে?

আমরা বলিলাম, কেন, বড় বাঘ যেগুলো।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বড় বাঘ হ'লেই রয়েল বেঙ্গল হয় না। অবশ্য ভুলটা শুধু তোমাদের নয়, ও ভুল অনেকেই করে।

আমরা বলিলাম, তবে?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বেশ, সেই কথাটাই তোমাদের আগে একটু ব'লে নিই। ভুল ধারণা থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।

বলতে গেলে গোটা ভারতবর্ষই বাঘের দেশ। শায়াম চায়নাতেও বাঘ আছে, তবে সেগুলো এর কাছে কিছুই নয়। আফ্রিকায় বাঘ নেই।

ইণ্ডিয়াতে অনেক রকমের বাঘ পাওয়া যায়, তার মধ্যে মোটামুটি দুটো জাত—ডোরাদার আর বুটিদার। ডোরাদার বাঘরা দেখ্‌তে বড়, তাদের শক্তিও বেশি। বুটিদাররা ছোট, এদের চল্‌তি নাম চিতে; ইংরিজিতে বলে ল্যেপার্ড। চিতেবাঘ অনেক রকমের হয়। মানুষকে এরা বড় একটা ঘাঁটায় না, মাছ ছাগল ভেড়া গরু এই সব খায়। পোষা জন্তু মারতে সুবিধে হবে ব'লে চিতেরা অনেক সময় গ্রামের ভেতরে এসে বাসা করে। চিতেদের কোন কোন জাত বেশ গাছে চড়তে জানে, ইংরেজিতে তাদের বলে প্যান্থার। আমেরিকার জাগুয়ার এদেরই জাতভাই।

ডোরাদার বাঘদের ইংরিজি নাম টাইগার। টাইগারকে এক কথায় ভারতবর্ষেরই জীব বলা চলে। কাছাকাছি দুটো একটা জায়গা যেমন শায়াম, ইণ্ডোচীন, আর প্যাসিফিকের দুচারটে দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও টাইগার নেই।

ইণ্ডিয়ান টাইগারদের ভেতরে দুটো গুষ্ঠি। একটা থাকে সমতল জায়গায়, এদের প্রধান আড্ডা হচ্ছে সুন্দরবন, মানে বরিশাল খুলনা চব্বিশ পরগণা এই তিন জেলার দক্ষিণ দিকে, বে অব্ বেঙ্গলের ধার ঘেঁষে। সেখানে জমি সাঁৎসেতে ভিজে, তার ওপর নলখাগড়া আর তারাগাছের জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এদের বাস। ভিজে জায়গায় থাকে, তায় সমতল দেশ ব'লে লাফালাফি বেশি কর্‌তে হয় না, তাই এরা গায়ে খুব ভারী হয়। সাধারণত এদের স্বভাবও একটু আল্‌সে। কিন্তু শক্তি রাখে দারুণ, থাবার এক ঘায়ে একটা বড় ষাঁড়কে ঘায়েল ক'রে দিতে পারে। এদেরই নাম বাঘের রাজা—রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

অন্য জাতটা থাকে পাহাড় অঞ্চলে। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়, জব্বলপুর হাজারিবাগের দিকে এদের দেখা যায়, কিন্তু এদের বড় আড্ডা হচ্ছে হিমালয়ের তলাকার জঙ্গলে। তার মানে ইউ. পি.র ওখান থেকে সুরু ক'রে হিমালয়ের রেঞ্জ ধ'রে পুবদিকে যদ্দুর যাও—নেপাল ভোটানের তরাই, আসাম আর বার্মার জঙ্গল, সব এদেরই রাজত্ব। আসাম আর বার্মার পাহাড়ও আসলে হিমালয়েরই দুটো ডাল কিনা। শায়াম আর আনামে যে বাঘ পাওয়া যায়, তারাও জাতে এদেরই জ্ঞাতিভাই, তবে তাদের আকার আর শক্তি দুইই এর চাইতে ঢের কম।

রয়াল বেঙ্গলের মত এই বাঘেরা গায়ে ভারী হয় না, এদের দেহ হালকা। পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটাছুটি ক'রে ব'লে এদের গায়ে চর্বি বেশি জমতে পায় না। রয়ালের তুলনায় এরা চটপটেও ঢের বেশি। রয়াল গায়ের জোরে যা করে এরা সেটা ঐদিক দিয়ে পুষিয়ে নেয়।

দুটো যাতের চেহারাতেও তফাৎ আছে। রয়ালের মুখটা বেশি থোলো, রঙটা একটু বেশি লাল ঘেঁষা। পাহাড়ী বাঘের রঙে হলদের ছাঁটটা বেশি। তবে সে তফাৎ পাকা লোকের চোখে ছাড়া ধরা পড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেও রঙের জেল্লা বদলে যায় কিনা।

যথাসময়ে আউটরাম ঘাটে গিয়ে জাহাজে চাপলাম। সঙ্গে চলল আমার চাকর বিশু, অফিসের এক দরোয়ান আর এক কেরানি। দরোয়ান অযোধ্যা সিং পুরোনো লোক। কেরানিটিকে আমি চিনতাম না, নতুন বহাল হয়েছে।

রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে নিলেম ডেকে নিলাম। তারপর কাগজপত্তর সব বুঝে নিয়ে রেলে চাপলাম।

রেঙ্গুন থেকে রেলে ক'রে মিচিনা। সেখান থেকে কতক হেঁটে, কতক ঘোড়ায় চেপে বনের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এক সায়েব থাকে সেখানে, সে আমাদের রিসীভ ক'রে নিলে। বললে, রেঙ্গুন থেকেই সে টেলিগ্রাম পেয়েছে আমরা যাচ্ছি। তার বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট্ট বাংলোমতন আছে, অফিসার কেউ এলে থাকে। সেইটা আমাদের জন্য ছেড়ে দিলে।

পরদিন থেকে আমাদের কাজ স্থুরু হ'ল, সারাদিন বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কুলি নিয়ে বনে বনে ঘুরি, মাপ জোপ দেখে দেখে পিলার গাড়ি, বা বাংলোয় ব'সে ব'সে কন্‌ট্রাক্টর আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করি ; রাতের বেলা দোর জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুমোই, আর মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভাঙে দূর থেকে শেয়াল আর বাঘের ডাক শুনি।

এমনি ক'রে হপ্তা দুই কেটে গেল।

সায়েবটি ভারী কাজের লোক, আমাদের নানা ভাবেই সে সাহায্য করছিল। কাজও এগোচ্ছিল চমৎকার। সেদিক থেকে অস্থুবিধে কিছুই নেই, তবু যাবার পর থেকেই একটা ব্যাপারে বড্ড মুস্কিল বাধিয়ে তুললে।

প্রথম যে দিন গিয়ে পৌঁছেছি তার পর দিন সকালবেলার কথা।

বন দেখতে বেরোব, তার আগে বাংলোর বারান্দায় ব'সে ফরেস্টার সায়েবের সঙ্গে চা খাচ্ছি আর কাগজপত্র দেখছি। এর মধ্যে দুটো মেয়ে এসে বাংলোয় ঢুকল। সেই দেশী মেয়ে বয়স বেশি নয়, বেদেদের মত ঘাগরা পরনে। বললে, সায়েব কিছু খেতে দেবে? তোমাকে নাচ দেখাব।

আমি বললাম, নাচ দেখাতে হবে না বাপু, পয়সা নিয়ে যাও। ব'লে পয়সা দিতে যাচ্ছি, ফরেস্টার সায়েবটি বাধা দিলে। বললে, খবরদার অমন কাজটি ক'র না। ব'লে ধমকে মেয়ে দুটোকে ভাগিয়ে দিলে।

আমি বললাম, গরীব মানুষ, দুটো পয়সা দিতাম। তাড়িয়ে দিলে কেন?

সে বললে, তুমি এদের জান না তো, ভয়ঙ্কর চীজ। প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, কেন?

সায়েব বললে, এরা হচ্ছে এই দেশী যাযাবর বেদের জাত, দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েগুলো ভিক্ষে করে, নাচ দেখায় আর সেই তাকে ঘুরে ঘুরে খবর যোগাড় করে। আসলে এদের পেশাই চুরি চামারি, তোমাদের ইণ্ডিয়াতে সব ক্রিমিনাল ট্রাইবরা আছে না? ঠিক তাদের মত। পয়সা আছে জানলে রাত্রে এসে খুন ক'রে যাবে তোমাকে। এদের কক্ষণো পয়সা কড়ি দেবে না, বাংলোর ত্রিসীমানায় আস্‌তে দেবে না।

বিশু বললে, এই তো কাছেই বনের মধ্যে ওদের তাঁবু। অনেক লোক, ষাট পঁয়ষট্টি জন হবে, ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সব রকম আছে দেখলাম।

আমি বললাম, যাক, আবার এলে তাড়িয়ে দিস্।

সত্যি দুদিন না যেতে চুরি আরম্ভ হ'ল। চান ক'রে এসে জামা পরব, সোনার বোতামটা উধাও হয়েছে। আতিপাতি ক'রে খুঁজলাম, বৃথা। বিশু বললে, ঠিক ঐ বেদেদের কম্ম। সেদিন শার্ট গায়ে বারান্দায় বসেছিলেন তখন বোতাম দেখে গেছে, আজ ভোরে ঢুকে চুরি করেছে।

অসম্ভব নয়। আমরা চারটি মোটে প্রাণী, যে যার কাজ নিয়ে থাকি। চোরের পাহারা তো দেয় না কেউ। আশেপাশে আর জনমানব নেই, ওরা ছাড়া চুরি করবেই বা কে!

সায়েবকে বললাম। সায়েব বললে, তখনই বলেছি। এবার থেকে সাবধান থাক্‌বেন।

আমি বললাম, সে তো যেন থাক্‌লাম। কিন্তু বোতামটা?

সায়েব বললে, ও গেছে। এদের হাতে জিনিস গেলে স্বয়ং পরমেশ্বরের সাধ্য নেই খুঁজে বার করেন।

আমি বললাম, তবু তো একটা চেষ্টা করা যায়।

সায়েব বললে, কর্‌বে কে? আমার এদের সার্চ বা অ্যারেস্ট করার রাইট্ নেই, সে রাইট্ পুলিসের। পুলিস থাকে বহু দূরে—শহরে।

আমি বললাম, তুমি কিছুই করতে পার না?

সায়েব বললে, আমি পারি এক জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে, তাও যদি গাছ কাটে বা হরিণ মারে তবেই। তা যতক্ষণ না করছে কিচ্ছু করার সাধ্য নেই।

ভাল কথা।

চুরি চলতে লাগল। আজ পেপার-ওয়েট যায়, কাল যায় ছুরি হারিয়ে, তার পরদিন যায় সাবান। সায়েবকে বললাম, এ তো মহা বিপদ দেখছি।

সায়েব বললে, টুকিটাকি জিনিসের ওপর ওদের ভয়ানক লোভ। বুনো জাত কিনা!

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেই অজবনের মধ্যে জিনিস হারালে পাই কোথায় বল তো? মহা সাবধান হয়ে থাকি, তবু কিছু হয় না, যা যাবার যায়ই। লোক দেখি না অথচ চুরি হয়, যেন মন্তরের খেলা।

এমনি ক'রে দিন কাটতে লাগল।

সেদিনটা ভয়ানক খেটেছি। সকালে আটটা না বাজতে বেরিয়ে গেছি, সারাটি দিনই কেটেছে পায়ের ওপর।

ফেরার পথে আবার ফরেস্টার সায়েবের ওখানে হয়ে বাংলোয় এসে যখন পৌঁছলাম তখন ন'টা বেজে গেছে।

বাংলোয় ঢুকেই শুনলাম ভেতরে একটা তুমুল ঝগড়া চেঁচামেচি চলেছে, অযোধ্যা সিং দরোয়ান আর কেরানিতে। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু শুনতে চেষ্টা করলাম। শুনলাম দরোয়ান বলছে, সায়েব এলে আজ আমি সব কথা ব'লে দেব।

কেরানি চড়া গলায় বললে, যা না শালা, বল গে যা তোর বাবাকে।

দরোয়ান বললে, খবরদার বলছি গাল দেবে না। খুব তো ফটং ফটং কর্‌ছ, এস আবার মাসকাবারে ধার চাইতে। খাইয়ে দেব তখন।

কেরানি বললে, তবে রে শালা পাজি।

এর পরে আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বিশু।

আমার আওয়াজ পেয়ে ঝগড়া থেমে গেল। বিশু বেরিয়ে এল। আমি বললাম, ওটা কি হচ্ছিল ?

বিশু বললে, ও তো রোজই হচ্ছে। দুটোই সমান, সারাদিনই ঐ চলে।

আমি বললাম, বল—আমি ডাকছি।

দুটিতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। দরোয়ান রাগে ফুলছে। কেরানি ভিজে বেরালটি, মুখে কথা নেই। সত্যি বলতে, এর আগে আমি লোকটাকে বিশেষ চেয়ে দেখি নি। এখন তার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম, যেটুকু চেহারা চোখে পড়ল, তাইতেই আমার অভক্তি ধ'রে গেল। রোগা পাঁশুটে চেহারাটি, অথচ বাবুগিরির সখটুকুন্ আছে, চুলে ঢেউ-খেলানো টেরি ; হাবা-গোবা মুখ কিন্তু চোখ দুটো সব সময়ে টুলটুল করছে যেন ভয়ানক নার্ভাস—এই ধরণের লোকগুলো বড্ড ছিঁচকে হয়।

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিসের ঝগড়া হচ্ছিল ?

দরোয়ান সেলাম ঠুকে বললে, সায়েব, আপনি বিচার করুন, রসুই ঘরে আস্ত এক টিন ভর্ত্তি চিনি রেখেছি, তার আদ্ধেকের বেশি কেরানিবাবু চুরি ক'রে খেয়ে দিয়েছে।

কেরানি হাঁউমাউখাউ ক'রে বললে, আজ্ঞে না স্যর, খাই নি। সব ঐ শালার বানানো।

আমি ধমকে বললাম, চুপ করুন। সুপিরিয়ারের সামনে এই ভাষা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না ?

দরোয়ান বললে, আপনি নিজে দেখবেন সায়েব, ভাঁড়ারের ঘি মশলা মিষ্টি কিচ্ছু থাকে না, সব চুরি ক'রে ক'রে খায়। বড়ী তাজ্জবকী বাত।

কেরানি বললে, না স্যর, আমি স্যর ভদ্দরলোকের ছেলে স্যর, ওর কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বলছি আমি যদি স্যর খেয়ে থাকি, তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি বললাম, থাক হয়েছে। আপনি অফিস স্টাফ্ আর ও দরোয়ান, আপনি ওর সঙ্গে সমানে ঝগড়া গালিগালাজ করতে যান কি ব'লে ? যে অফিসে আপনি চাকরি করেন, তার একটা ডিগ্‌নিটি নেই ?

সে বললে, না স্যর, আমি গালিগালাজ করি নি।

আমি বললাম, মিথ্যে কথা ব'লে লাভ নেই, একটু আগেই আমি নিজে শুনেছি। ভদ্রলোক কায়েতের ছেলে হয়ে আপনি ইতর ছোটলোকের মত দিব্যি গালেন, এ কী আপনার প্রবৃত্তি! ডিজগ্রেস! ফের যেন আমার কানে এসব না আসে।

দরোয়ানকে বললাম, তোমার যা নালিশ থাকে আমাকে বলবে। তুমি কেন তোমার অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাও ? ফের অমন হ'লে আমি তোমাকে ডিসমিস ক'রে দেব।

দুটোতেই গজগজ করতে লাগল।

সারাদিন খাটুনির পর আবার এই উৎপাত, মাথাটাই গরম হয়ে গেল সেদিন। ঘুম আর পায় না, খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত অবধি বাইরে ব'সে ব'সে বই প'ড়ে কাটালাম।

বিশু আমার ঘরে জলটল দিয়ে মশারি ফেলে দিয়ে গেল। তখন হঠাৎ বললে, দরোয়ান মিছে বলে নি। কেরানিবাবুর একটু হাতটান অভ্যেস আছে।

আমি বললাম, যাঃ।

সে বললে, সত্যি। আপনার চায়ের বিস্কুট পর্য্যন্ত চুরি ক'রে খায়। আমি নিজে দেখেছি।

আমি বললাম, যদি খেয়েই থাকে একদিন, কি হয়েছে? খিদে পেয়েছে, খেয়েছে। এসেছিস বিদেশে বিভুঁয়ে, কোথায় মিলে মিশে সব থাকবি, না খালি ঝগড়া আর খেয়োখেয়ি। বকাস্ নি এখন, যা।

পরদিন খুব ভোরে আমার বেরোবার কথা। কিন্তু অনেক রাত ক'রে শোয়ার ফলে ঘুমই ভাঙল সাতটায়। তাড়াতাড়ি ক'রে মুখ হাত ধুয়ে কিছু খাবার নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে পোষাক পরলাম। দারোয়ানকে বললাম, তৈরি হয়ে নাও, সঙ্গে যাবে।

সে বন্দুক কিরিচ বেঁধে নিলে। বন্দুক ছাড়া এ পথে এক পা চলা যায় না। আমি বিশুকে বললাম, আমার বন্দুক?

বিশু বললে, ঐ তো র‍্যাকে। দেখে নিন।

আমি বললাম, কেন, টোটা ভরিস নি?

সে বললে, তা ভরেছি। তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।

সে কথা ঠিক, সাবধানের মার নেই। বন্দুক ভেঙে দেখলাম তুটি ঘরেই কার্ট্রিজ পোরা আছে।

বেরোচ্ছি, দেখি বাংলোর ঠিক বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কেরানিটি, সেদিনের সেই বেদে মেয়ে তুটোর সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কইছে। আমাকে দেখেই তারা একটু যেন কেমন হয়ে গেল। কেরানি ঘুরে দাঁড়াল। মেয়ে তুটো স'রে পড়ল। আমার তখন এসব দিকে তাকাবার সময় নেই, আমি ভাল ক'রে এদের লক্ষ্যও করলাম না তখন, সোজা বেরিয়ে গেলাম।

দিনের কাজ সেরে যখন বাড়িমুখো হলাম তখন বেলা তুপুর পেরিয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে দারুন, তুজনেই যথাসম্ভব তাতাতাড়ি পা ফেলে চলেছি। আগে আগে আমি, পেছনে দরোয়ান।

পাহাড়ে জায়গা, জমি সেখানে উঁচুনীচু। এক জায়গায় রাস্তাটা একটা মস্ত টিলার গা বেয়ে উঠে আবার নীচে নেমে গেছে। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়ের গা, আর অন্যদিকে বোধ হয় ধ্বস নেমে পাহাড় ভেঙে পড়েছে, সেখানটা প্রায় হাজার ফুট খাড়া খড্। পা ফসকে তার ভেতরে পড়্‌লে আর রক্ষে নেই।

সাবধানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তুজনে এগোচ্ছি।

রাস্তার মাথায় উঠতে তখন অল্প বাকি, হঠাৎ একটা বোট্‌কা গন্ধ নাকে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরোয়ানও আমার পাশে এসে থামল। বললে, উঃ, কিসের বিশ্রী গন্ধ, সায়েব?

বললাল, বাঘ।

দরোয়ান ঘাব্‌ড়ে গেল। বললে, রাম রাম, সে কি কথা?

আমি বললাম, কথা ঠিকই, এ গন্ধ ভুল হয় না। কিন্তু দিনদুপুরে পথের মাঝখানে বাঘ ব'সে কি করছে ?

দরোয়ান বললে, এখন উপায় ?

আমি বললাম, উপায় আর কি, যে ভাবে হোক যেতেই হবে পথ ক'রে। এক কাজ কর, বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে দাও। আওয়াজ শুনলে খুব সম্ভব বাঘ স'রে যাবে। আওয়াজ ক'রেই আবার গুলি ভ'রে নেবে কিন্তু।

কাঁধে ঝোলানো ছিল জলের ফ্ল্যাস্ক আর কাঁটাকম্পাশ, সেগুলোকে নামিয়ে রাখলাম, রেখে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে দরোয়ান বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করলে।

আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে সামনে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝোপ ন'ড়ে উঠল ; তারপরই তার ভেতর থেকে বাঘ গর্জ্জন ক'রে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বাঘ ভয় পেয়ে স'রে যায়, এই চিরকাল জানি। এ বেটা বোধ হয় সন্থ কোথাও তাড়া খেয়েছিল, ক্ষেপে রয়েছে। কিন্তু তখন আর লড়াই করা ছাড়া পথ নেই। দরোয়ানকে ডেকে বললাম, হুঁসিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে সই ক'রে ঘোড়া টিপলাম।

খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল শুধু। গুলি ছোটে নি। সর্ব্বনাশ। বাঘ আমার দিকে ফিরে তাকালে। তখন আর ভাববার সময় নেই ; আবার অন্য ঘোড়াটা টানলাম। আবার খট্ ক'রে শব্দ হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ এসে আমার ওপর পড়্‌ল।

অনেকের ধারণা আছে, বাঘ আড়ি না ক'রে আক্রমণ করতে পারে না। সব বাজে কথা। আড়ি করার কোন ব্যাপারই নেই। বাঘের আক্রমণ একটা অদ্ভুত জিনিস, দেখবার মত দৃশ্য। বাতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে একটা লম্বা আলোর লাইন চোখে পড়ে, দেখেছ ? বাঘের চার্জও কতকটা সেইরকমের। হলদে একটা আলোর রেখা যেন ছট্ ক'রে সামনের দিকে ছিট্‌কে চ'লে যায়, ভাল বোঝাই যায় না কি হ'ল—চোখ পালটাতে না পালটাতে বাঘ শিকারের ওপর এসে পড়ে।

এও তাই হ'ল, বন্দুক নামাতে না নামাতে বাঘ এসে আমাকে ধরলে। সোজা খাড়া হয়ে উঠে সামনের দুই থাবা আমার দুই কাঁধে দিয়ে দাঁড়ালে, তারপর সামনে ঠেলা দিয়ে আমাকে চিৎ ক'রে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাঘেরা অমনি ক'রেই মানুষ মারে—আমি জানতাম। চিৎ হয়ে প'ড়ে গেলে আর রক্ষে নেই, একদম বাঘের মুখের তলায়। প্রথম ধাক্কাতেই প্রায় পড়েছিলাম, বন্দুকটা মাঝখানে প'ড়ে বাঘকে একটু ঠেকিয়ে দিলে তাই বেঁচে গেলাম। পড়তে পড়তে এক পা পেছনে হ'টে গিয়ে টাল সামলে নিলাম, তারপর সুরু হ'ল দুজনে ঠেলাঠেলি। সেও আমাকে ঠেলে ফেলবে, আমিও তার ঠেলা স'য়ে দাঁড়িয়ে থাকব। ৭৩৮/৮১২৫/২/১৩৭৫

সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার গায়ে জোর একটু বেশিই। তবু তার সঙ্গে পারা যায় না। ছ সাত মণ ওজন তার গায়ে, আর দুর্দ্দান্ত শক্তি—সেই ওজন দিয়ে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে, সামলানো কি সোজা কথা। কোট শার্ট ফুঁড়ে আমার দুই কাঁধে তার নখ বিঁধে বসেছে, বেশ টের

পাচ্ছি কাঁধ ব'য়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে আমার মুখ গলা কামড়াবার চেষ্টা করছে, আমি মাথা পেছনে সরিয়ে নিচ্ছি। বাঘের দুই রিস্ট্ আমি দু হাতে ধ'রে ঠেলা দিচ্ছি কাঁধটা যদি ছাড়ানো যায়—কিন্তু সে অসম্ভব ব্যাপার। একটা কিন্তু মজা দেখলাম, কাঁধ ব'য়ে রক্ত পড়ছে, মাংস কেটে তার নখ বসেছে স্পষ্ট টের পাচ্ছি, কিন্তু কাঁধে কোথাও ব্যথা লাগছে না, সমস্ত যেন কোকেন লেগে অবশ হয়ে গেছে। বাঘ সিংহের আক্রমণে এমন হয়—বইয়েও পড়েছি। হয়তো তখনকার মত একটা নার্ভাস প্যারালিসিস্ই হয়, না কি কে জানে।

সবচেয়ে বড় মুস্কিল হ'ল, পাথরের রাস্তা, জুতো আটকাতে পারি না, খালি পা হড়্কে যায়। বাঘ একটা ক'রে ঠেলা মারে, আর আমি এক পা দু পা ক'রে পেছন হটি—নইলে তাকে রাখা যায় না।

দরোয়ান ওদিকে পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। করবেই বা কি—হাতে বন্দুক থাক্‌তেও সে গুলি করতে পারছে না, বাঘ আর তার মাঝখানে আমি, গুলি লাগবে আমার গায়ে।

তবু সে যাত্রা আমার প্রাণ সেই বাঁচিয়ে দিলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, হুঁসিয়ার, খড্। শুয়ে পড়ুন।

খড্! ওকথাটা মনেই ছিল না। তার চীৎকার কানে গিয়ে আচমকা মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইলাম। দেখি, হট্‌তে হট্‌তে রাস্তার প্রায় কিনারায় চ'লে এসেছি, হাত তিনচারেক পেছনেই খড্। আর কয়েক পা পেছলেই হয়ে গিয়েছিল, একদম খড়ের মধ্যে।

খড়ের মধ্যে! ভাবতেই হঠাৎ আরও একটা কথা মনে জেগে উঠল। লোকে শুনলে বলবে—পাগলামো, কিন্তু তখন আমার কেমন মনে হ'ল, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, এই শেষ ভরসা। আর সে সময় তখন সমীচীন অসমীচীন ভেবেই বা কি করব, প্রাণ তো যেতেই বসেছে।

পেছন থেকে আবার দরোয়ানের গলা কানে এল—শুয়ে পড়ুন। হঠাৎ মনে হ'ল যেন দরোয়ানের মুখ দিয়ে ভগবানই আমাকে ওকথা ব'লে দিলেন।

বাঘের দুই থাবা আমার দুহাতে ধরাই ছিল, গায়ে যতটুকু শক্তি ছিল একত্র ক'রে তাকে এক ধাক্কা মারলাম, থাবা একটু যেন কাঁধ থেকে আল্‌গা হয়ে গেল। যেতেই আমি বাঁ পাটা দুমড়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। পড়তে পড়তে দুই হাতে বাঘকে দিলাম এক হ্যাঁচ্কা টান, আর সঙ্গে সঙ্গে ডান পা খানা তুলে বাঘের তলপেটে লাগিয়ে প্রাণপণ জোরে এক ঠেলা মারলাম।

বাঘ এ রকম আচমকা প্যাঁচের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একেবারে উল্টো ডিগবাজি খেয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে সোজা খড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খড়ের কিনারায় ঝুঁকে প'ড়ে চেয়ে দেখলাম, বাঘ একেবারে সেই হাজার ফুট নীচে পাথরের ওপর আছড়ে প'ড়ে সারা হয়ে গেল।

দরোয়ান ছুটে কাছে এল। তার তখনও গলার স্বর কাঁপছে। বললে, সায়েব, এ কি কাণ্ড হ'ল? বড়ী তাজ্জবকী বাত! আমি বললাম, পরমাত্মা বাঁচালে কে মারে, বল?

দরোয়ান ঘাড় নেড়ে বললে, খুব ঠিক কথা।

সে যতটা অবাক হয়েছিল, আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তত আশ্চর্য্য কিছু নয়। ওটা জুজুৎসুর একটা সোজা প্যাঁচ, ওকে বলে—স্টমাক্ থ্রো।

হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানে ব'সে একটু জিরিয়ে নিলাম। বন্দুকটা তখনও মাটিতে প'ড়ে। দরোয়ান সেটাকে তুলে আনলে। বললে, গুলি চলল না কেন?

বললাম, সেইটেই আশ্চর্য্য লাগছে। আসবার আগের দিন টোটা কিনেছি। রডা কোম্পানির মাল তো খারাপ হবার কথা নয়। খোল তো বন্দুক।

দরোয়ান বন্দুক ভেঙে কার্ট্রিজ দুটো বার করলে। অবাক কাণ্ড! তাতে বারুদ গুলি কিচ্ছু নেই, দুটো খালি কার্ট্রিজের খোল শুধু বন্দুকে পোরা ছিল। আমার রক্ত চ'ড়ে গেল। বললাম, বাংলোয় চল, জল্‌দি।

এক রকম দৌড়েই দুজনে বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বিশুকে বললাম, আমার বন্দুকে গুলি তুই নিজে ভ'রে দিস নি?

সে বললে, আমিই তো ভরেছি, কাল রাত্রে। রোজ যেমন ভরি।

আমি বললাম, তারপর, আজ বন্দুক ধরেছিল কে?

বিশু বললে, সকালবেলা তো আপনাকে বললাম, বন্দুক দেখে নিন। কি হয়েছে?

আমি বললাম, দেখে মানুষ নেয় কার্ট্রিজ ভরা আছে কি না তাই। কার্ট্রিজ বার ক'রে দেখে না। কে ধরেছিল বন্দুক, তাই বল?

বিশু বললে, কেরানিবাবুকে একবার দেখেছিলাম বন্দুকের কাছে ঘুরঘুর করতে। তাইতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

বললাম, ডাক তাকে।

কেরানি এল। তাকে বললাম, তুমি আমার বন্দুক ধরেছিলে কেন?

কি বুকের পাটা, বেমালুম ব'লে দিলে, কই, আমি তো ধরি নি।

বিশু বললে, ধরেছেন। আমি দেখেছি।

কেরানি খ্যাঁক্ ক'রে উঠল, তবে রে ব্যাটা পাজি, মিথ্যে নালিশ করছ! আমি শুর ভদ্দলোকের ছেলে স্যর, আমি বন্দুক দিয়ে কি করব?

আমার আর সহ্য হ'ল না। তার চুলের মুঠি ধরে ঠাস ক'রে এক থাপ্পড় কষিয়ে বললাম, ফের ইতরামো! বল, কেন ধরেছিলে বন্দুক? কার্ট্রিজ বার ক'রে নিয়ে খালি খোল পুরে রেখে দিয়েছে, আমাকে খুন করবার মতলব?

সে ব্যাটা কথার জবাব দেয় না, খালি মোচড় খায় আর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। আমি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আজ মেরেই ফেলব তোমাকে। কি করেছ কার্ট্রিজ দিয়ে?

বলতেই সকালবেলার কথা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, আমি যখন বেরোই, সেই বেদে মেয়েদের সঙ্গে তোমার অত কি কথা হচ্ছিল?

সে বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল স্যর, তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

দরোয়ান বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল, তাই তাদের সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছিলে? বড়ী তাজ্জবকী বাত।

আমি বললাম, বুঝেছি। কার্টিজ চুরি ক'রে তাদের কাছে বেচেছ। ভেবেছিলে এক ঢিলে দুই পাখী মারবে, পয়সাও হ'ল আমিও মরলাম, কেমন?

সে তখনও গোঁ ছাড়বে না। হাউ হাউ ক'রে বললে, মিছে সন্দেহ করছেন আমাকে স্যর, এ সব দরোয়ানের কাজ। আপনাকে বলছি, আমি যদি স্যর ক'রে থাকি তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি তার চুলে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, চুপ। লোকটা এবারে বুঝলে তার পরিত্রাণ নেই। বুঝে সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ কর্‌তে করতে দুই হাতে আমার হাতটাকে খিমচে ছ'ড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিলে।

তারপরে আর ধৈর্য্য থাকে না। বিশু আর দরোয়ান ছুটে এল, বললে, আপনি ছেড়ে দিন সায়েব, আমরা দেখে নিচ্ছি।

আমি বললাম, না।

লোকটার মুখ দিয়ে তখন গাঁজলা ভাঙছে, দুই চোখ রক্তবর্ণ, পাগলের মত। দাঁত বার ক'রে বললে, বেশ করেছি। কেন আমাকে কাল গাল দিয়েছিলে?

আমি বললাম, সেই রাগে তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে? নাও, এবার কর খুন। করলে না?

ব'লে ঠাস ঠাস ক'রে আর কয়েকটা চড় মারলাম, চড়ের চোটে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর লাথি মেরে মেরে তাকে বাংলো থেকে দূর ক'রে দিলাম। বললাম, থানা পুলিস করা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু ফের যদি তোমাকে এখানে দেখতে পাই তো আর জ্যান্ত ফিরবে না, মনে রেখো।

সে আর কথাটি কইলে না, উঠে সুড়্‌সুড় ক'রে স'রে পড়ল।

আমি দেশে ফিরলাম আরও মাসখানেক পরে। সে লোকটা দেশেই ফিরেছে, কি পথে তাকে বাঘেই খেয়েছে--ভগবান জানেন। কিন্তু ভেবে দেখ তো কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বনের মধ্যে বাঘে তাড়া করবে এর মধ্যে আশ্চর্য্য কিছু নেই, সে জন্যে মানুষ তৈরিও থাকে। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল বন্দুকে গুলি নেই, সত্যিকার বিপদ বলে এইটিকে। এইতেই মানুষ মারা পড়ে। সেইজন্যেই বলেছিলাম, মাথা কখনও হারাবে না, কখন কি উপায়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে, তার কিছু ঠিক নেই। নইলে কবে কোন্ ছেলেবেলায় শিখেছিলাম জুজুৎসু, তখন কে জানত পঁচিশ বছর পরে সেই বিদ্যে এমন ক'রে কাজে লেগে যাবে!

নীলাবরণ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

পাহাড়ের শুষ্ক শীত। দিগন্তে তপন।
দূর নীলাবরণের নিঃসঙ্গ চূড়ায় ব'সে ভাবি শুধু,
বিস্মৃত যুগের কাব্য এখানে কি মূর্তি ল'বে।
গ্রন্থ প'ড়ে কাটায়েছি দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন।
বহুমতঘূর্ণাস্রোতে ভেসে ভেসে, অবশেষে
এ তীরে ঠেকেছি এসে।
স্বপ্নের দলিতাঞ্জনে এবার এ ক্লান্ত চোখ লভিবে কি শান্তি-অবলেপ,—
ফিরে যাব মানুষের শৈশবের বিস্মৃত প্রদোষে,—
মেঘনীল-গিরিবলয়িত, সংকীর্ণ স্বপ্নের দেশে,—
বর্বরের আদিম বিস্ময়ে।

ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখি সূর্য নামে অস্ত-পারাবারে ;
নিঃশব্দচরণে আসে অন্ধকার,
সূর্য-চন্দ্র বিরহিতা, অনাথা সন্ধ্যাকে করে গ্রাস।

এখানে শরীরী স্বপ্ন। হেমন্তের শান্ত বায়ু
ভেষজলতার মৃদু গন্ধ বয়।
হেথা বন-কুক্কুটের কম্পমান প্রতিধ্বনি
সানুর সোপান বেয়ে পায়ে পায়ে দূরে চ'লে যায়।
হেথা শ্যাম দিক্-প্রান্তে আঁখি পায় অপার নীলিমা ;
হেথা ঘনতর নীল শুয়ে আছে দিগন্তে পাহাড়,—
শিলীভূত বৃত্রদেহ সন্ধ্যাস্নিগ্ধ দূর মহিমায় ;
তারি 'পরে ইন্দ্রাসনে কাঁপে ক্ষণ-স্তিমিত বিদ্যুৎ।

ওগো দূর পুরাতন। আজিকার নির্জন প্রদোষে
তোমার অস্ফুট ভাষা শুনি শান্ত, সুদূর তারায় ;
পড়ি লেখা পশ্চিমের ম্রিয়মান বর্ণ আলিম্পনে
স্বপ্নলোক-নির্বাসিত কিন্নরের লুপ্ত ইতিহাস।

হে করুণ আদিযুগ। হেথা তুমি কম্পমান রুদ্ধশ্বাস-স্পন্দিত ব্যথায়।
তোমারে খুঁজিয়া ফিরে মৃগয়ার নিষ্ঠুর ব্যসনে
বাষ্পতরী, বাষ্পরথ, বিষস্রাবী আয়স শকুন
উত্তরের 'তুন্দ্রা' হ'তে দক্ষিণের শ্যাম 'সাভানা'য়।

ওগো ত্রাসহতা। জানি আমি কোথা শেষ এর।
একদিন এ নিভৃতে কুব্জপৃষ্ঠ মানুষের
ক্লান্ত অস্থিবেদনার নিরশ্রু কান্নার বিষে
যন্ত্রের উদগীর্ণ ধূমে নিরালোক নভোদেশ
সান্ত্বনা হারাবে। দীপ্ত, রূঢ়, বিদ্যুৎ-আলোকে
ম্লান দৃষ্টি, শীর্ণদেহ, পণ্ডিত পড়িবে বসি'
কালিদাস, ভবভূতি, বেদব্যাস, বাল্মীকি, হোমার।
—মনে কি জাগিবে ছবি অতীতের স্মৃতি সকরুণ:
এই শ্যাম বনরেখা, শৈলশ্রেণী—দূরতর, নীল,
অকলঙ্ক সন্ধ্যাকাশ, পায়ে-চলা দীর্ঘ প্রতিধ্বনি।
জ্যোতিহারা শ্রান্তচোখে দেখিবে কি বসি' বাতায়নে
সন্ধ্যাসূর্য অস্ত যায় মেঘ-তিরস্করণীর পারে
বিষবাষ্পসমাচ্ছন্ন, ধূলিধূমক্লিন্ন পশ্চিমের
শোণিতাক্ত কর্দ্দম-শয্যায়?

যা হ'বার হবে জানি। প্রবাসের মুষ্টিমেয় দিনগুলি মোর
শান্তি পাক্, হে মুমূর্ষু। তোমার করুণ স্নেহচ্ছায়ে।
সম্মুখে জীবন-স্রোত আশাহীন অকূল পাথার;
তা'র মাঝে এ ক'দিন স্বপ্নদ্বীপে শুনি শান্ত গান।
দূর গৃহে সন্ধ্যা জ্বলে। সমাসন্ন রাত্রি-অন্ধকার।
দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে ফিরে যাই প্রবাস-কুটীরে।

স্বপ্ন-কামনা

শ্রীসুশীল জানা

রাত তিনটের ট্রেনে সুজাতা এসে পৌঁছল। প্লাটফর্মে নীরেন এসে অপেক্ষা ক'রছিল প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে—তার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'তে রহস্যময় চাপা হাসিতে সুজাতার আনন্দ-উচ্ছল অন্তরটি যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে ওরা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে ব'সল।

নীরেন হেসে ব'ললে, তুমি বেশ একটু মোটা হয়েছ দেখছি। পাশা-পাশি আগেও তো ব'সেছি, কোন অসুবিধে বোধ করি নি কিন্তু এখন কেমন জায়গা কম কম ব'লে মনে হচ্ছে।

ভ্রূকুটি ক'রে সুজাতা ব'ললে, খুঁড়তে আরম্ভ ক'রেছ যখন, দু'দিনেই শুকিয়ে যাব। তোমাকে অত রোগা দেখাচ্ছে কেন?

—বিরহে। নীরেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ললে, যাক দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আমার ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিয়ে যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাজ ক'রেছ। যেটুকু বাকি আছে, সুমুখের সীটে ব'সে সেটুকু শেষ কর।

—আমি উঠব না তো। গাড়িটাই ছোট, তাই তোমার ওরকম ভুল মনে হ'চ্ছে।

—ভুল? তবে ভুলটা বেশ করুণভাবে উপলব্ধি করা গেল। আর না—

সুজাতার পাশ ছেড়ে নীরেনই উঠল।

কিন্তু হঠাৎ যেন ওরা এক লাফে ছেলেমানুষির দিনগুলিতে গিয়ে পৌঁছল। কৃত্রিম কলহ, ঠেলাঠেলি, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সুজাতাকে হারান গেল না; নীরেনের পাশে সে ব'সবেই। চব্বিশ বছরের সুজাতা আজ বহু দূর অতীতের আনন্দ-উচ্ছল ছেলেমানুষটির মত; ছিঁড়লই বা সুজাতার ব্লাউজ—ভাঙে, ভাঙুক নীরেনের রিষ্ট্ ওয়াচ্।

বিয়ে করেছে ওরা প্রায় এক বছর। দু'পক্ষ থেকেই সে বিয়েতে অভিভাবকদের কোন সম্মতিই ছিল না। নিজেদের নিরবলম্ব অবস্থা বেশ ভেবে চিন্তে দেখেও তবু ওরা বিয়ে ক'রেছে। তারপর সুজাতা চলে গেল একটা মফঃস্বল সহরে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে আর নীরেন বড় কিছুর আশা ত্যাগ ক'রে কলকাতার মেসে পড়ে রইল ইন্‌সিওরেন্সের দালালী নিয়ে। এই ওদের প্রথম দীর্ঘ ছুটি। নীরেনকে সুজাতা লিখেছিল: হোষ্টেল থেকে সবাই চলে গিয়েছে, আমার ভাল লাগছে না এখানে। তোমার কাছে কবে যাব? তাই ছুটির দিনগুলি ওরা কাটাবার ব্যবস্থা ক'রেছে ভুবনেশ্বরে—তারপর তারা পুরীর সমুদ্র দেখে ফিরবে।

সুজাতা বেশ একটি একটি ক'রে গুছিয়ে ব'ললে, ইনসিওরেন্সের দালাল—ব'লেই সে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। দালাল কথাটায় তার ভারী হাসি পায়।

নীরেন গম্ভীর ভাবে সুজাতার অনুকরণে ব'ললে, নোয়াখালীর হেডমাষ্টারণী—ব'লে দাঁত বের ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রলে।

সুজাতা ব'ললে, পশ্চিমের দিকে বেড়াতে গেলে কি চমৎকার হ'তো বল তো।

—বটে। এক কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ না ক'রলে পশ্চিমে গিয়ে সমুদ্র দেখতে পেতে? আর স্বাস্থ্য? ও স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গেলেও সুবিধে হবে না।

—থাক, আর দালালী করতে হবে না। ধমক দিলে সুজাতা, ব'ললে বাসা ঠিক ক'রে রেখেছ তো? তুমি এখানে কবে এলে?

—আজ সন্ধ্যের সময়। বাসাটি ভারী চমৎকার হয়েছে সু—উচ্ছসিত হ'য়ে নীরেন ব'ললে, খড়ের ছাউনি বাংলো—জানালা খুললেই পাহাড়ের চূড়ো···দূরের দিকে কত পাহাড়, সূর্য্য উঠলেই ঘরে রোদ···

—ফের দালালী। আজ সন্ধ্যের সময় তুমি তো সবে এলে। মিথ্যে কথা দেখছি মুখে আর আটকায় না।

নীরেন মুচকি হেসে ব'ললে, ভারী বিশ্রী বদ অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে সু—মাঝে মাঝে আমাকে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিও তো।

বাংলোয় এসে ওরা উঠলে। পাশা-পাশি হু'খানি ঘর—চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কম্পাউণ্ড। নীরেন আলো নিয়ে সুজাতাকে দেখাতে যাচ্ছিল—সুজাতা ব'ললে, এখন থাক—ও সকালে দেখব, এখন একটু শুতে পারলে বাঁচি। ঘর ধোয়া নেই দেখ্‌ছি, খাটের ব্যবস্থা নেই?

—হুঁ, পালঙ্ক দেবে, গদী দেবে, জাজিম, ফরাস, চাই কি আলবোলা···

সুজাতা হেসে ব'ললে, দড়ির খাটিয়া একটা পড়ে আছে দেখছি। ওখানে কম্বল পাতা তোমার নিশ্চয়ই।

—হুঁ, ঘণ্টা কয়েক ওরই ওপরে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। ওই খাটিয়াটুকু আদায় ক'রতে দারোয়ানকে কম খোসামোদ ক'রতে হ'য়েছে। যাক, কাপড়-চোপড় ছাড়তে হয়—ছেড়ে ফেল, রাত এখনও বেশ আছে। শোবার একটু ব্যবস্থা করে ফেল। আমি গেটটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসি।

নীরেন ফিরে এসে দেখলে—সুজাতা নীরেনের খাটিয়ার ওপরে চোখ বুজে পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়েছে।

নীরেন আতঙ্কিত কণ্ঠে ব'ললে, আরে···ওঠ ওঠ দেখি···

সুজাতা ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে দাঁড়াল। নীরেন গম্ভীর হ'য়ে শুয়ে পড়লে—ব'ললে, দোহাই, এখানে আর শোবার চেষ্টা ক'রো না। নিজের বিছানা-পত্র আনোনি কেন?

সুজাতা হেসে ফেললে, বললে, দেখো আমি আর পারচি নে। ঠায় ব'সে ব'সে—ব'লে সে খাটিয়ার ওপরে ব'সে পড়লে।

নীরেন হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। ব'ললে, তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে গরীব বেচারীর খাটিয়াটাকে তাই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আরে আরে—শোয়ার চেষ্টা ক'রো না, ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

দেখো, আমার বড্ড মাথা ধরেচে—ব'লে সুজাতা নীরেনের হাতটা কপালে চেপে ধরলে আর নীরেনকে বেষ্টন ক'রলে একটা হাত দিয়ে। ওঠবার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। ক্লান্ত কণ্ঠে ব'ললে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় কদিন ভোগার পর এমন দুর্বল ক'রে দিয়েচে।···

—কই জ্বরের কথা কিছুই তো জানাও নি ?

—মরবার ভয় তো ছিল না। মিছি মিছি তোমার কাজের ক্ষতি ক'রে…

—যাক, ঘুমোবার একটু চেষ্টা করো; মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। সকালে আবার অনেক হাঙ্গাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুজাতা ঘুমিয়ে পড়ল।

নীরেনের আর ঘুম এল না। গলার ওপর থেকে সুজাতার হাতটি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে, বুকে গোঁজা মাথাটি সোজা ক'রে দিয়ে নীরেন উঠে বসল। সুজাতার অসহায় ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ওর মায়া হলো। ঘুমন্ত মুখের অস্পষ্ট হাসি, মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস সুজাতাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুলল। বহুপরিচিত পুরান সুজাতা নীরেনের কাছে নতুন ক'রে লোভনীয় হ'য়ে উঠল। পাশা-পাশি থাকবার মত অর্থসঙ্গতি ওদের নেই। যে সংসারের ছায়া থেকে ওরা বঞ্চিত হ'য়েছে—ভবিষ্যতের জন্যে তেমনি একটি সংসার গড়ে তুলবে ওরা, দুটি জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলবে। তাদের ছেলে-মেয়েরা সংসারের প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে উপলব্ধি ক'রবে তাদের শ্রমিক কর্তব্য কঠোর জীবনকে। নীরেন ধীরে ধীরে সুজাতার বিস্রস্ত চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিলে। এমনি একটি সুন্দর সাথীই সে কামনা ক'রেছিল—ভগবান তাকে নিরাশ করে নি। চোখ দিয়ে তারা বহুজনের মাঝে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিয়েছিল। আলাপ নেই, পরিচয় নেই—কিন্তু কতক্ষণ তারা চোখা-চোখি চেয়ে থাকত!—মনে প'ড়ে নীরেনের হাসি পেল, কি ছেলেমানুষি!

ভোর হ'য়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুজাতার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু তবু সে চোখ বুজে চুপ ক'রে পড়েছিল; সুখকাতর পশুর মত সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে নীরেনের হাত বুলানোর স্পর্শটুকু যেন উপভোগ করছে। মনের এই কাঙাল বৃত্তিতে সুজাতার কেমন হাসি পেল—ঠোঁটের ওপরে হাসিটি রেখায়িত হ'য়ে উঠল।

নীরেন ব'ললে, হাসলে যে! অনেকক্ষণ ভোর হ'য়ে গিয়েচে—ওঠো এবার।

সুজাতা চোখ মেলে ব'ললে, তুমি কত বড় স্ত্রৈণ তাই ভাবছিলাম—আর হাসি পাচ্ছিল।

নীরেন ব'ললে, আর আমি দেখছিলাম, তুমি কতকক্ষণ ঘুমের ভাণ ক'রে প'ড়ে থাকতে পার।

সুজাতা হেসে উঠে ব'সল।

নতুন ক'রে ঘর পাততে হবে—অনেক কাজ তাদের।

ঘর গুছিয়ে উঠতে প্রথম দিনটি কেটে গেল দু'জনের। পরের দিন কথা কয়ে সময় কাটাবার মত অবসর হ'লো তাদের।

সুজাতা এক তাড়া চিঠি নীরেনের হাতে দিয়ে ব'ললে, আমার বিধাতা-পুরুষের নতুন চিঠি।

চিঠিগুলো নাড়া-চাড়া ক'রতে ক'রতে নীরেন ব'ললে, বিধাতা-পুরুষটিকে ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তো!

সুজাতা হেসে ব'ললে, ভুলে গেলে সব এরই মধ্যে! বাস রে, যেখানে গিয়েচি—সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে চিঠি। ঠিকানা যে কোথায় পায়—তাই ভাবি। অথচ ভদ্রলোক যেই হোন কোথায় থাকেন, নামটাই বা কি, কোনদিন জানালেন না। নইলে আলাপ ক'রে আসতুম।

—অর্থাৎ আমাকে বেদখল দেবার মতলব।

দু'জনেই হেসে উঠলে। বিধাতা-পুরুষকে নীরেনের মনে পড়েচে। বাস্তবিক, যেই হোক, সে অদ্ভুত লোক। সুজাতাকে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে কিন্তু উত্তরের কোন প্রত্যাশা রাখেনি। চিঠি-গুলি দীর্ঘও নয়—অসম্মানজনকও নয়। অল্প কথায় নিজের নিঃসঙ্গতাকে জানিয়ে এসেছে শুধু। হয় সে মস্ত বড় এক কবি—নয় সে মস্ত এক পাগল।

নীরেন একখানি চিঠি খুলে ব'ললে, আরও অনেক চিঠি ছিল না?

—ছিল তো—কিন্তু কোথায় সব হারিয়ে গিয়েচে।

—উঃ, নিষ্ঠুর! মাষ্টারণীই বটে।

সুজাতা হেসে ফেলে ব'ললে, দেখো তো ওগুলোয় কি লিখেচে? আমি পড়ে দেখবারও আর সময় পাই নি। সেই একই কথা বোধ হয়—না?

—শোন তবে···

···চরম নিঃসঙ্গতাকে ঢেকে রাখবার জন্যে পৃথিবীর কত চেষ্টা, কত বিচিত্র আয়োজন, মানুষ তার পুরোহিত। আমার চোখের সুমুখের আকাশ, সন্ধ্যাতারাটি, দিগন্তপ্লাবিত জ্যোৎস্না এক বিরাট মহাশূন্যতায় অপেক্ষা ক'রচে—নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয়, আমার কিছুই পাওয়ার নেই, কিছুই পাবো না কোন দিন।···

সুজাতা হেসে ব'ললে, বাস রে!

শোন আর একখানা চিঠি।

উঁহুঁ, ও আর সহ্য হবে না। ও তুমি তোমার সময় মত প'ড়ো'খন। বুঝলে, গরীবের ঘোড়া রোগ ভাল নয়। খেটে খাই, কাজের কথায় এস। তোমার দালালী কেমন চলচে বলো তো, আমি একটা ইনসিওর ক'রবো ভাবচি।···

নীরেন বদলে গেল। উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে, বাস্তবিক ক'রে ফেল। কখন কি হয়—যন্ত্রযুগে জীবন যে রকম সঙ্কটাপন্ন···তাছাড়া নতুন হ'লে কি হবে—বেশ ভালো কোম্পানি, বিশ্বস্ত··· দিব্যি মোটা টাকা···

সুজাতা হেসে লুটিয়ে পড়ে ব'ললে, পাকা দালাল বনে গিয়েচ দেখচি। আমি তোমার স্ত্রী—সে খেয়াল আছে? শিকারের সন্ধান পেলেই কোন জ্ঞান থাকে না আর—না?

অভ্যেসের দোষ—নীরেন অপ্রতিভ হ'লো। গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, বুঝতে পারচি এবার—বিধাতা-পুরুষ ভদ্রলোক কেন তোমাকে নাম ঠিকানা আজও জানালে না। তুমি যে নোয়াখালীর হেডমাষ্টারণী তিনি নিশ্চয়ই জানেন। ঠিকানা পেলে কবে হয়ত গিয়ে কান মলে দিয়ে আসবে—ধমকানিতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটবার আশঙ্কাও কম না।···

বাস্তবিক কত চিঠি পেয়েছে সুজাতা এ পর্য্যন্ত, মনের ওপরে তার প্রভাব একটুও নেই। তার জীবনের প্রত্যেকটি দিকে নীরেন এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন একটুও হয়নি; তার সমস্ত চিন্তার দূরত্ব নীরেনের কাছে এসে থেমেছে। সুজাতার এই জগতের মধ্যে বিধাতা পুরুষের পরোক্ষ আবির্ভাব সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক। প্রথম দিকে সুজাতা চিঠিগুলি

পড়ে হাসত—সে হাসি বিজয়িনীর জয়তৃপ্ত হাসি; সুজাতা এখন যা হাসে, সেটা কেবল সাধারণ একটা আমোদ। এদিক দিয়ে সে এতখানি সহজ ও সঙ্কোচহীন যে, তার মনে পলকের জন্যেও সন্দেহ হয় নি—নীরেনের মনে এর জন্যে কোন প্রতিক্রিয়ার আলোড়ন অথবা নাটকীয় পরিসমাপ্তি একটা সম্ভব হ'তে পারে।

বাংলোর গেট ঠেলে পিয়ন নীরেনের হাতে চিঠি দিয়ে গেল।

সুজাতা হাসি মুখে ব'ললে, ওই রে—বিধাতা-পুরুষের চিঠি এল বুঝি!

—আজ্ঞে না, এটা আমার রীতিমত অফিসসংক্রান্ত চিঠি।

—বাসরে—দালালীর চিঠি বলো! কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য লাগচে—সাত দিন কেটে গেল, এবারে বিধাতা-পুরুষের চিঠির দেরি হ'চ্ছে যে বড়! নেশা কেটে গেল না কি?

নীরেন হেসে বললে, ঠিকানা পায় নি বোধ হয়।

—ভির্মি লেগেচে তা হ'লে। আশ্চর্য্য হই—ভদ্রলোকের কি কোন কাজ-কর্ম নেই! পুরুষ জাতটা যেমনি হ্যাংলা—তেমনি বেহায়া।

—এবং দালাল। সুজাতার অনুকরণে বাকীটুকু যোগ ক'রে দিয়ে নীরেন ব'ললে, তারা হেডমাষ্টারণীকে চিঠি লিখতে সাহস করে! দাও ওকে হাইবেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে। নীরেন হুঙ্কার ছাড়লে। তারপর চাপা গলায় ব'ললে, তবে চিঠি না আসবার জন্যে মনে মনে যদি রেগে থাক—তা হ'লে মাভৈঃ, আমি নিজে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসব।

কিন্তু একে একে তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল—বিধাতা পুরুষের চিঠি এল না। মাসের পর মাস ধরে ক্রমাগত চিঠি আসত—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত তাই সেটা ছিল বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এখন আর চিঠি আসে না—সুজাতার জীবনে এইটাই এনে দিলে বৈচিত্র্য। মনকে সহসা সচেতন ক'রে তুললে এইটাই। চিঠি এসেছে—খাম খুলেই পত্রপ্রেরক দেখেই টেব্‌লের এক পাশে সরিয়ে রেখেছে—পড়ে দেখবার কৌতূহলটাও হয়নি। এ যেন ভৃত্যের সহজপ্রাপ্য শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি—যার সম্বন্ধে প্রভুর সচেতন হ'বার কোন প্রয়োজনই নেই; অবহেলা করাটাই প্রভুর সহজ ধর্ম।

কিন্তু সেদিন যখন গেটের সুমুখে পিয়নকে দেখা গেল, তারপর সে সুমুখের রাস্তা দিয়ে চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন সুজাতার প্রথমে মনে হয়েছিল, গেট ঠেলে পিয়ন ঢুকলো বুঝি—একখানা খাম···বিধাতা-পুরুষকেই মনে পড়েছিল সুজাতার। কিন্তু পিয়ন চলে গেল—সুজাতার মন খারাপ হ'য়ে গেল। তার মনে হ'লো—কে যেন বিশ্রী ভাবে মুখের ওপরে এক'গাদা অপমানের কালি হাস্যকর ভাবে ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

দিনের পর দিন গেল—আবার একটি সপ্তাহ কেটে গেল; বিধাতা-পুরুষের চিঠি এল না। নীরেনের চিঠি পত্র আসে—আজকাল সেই সব চিঠির সামান্য শিরোনামটুকুও পড়তে কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা বোধ করে সুজাতা—সাহস ক'রে অনেক সময়ে চিঠিগুলোর দিকে তাকাতেও পারে না। অপেক্ষায় থাকে—তার নামের চিঠি থাকলে নীরেন নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু চিঠি একখানিও এল না। অপেক্ষমান মনের পরিবর্তন সুজাতা নিজেও বুঝল না—নীরেনও বোঝে নি।

সুজাতা ভাবে, চিঠি তাকে লিখবেই বা কে! এত বড় দুনিয়ায় এমন কেউই নেই যে তাকে

চিঠি লিখবে, যে তাকে মনে করে রেখেচে। কেমন একটা সূক্ষ্ম অভিমানে বুক তার ভারি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কারুকেই মনে পড়ে না, কিন্তু পৃথিবীর সকলের ওপরে মন তার বিরূপ হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। ডাকঘরে গিয়েছিল নীরেন—ফিরে এল একখানা চিঠি নিয়ে। নীরেন তারই দিকে এগিয়ে আসচে ক্রমশ—সুজাতার বুকের স্পন্দন হঠাৎ যেন বেড়ে গেল—ভালো করে সে তাকাতে পারলে না নীরেনের দিকে।

নীরেন বললে, তোমার চিঠি—বিধাতা-পুরুষের এতদিনে করুণা হলো বোধ হয়। বলে সে হাসলে।

উত্তরে আজ সুজাতা একটিও চটুল কথা বলতে পারলে না আগের মত; আজকের সুজাতার সঙ্গে পুরান সুজাতার অনেক তফাৎ। সে কাঠের মত বসে রইল। পাথরের মত তার দৃষ্টি—অবনত, দুই কানে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ আর অশ্রান্ত ঝিঁঝির আর্তনাদ।

নীরেন চিঠিখানি দিয়ে চলে গেল।

বহুক্ষণ পরে সুজাতার সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা কাটল। খামের ওপরে শিরোনামাটুকু পড়বার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। এ যে বিধাতা-পুরুষের চিঠি—সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। কি জানি, আলো জ্বেলে চিঠি পড়বার মত তার সাহস হ'লো না। নীরেনের উপস্থিতিকে আজ সে এড়িয়ে যেতে চায়। চিঠিটা সে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

দুপুর বেলা নীরেন থাকে না—তাসের আড্ডায় যায়। সেই অবসরে চিঠিখানি খুললে সুজাতা। দেখলে, চিঠিটি বিধাতা-পুরুষের নয়—একটি সহকর্মী শিক্ষয়িত্রীর। হতাশায় সমস্ত মুখ তার পাংশু হ'য়ে গেল।

কেবল বিধাতা-পুরুষের চিঠির অপেক্ষাতেই সে নেই—ছিঃ! এই ব'লে মনকে একদিন শাসন ক'রেছিল সুজাতা। মনে মনে ব'লেছিল, তবু কোন বন্ধুর কাছ থেকেও তো সে চিঠি পেতে পারে! কিন্তু তা যখন পেলে—মন তার খুসীতে ভরে উঠল না একটুও।

চুপ ক'রে সে ব'সে রইল—চিঠিটা পড়বার মত কোন স্পৃহা তার ছিল না। বিধাতা-পুরুষের নতুন চিঠি ব'লে সেদিন নীরেনকে যে চিঠিগুলি সে দিয়েছিল—সেগুলি সেদিন থেকে অযত্নে অদূরে ছড়ান হ'য়ে পড়েছিল। সুজাতা শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর উঠে গিয়ে অন্য মনে একখানি চিঠি তুলে নিলে। বাইরে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে চিঠিখানি পড়লে—

পৃথিবীকে এত গভীর ক'রে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই কি সে আজ দেখিয়ে দিলে—ওই দেখ: আমার দিগন্তপ্রসারী রৌদ্রস্তব্ধ মাঠের পর মাঠ—ওই যে নিঝ্‌ঝুম দিগন্তের কোলে ধোঁয়ার মত তালগাছটি কতো একা! তোমার রক্তেও যে ওই নিরালম্ব নিঃসঙ্গতার বিষ মিশে রয়েছে—তাই তো তুমি যতদূরে তাকাও কেবল ক্লান্ত শূন্যটাকেও নিঃশব্দে ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে দেখ। আমার দূরবনান্তে যে সাথীহারা ঘুঘুটি কেবলি ডেকে ডেকে মরছে, মাঠের শেষের ওই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বটের ছায়ায় রাখালের যে বাঁশীটি মধ্যাহ্নস্তব্ধ দূর-দূরান্ত সুরের ঘায়ে ঘায়ে মূর্ছিত ক'রে তুলছে, তাতে সমস্ত অন্তর যে তোমার হুহু ক'রে উঠবেই। এ নিঃসঙ্গতার জন্যে অভিশাপ দিও না—এই তোমার পরম পরিচয়।

তারপর সুজাতা স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। নীরেনের কথা মনে পড়ল, নিজের সুদূর প্রবাসজীবনের কথা মনে পড়ল, বিধাতা-পুরুষের কত চিঠি হয়ত এতদিনে তার টেব্‌লের ওপরে জমা হ'য়েছে। হয়ত চিঠি আর আসেই না—কোথায় কতদূরে থাকে সে···তার চারপাশের দুরন্ত নিঃসঙ্গতাকে আর সহ্য ক'রতে না পেরে হয়ত সে এই পৃথিবীর কাছ থেকে একেবারেই বিদায় নিয়েচে! আঃ—জীবন যার এত দীন···তার আবার জীবন? এই তো মাত্র তার চব্বিশ বছরের জীবন—স্বপ্নের তৃপ্তি রূঢ় বাস্তবের ঘায়ে ভেঙে ভেঙে গেল। আবার সপ্তাহ দুই পরে কতদূরে চলে যেতে হবে!

খণ্ডগিরির আঁকা-বাঁকা রাঙা মাটির পথটি দু'পাশে দূরবিস্তৃত প্রান্তর নিয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে, ধূধূ প্রান্তরের শেষে ভরতপুরের অরণ্যের আবছা কালো রেখাটির ওপরে উদাস দিগন্তের কোলে একটি চিল কালো বিন্দুর মত ঘুরপাক দিচ্ছে, বহুদূরে বরুণ পাহাড়ের আবছা শিখরদেশ—রৌদ্রঝলোমল রেলের লাইন তার দুরন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রার মাঝে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। যতদূর চোখ যায়—প্রান্তরের সুরু থেকে দিগন্তের সীমা পর্য্যন্ত সব যেন নিঃসঙ্গ। বিষণ্ণ মধ্যাহ্নের এই বিশ্বজোড়া একাকীত্বের মাঝখানে সুজাতার সুমুখে—পথের ধারে ওই যে অশ্বত্থ গাছটি—এক একটি পাতা মাঝে মাঝে দোল খাচ্ছে—সেও যেন নিজের স্তব্ধ ছায়ার ওপরে ঝিম হ'য়ে আছে। নীরেন, বিধাতা-পুরুষ, ঘর-সংসার—ধীরে ধীরে সমস্ত জিজ্ঞাসা সুজাতার মন থেকে মুছে গেল। তার মনে হ'লো—সেও বড় একা। কোন দিন সে কিছু যেন পায় নি—পাওয়ার কোন প্রত্যাশা নেই। সকলের ভালবাসা, মায়া-মমতা থেকে বহুদূরে সে একা। ওই যে একটি পাখী পাখা কাঁপিয়ে দূরের দিকে উড়ে উড়ে চলেছে—তারপর কোথায় হারিয়ে গেল—সে কোন এক স্বপ্নগহন দেশে সুজাতাকে টেনে নিয়ে চলল। এই পৃথিবীর কাছে সুজাতার সবই দুরাশা—সব!

নীরেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুজাতার স্তিমিত দূরচারিণী দৃষ্টিটুকু বড় ভাল লাগে তার—সুজাতার এই দৃষ্টিটুকুই প্রথমে ভালবেসেছিল সে—আজ আবার নতুন ক'রে যেন ভালবাসলে। মনে পড়ল—বিধাতা-পুরুষ এই দৃষ্টি সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে লিখেছিল:

তোমার চোখ তুলে চাওয়াটুকু আজও আমার মনে পড়ে। সে দৃষ্টিতে ছিল ভীরুতা—জলাভূমির হিমসিক্ত আবহাওয়া। তুমি যখন তোমার স্তিমিত ভীরু দৃষ্টি তুলে তাকাতে তখন আমার মনে হ'তো: কোথায় যেন চিরবৈরাগী এক বাউল কতদূর পথে পথে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এত বড় দুনিয়ায় ঘর তার কোথাও নেই। তোমার সেই দৃষ্টি বড় জটিল হ'য়ে জড়িয়ে গিয়েছে আমার জীবনে—তাই বোধ করি কেবল দূর পথ-প্রান্তরে ঘোরাটাই আমার কাছে এত প্রিয়, এত সত্য।

নীরেনের মনে হ'ল—বিধাতা-পুরুষ শুধু উচ্ছ্বাসই করে নি।

নীরেন ব'ললে, কি এত ভাবছ বল তো? কি দেখছ? সুজাতার কাঁধের ওপরে হাত রাখলে নীরেন, আঙুলগুলি খেলা ক'রতে লাগল গালের ওপরে।

জলের ফোঁটাগুলি এতক্ষণ সুজাতার চোখের কোণে ঝরে পড়বার জন্যই যেন অপেক্ষা ক'রে ছিল।

নীরেন কেমন আশ্চর্য্য হ'লো।

ছুটি শেষ হ'তে আর ছুটি সপ্তাহ বাকি।

সুজাতা ধীর কণ্ঠে ব'ললে, কাল সকালেই এখান থেকে যাব ভাবছি। এখানে আর ভাল লাগছে না।

নীরেন কেবল ওর মুখের দিকে তাকালে। সুজাতা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে কদিন—আশ্চর্য হ'য়েছে বটে সে কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পায় নি। আর সে হচ্ছে সেই ধরণের লোক—যারা সব কিছুতেই নিস্পৃহ যে পর্যন্ত না তাদের সেই সব বিষয়ে ডেকে স্পৃহা না বাড়ান হয়। নীরেন তাই সুজাতার কথায় সায় দিয়ে ব'ললে, বেশ—তাই যেয়ো। ভাল না লাগলে এখানে থেকে লাভ কি। একবার পুরী হ'য়ে ঘুরে যাবে না—এত কাছে এসে? কি জানি, হঠাৎ কি হ'লো তোমার।—

সুজাতা তাকাল নীরেনের সহজ অভিব্যক্তিশূন্য মুখের দিকে। সুজাতার চোখে রাত্রির মস্ত একটা কাল পাহাড়ের স্তূপ যেন থমকে আছে—হতাশ নির্বাক। ভাবলে সে, তার পরিবর্তন নীরেনের কাছে ধরা পড়েছে তা হ'লে কিন্তু কি ভাবছে ও—সন্দেহ ক'রছে কিছু কি? সহসা নীরেন যেন তার খুব কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল—তাকে ফেলে অতি নিষ্ঠুর ভবঘুরে তাতারের মত—তার সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাঝখানে অসহায়—একা। ভীরু অপরিচিতের মত বহুদূর থেকে সে যেন ব'ললে, কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই আর—

কিন্তু তবু সুজাতার লোভী কান উৎকর্ণ হ'য়ে রইল, এই হয়ত নীরেন ব'লে ব'সল—যেমন বিয়ের আগে একদিন সে ব'লেছিল সুজাতার হাতে হাত জড়িয়ে: তুমি যেন অনেক দূরে চলে যাও—মাঝে মাঝে বুঝতে পারিনে তোমাকে—বুঝতে পারিনে—আমাকে পাগল ক'রে দাও—

না, এর পরে সুজাতা আর কোথাও যেতে পারে না। নীরেন কেড়ে নিতে জানে না কিন্তু নীরবে সে যেন চায় অনেক—সুজাতা যেন তার কূলকিনারা পায় না। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত দাঁত দিয়ে শুকনো হাড় কামড়ে ও যেন মাংসকে শুধু কল্পনায় অনুভব করে। এই নীরেন মুখ ফুটে যদি কিছু বলে—সে ফুলে ফুলে ওঠে ঝ'ড়ো সমুদ্রের মত।

কিন্তু নীরেন আজ ব'ললে, আমাকে একবার পুরী যেতেই হবে। আমাদের অফিসসংক্রান্ত একটু কাজ আছে ওখানে। যাক, তোমাকে তুলে দিয়ে না হয় পরে যাবো।

না, সুজাতা এ আশা ক'রছিল না। কিন্তু সে ভাবলে, নীরেনের এ উত্তর তার খুব পরিচিত। তাকে যেতেই হবে অনেক দূরে। তাকে ডেকেছে নীরেন কিন্তু ভালবাসে নি—না, কোনদিনই না, কেউ না—কেউ কোথাও নেই তার। এত বড় পরিচিত পৃথিবীতে এমন একটা চেনা মুখও তার মনে পড়ল না—যেখানে গিয়ে সে দাঁড়াবে।

পরের দিন সকালে প্লাটফর্মে।

একখানা আপ ট্রেণ ছেড়ে গেল। তার গতির সঙ্গে সঙ্গে মন তার ছুটে গেল অনেক গ্রাম অনেক দেশ পেরিয়ে—অনেক মাঠ আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে। এক সময়ে ট্রেণটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সুজাতার মনে হ'লো, একটা বর্ণহীন তুলির আঁচড়ে জগতের সব প্রাণস্পন্দন কে যেন মুছে নিলে, লাল কাঁকর-বিছানো মস্ত প্লাটফর্মটা তার মনের মাঝখানে নিঃসঙ্গতায় হুহু ক'রে উঠল। একটা দিক্‌চিহ্নহীন শূন্যতায় কান্না পেল তার। দূরের একটি বেঞ্চিতে অল্পবয়সী—নতুন দম্পতিই

হবে বোধ হয়, খুব হেসে হেসে কথা কইছে—সঙ্গে চাকর, অনেক মোটঘাট; ধনী আভিজাত্যের জাঁকজমকে ঝলমল ক'রছে। সুজাতা সেই দিকে ভিখারীর মত তাকিয়ে রইল—কেমন হিংসা হ'ল তার।

এই সময়ে ছোকরা পিয়ন একজন তার সুমুখে এসে দাঁড়াল। একখানা খাম সুজাতার দিকে এগিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে, আপনার চিঠি একখানা কাল সন্ধ্যের সময় এসেছে। আপনারা চলে যাচ্ছেন শুনে—ছোকরা সপ্রতিভভাবে হাসল।

সুজাতা খামের ওপরে শিরোনামাটুকু দেখে চিনলে, এ বিধাতা পুরুষের অতি পরিচিত হাতের লেখা। কিন্তু চিঠি খুলে পড়বার মত ইচ্ছে আজ একটুও ছিল না তার। বরং তার মনে হ'লো: এই আর একটা নিষ্ঠুর লোক। ভারী একা সে—ভারী অসহায়। সুজাতা উদাসীন—হাতে খামখানা নিয়ে ব'সে রইল। পিয়ন ছোকরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সুজাতা তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ব'ললে, আর কিছু আছে নাকি ?

—না না—শুধু ওই চিঠিটার জন্যেই—

পিয়ন ছোকরা চলে গেল। হ্যাঁ, কতকটা হতাশ হ'য়ে বই কি। এই ভুবনেশ্বরেই ওই পিয়ন ছোকরাকেই সে বখ্সিস দিয়েছিল একদিন সন্ধ্যাবেলা চিঠির জন্যে কিন্তু সে চিঠি বিধাতা-পুরুষের চিঠি নয়—হঠাৎ একটা আনন্দে ভুল করেছিল সুজাতা। কিন্তু আজ বিধাতা-পুরুষের নির্ভুল চিঠিটায় যাওয়ার দিনে বেচারী প্রত্যাশী পিয়ন ছোকরাকে বখ্সিস করার কথা তার একবার মনেও হ'ল না। অনেক আশায় পিয়নবেচারী দু' মাইল পথ ছুটে এসেছিল। কিন্তু সে তো জানে না—এতদিন ধরে বিধাতা পুরুষের যত চিঠি ছিল—আসবার সময় সব পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে সুজাতা।

নীরেন প্লাটফর্মে পায়চারী ক'রছিল। সুজাতার পাশের বেঞ্চিতে ব'সে পড়ে ব'ললে, কার চিঠি এলো ? তাইত, তোমার বিধাতা পুরুষের মত হাতের লেখা দেখছি। হুর্‌রে—নীরেন হাসতে হাসতে ব'ললে, না সু—ভদ্রলোক বহু সন্ধান ক'রে চিঠি দিয়েছে—এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ ক'রো না। থেকে যাও দুটো সপ্তাহ—বড় জোর কাছাকাছি পুরী—কি বলো ?

নীরেন বিস্মিত মুখে তাকাল সুজাতার দিকে কিন্তু সুজাতা আজ বিবর্ণ। নীরেনের নিছক হালকা অভ্যস্ত রসিকতা যেন চাবুক মারল তাকে—এমন প্রত্যক্ষ অপমান কোন দিন যেন কেউ করে নি সুজাতাকে। সুজাতার মনে হ'লো: নীরেন ভাবছে যেন—বিধাতা-পুরুষের এতদিন কোন চিঠি পায় নি ব'লেই সে পরিচিত হোষ্টেলের ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছে। সুজাতার হাত থেকে খামখানা খসে পড়ল—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নীরেনের হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, তুমি··· তুমি···

না, কিছুই ব'লতে পারল না সুজাতা—শুধু অসহায় অবরুদ্ধ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল।

নীরেন বোকা হ'য়ে গেল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। ব'ললে, এ কি ! কি হয়েছে বলো তো তোমার ? আজ কদিন দেখছি—

—না না—তুমি যাও—তুমি যাও। এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।—

—কি পাগলের মত—নীরেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

—না, আমি পাগল নই—সব বুঝি আমি। সুজাতা ফুঁপিয়ে উঠল, কোন দিন কোন ছলেই তোমার সুমুখে আর আসবো না আমি—আমাকে যেতে দাও—যেখানে হোক চলে যাবো আমি—যেখানে হোক—

কি সান্ত্বনা দেবে নীরেন! সে ভেবে পেল না—সুজাতার এতদিন পরে ওই নতুন রকম কথাগুলার বাস্তবিক কি অর্থ। অতি বড় শত্রুতেও তো বলতে পারবে না—নীরেন সুজাতাকে ভালবাসেনি—তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে! কিন্তু তবুও এতখানি অতৃপ্তির ফাঁক সুজাতার মনে কি ক'রে গড়ে উঠল—কেন? এ কি সেই বিধাতা-পুরুষ—যে তার অদ্ভুত নিঃসঙ্গ ভালবাসার ইন্ধন দিয়ে দিয়ে চরম অতৃপ্তির মাঝখানে সুজাতার ভালবাসার ক্ষুধাকে এমন ক'রে তুলেছে—যার কাছে সে আজ এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল! নইলে এতদিনের পরে সুজাতা বলে কি ক'রে এ কথা—কেন? সুজাতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নীরেন নির্বাক বসে রইল। মনে পড়ল তার, সুজাতা এইখানে এসে একদিন ব'লেছিল: আমি আর যাবো না তো। ওই অত দূরে একা আমার ভাল লাগে না। চাকরি আমি ছেড়ে দেবো।

নীরেন সুজাতার হাতে একটু চাপ দিয়ে ব'ললে, তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই—আমার একা আর ভাল লাগে না। তুমি যেয়ো না আর।

কাঁকরের ওপরে বিধাতা-পুরুষের চিঠিখানা পড়েছিল। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়ায় সুজাতার সাড়ীর আঁচল উড়্‌ল—ভেজা চোখের ওপর চুল উড়ে পড়ল আর কতকগুলো ধূলো এসে জম্‌ল খামটার ওপরে।



সিগারেট

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নূতন বউ বাসরঘরে যাইবার সময় তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। কোন মতেই যাইবে না সে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়, সে শুধু বলিয়াছিল, সংগদোষে একটা ভয়ানক বদ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে, সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়া সে ঢুকিবে বাসরঘরে—একটি মিনিট দেরি, ভিতরে গিয়া তো আর টানিতে পারিবে না।

বাসর-সংগিণীদের একজন চিপ্‌টেন কাটিয়া বলিল—"তাতেই বা ক্ষতি কি?—মেম সাহেবেদের পদাংক অনুসরণ ক'রে তো সবই এল একে একে—বব্‌, ডান্স, ফ্রি ল্যভ, সিগরেট,—আর বেচারি সিগরেট মুখচুম্বনের অধিকার যখন পেয়েচেই, তখন বাসরঘরে ঢুকতে আর দোষ কি?—দুদিন পরে তো ঢুকবেই।"

ক্রমে উত্তেজিত বচসা, কথা কাটাকাটি। কথাটা সামান্য, কিন্তু জেদাজেদির উপর একেবারে অন্যরকম দাঁড়াইয়া গেল।

অনেকে উভয় পক্ষের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। পরে যাহা হইবার হইবে, আপাতত ভেতরের এ কেলেঙ্কারিটা বাহিরে না প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু বাগ মানান গেল না। নিজের সুটকেসটা হাতে ঝুলাইয়া নূতন বধূ বাহির হইয়া পড়িল। "ঢাক-ঢাক" সত্ত্বেও খুব একটা গোলমাল হইল কয়েকজন সংগে সংগে খানিকটা আসিল, তাহার পর হাল ছাড়িয়া আবার ফিরিয়া গেল।

যাহাতে আবার আসিয়া কেহ উপদ্রব না করে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকটা গলি বদলাইয়া শেষে একটা সরু গলিতে আসিয়া পড়িল এবং সেটা যেখানে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে সেই মোড়ে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের হাওয়া লাগিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক তখন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে বোধ হয়, নিজের বেশভূষার পানে চাহিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল রাগের মাথায় কাজটা ভাল হয় নাই; এই সাজশয্যা, এত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে। একবার মনে হইল পুরুষের বেশ করিয়া লয়। কিন্তু সে তো আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হয় না, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়।...না, কস্মিন কালেও নয়, আবার সেই জায়গায়?...এত ভয়ই বা কিসের? লোকে হদ্দ মনে করিবে একজন অতি-আধুনিকা, ব্যস্। তা করুক গিয়া মনে মনে প্রাণ ভরিয়া, সে কেয়ার করে না।

তবে নিতান্ত নববধূর যা আভরণ—মাথার ঝাপ্‌টা, হাতের রতনচুর, খোঁপার কাজললতা, গলার মালা, এগুলা খুলিয়া সুটকেসে রাখিয়া দিল। পাশেই একটা জলের কল ছিল, মুখের চন্দন-বিন্দুর রেখাগুলা মুছিয়া লইল।

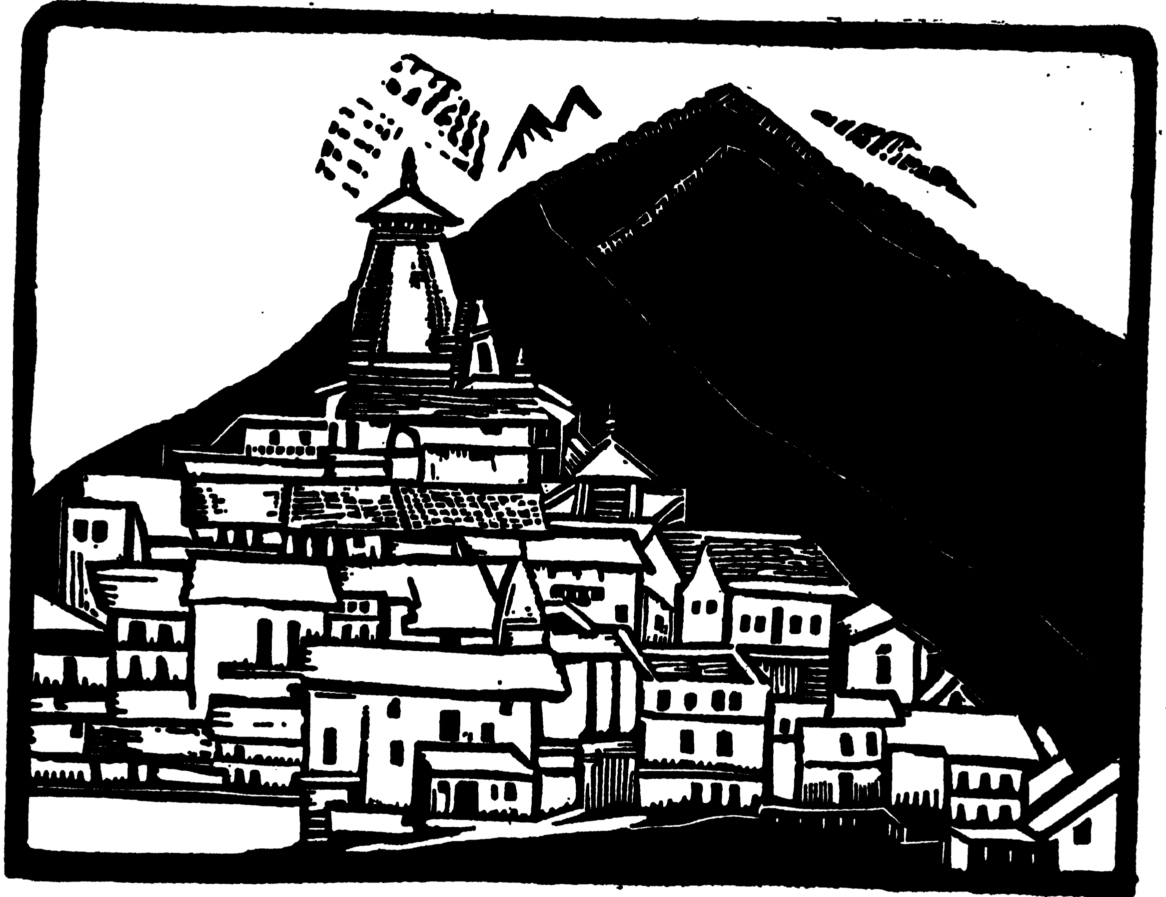
এদিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনা, অর্থাৎ কাজের ভাবনা মাথায় আসিয়া উদয় হইল। হাতে একটি পয়সা নাই, এদিকে ক্ষুধাও খুব পাইয়াছে। রাগে অভিমানে কাহারও কাহারও ক্ষুধা কমে, কিন্তু ইহার যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

বদ্রিনাথের পথে—

—শিল্পী শ্রীললিতমোহন সেন, এ. আর. সি. এ. (লণ্ডন)

শিল্পী তাঁর চিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন—"পথের কষ্টে, রৌদ্রের প্রখর তেজে শরীর হয়ে উঠেছে একেবারে কয়লার মত কালো—চোখের দৃষ্টিতে হয়েছে রঙের অভাব। সারাপথের দৃশ্য, পাহাড়ের রূপ সবই যেন মসীবর্ণ। তাই রঙের পরিবেশন না করে, কুচ্‌কুচে কালো রঙে এই হিজিবিজির ছাপ"—কথাগুলি বিরক্তির বটে, কিন্তু আমরা মনে করি, তিনি কৌশলে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যে পাহাড়ের ধূসর ও রুক্ষ রূপ কালোর রেখায় যেভাবে ফুটে ওঠে, বিচিত্র রঙের সমাবেশে তা সম্ভব নয়।

—সঃ অঃ



দেবপ্রয়াগ—উত্তরাখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই প্রয়াগ। হৃষীকেশ থেকে প্রায় মাইল ষাটেক দূরে। আগে এই পথটি হেঁটে আস্‌তে হ'তো—লছমনঝোলা পার হ'য়ে, বান্দর চট্টি হ'য়ে—এখন হৃষীকেশ থেকে মোটরে যাওয়া যায়। অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো বাড়ীগুলি। শিখরচূড়ায় রঘুনাথজীর মন্দির। বদ্‌রিনাথ ও কেদারনাথের পাণ্ডাদের এখানেই আড্ডা। এখান থেকেই চলার পথ সুরু।



রুদ্রপ্রয়াগের পথে। দেবপ্রয়াগ থেকে পাঁচদিন চলার পর রুদ্রপ্রয়াগের কাছে আসা গেল। পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে চড়াই উৎরাইএর পথ। হিমালয়ের রুদ্রমূর্ত্তি এখান থেকেই সুরু হ'ল। তরুশূন্য রুক্ষ ভীমকায় পাহাড়ের শ্রেণী। ডানদিকে ব'য়ে চলেছে রুক্ষা নদী।



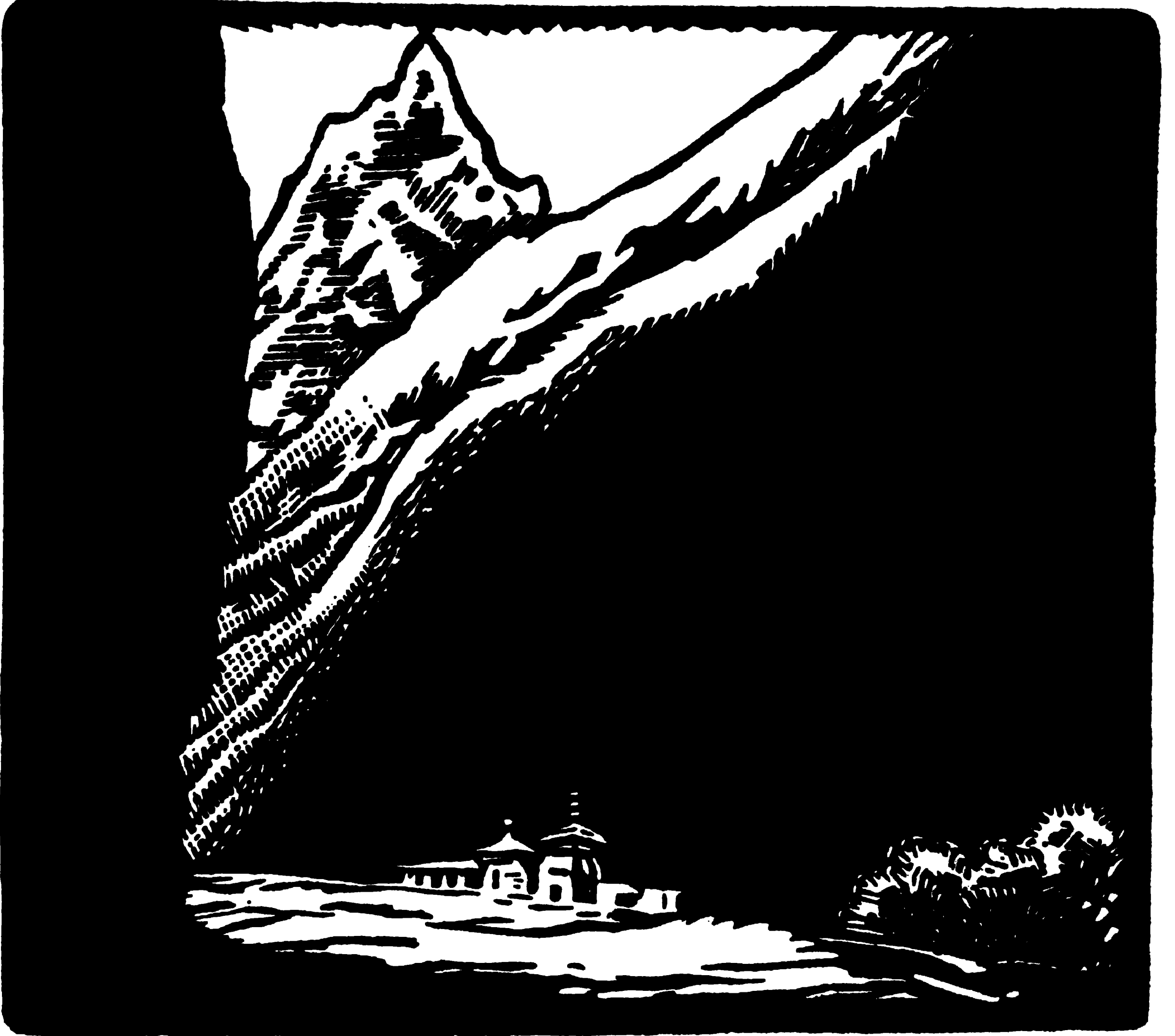
পাহাড়ী চটি। যাত্রীদের পথ চলার শেষে এইখানেই আশ্রয় নিতে হয়। গোয়ালঘরের মত চটির ঘর একদিক খোলা—আসবাববিহীন মাথা গোঁজবার স্থান। অতি অপরিষ্কার। পাশেই দোকানীর আস্তানা। চালডাল ইত্যাদি সবই অতি চড়াদরে পাওয়া যায়। জিনিষ কিছু কিন্‌লেই চটিতে থাক্‌বার অধিকার—নতুবা "আগে চল্‌।"



শ্রীনগরের গলি। শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী। আগেকার প্রাচীন সহরের সবই গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হ'য়েছে। দু' একটি পুরাণো মন্দিরের চূড়া বালির মধ্য থেকে উঁকি মারে। যেদিকটা এখনো টিকে আছে, সেদিককার পথঘাটের স্থাপত্যনিদর্শনে এখনো একটু প্রাচীন কালের আভাস পাওয়া যায়।



যোশী মঠের মন্দির। শোনা যায় শঙ্কর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বদ্রিনাথের মন্দির শীতকালে বরফে ঢেকে গেলে ছ' মাসের জন্তে যোশী মঠের এই মন্দিরে তাঁর পূজো হয়। বদ্রিনাথের রাওয়াল এখানে থাকেন। এখানে তাঁর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। এই মন্দিরের মধ্যে ছটি অপূর্ব্বসুন্দর কালো পাথরের মূর্ত্তি আছে। একটি নৃত্যশীল গণেশ—আর একটি শিব-পার্ব্বতী। এমন সুঠাম মূর্ত্তি বদ্রিনাথের পথে আর কোথাও দেখা যায় না।



পথের পাশে মন্দির। বদ্‌রিনাথের পথে নানা প্রাচীন মন্দির চোখে পড়ে। সব মন্দিরই প্রায় একরকম। ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন বড় বেশী নেই। মন্দিরের মাথায় কাঠের চৌকা আচ্ছাদন, সমস্ত মন্দিরটাকে বরফ থেকে বাঁচা'বার জন্যে। পথের বাঁকে দূরে নীলপাহাড়ের বিরাট পটভূমিকার ওপরে ছোট ছোট এই রকম মন্দিরের আকস্মিক আবির্ভাব বদ্‌রিনাথের পথের একটী বিশেষত্ব।



বদ্‌রিনাথ থেকে ঠিক পাঁচ মাইল আগে হনুমান চটী। তারি কাছে উখ বা আউত গ্রাম। বসতি বেশীর ভাগ মার্চ্ছাদের। এই গ্রাম থেকে তুষারাবৃত গিরিশিখর মালার দৃশ্য বড়ই মনোরম।



এক বৃদ্ধ গাড়োয়ালী—রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র এদের দর্শন মেলে। পথ হারালে পথের সন্ধান সর্ব্বদা এদের কাছে মিল্‌বে। অধিকাংশই প্রিয়ভাষী। তকলিকাটা আর রাস্তায় চলা এই এদের সর্ব্বক্ষণ চলছে।



হৃষীকেশ ছাড়্বার পরে গরুর গাড়ী একেবারেই দেখ্তে পাওয়া যায় না। যা রাস্তা! "পউরি" হ'য়ে 'দোগড্ডা'র কাছাকাছি এসে আবার গরুর গাড়ী চোখে পড়ে। অধিকাংশই ফৌজী মাল নিয়ে ল্যান্স্ ডাউনের দিকে চলে।



ঘাট চট্টি। যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুগঙ্গা পার হয়ে ঘাট চট্টি। রাস্তা বড়ই দুর্গম। কথিত আছে যে, দু' দিকে পাহাড় যখন এগিয়ে এসে এক হয়ে যা'বে—(এখনই ত প্রতি বৎসর একটু একটু ক'রে পাহাড় বেড়ে চলেছে) তখনই কলি যুগের শেষ।



সারা পথ কেবল পাহাড় আর পাহাড়। মানুষের দৃষ্টি প্রতি পদে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আস্‌ছে—মহেশ্বরের দর্শন লাভের পথে নন্দীর উদ্যত নিষেধের মত।

সব সমস্যার সমাধান সেই বালীগঞ্জ লেক, কিন্তু সে যে এখান থেকে বহু দূর। উপায় কি? ফিরিয়া যাইবে?—ফিরিবার নামে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ছিঃ, ধিক তাহার কলেজে পড়া আধুনিক উচ্চশিক্ষাকে, ধিক তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানকে!—আবার সেই জায়গা?

কৌতূহলী নজর পড়িতেছে—ক্রমে বেশী বেশী—নিকট দূর দিয়া যে-ই যাইতেছে তাহারই গতি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। দুই একজনের দাঁড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ কি সব সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া দরকার হইয়া পড়িল। যায়গাটা হঠাৎ মাথা ঠাণ্ডা করিবার এত অনুকূল হইয়া পড়িল কি করিয়া।

নূতন বধূর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল; বুকের নিকট হইতে রঙিন সুগন্ধি রুমালটা বাহির করিয়া হাতে করিয়া ধরিল এবং বেশ "লপেটা" গোছের একজন মন্থর গমনে যেই তাহার পাশ দিয়া যাইবে, আঙুল কয়টি আলগা করিয়া দিল।

"আপনার রুমাল?—পড়ে গিয়েছিল।"

"ও, খেয়াল করি নি; ভাগ্যিস আপনি দেখলেন। ধন্যবাদ।"

"মেন্‌শ্যন করবেন না দয়া ক'রে। হঠাৎ চোখে পড়ল, তাই—"

একটু ইতস্তত করিয়া—"কোন রকম উপকার করতে পারি কি? মনে হচ্চে যেন...মানে, কারুর অপেক্ষা করচেন কি?"

একটা আঙুলের নখ কামড়াইয়া—"উপকার?—হ্যাঁ—না,..."

—হঠাৎ নাটকীয় ভংগীতে—যেন বলিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও—"আপনি অনুমান করেছেন ঠিক—না ব'লে আমার উপায়ও নেই...আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে এইখানে সন্ধ্যের সময় দেখা হওয়ার কথা—তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কি তাঁর মনে ছিল জানি না, কিন্তু এখন দেখছি তিনি আর এলেন না।"

হর্ষের মাঝে দুশ্চিন্তার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া—"তা হলে?"

ভয়ব্যাকুল ভাবে—"কি ক'রে ফিরে যাব?—এদিককার পথঘাট কিচ্ছু জানি না, কোথায় ট্রাম কোথায় কি—ট্যাক্সি আর গাড়িতে একলা যেতে কখন সাহস হয় না—"

"একলাই বা যাবেন কেন? যদি আপত্তি না থাকে—"

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টিতে—"অসুবিধে হবে না আপনার? এতটা রাত হয়ে গেছে? না হলে সত্যি আমিই বা কি করব? কতক্ষণ এ অবস্থায়—?"

একটা ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেছিল, 'লপেটা' ডাকিলে ফুটপাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। নববধূ জড়িত চরণে উঠিয়া বসিল, যুবক উঠিলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "লোক রোড।...কিন্তু আপনাকে দয়া ক'রে একটু আগেই আমায় ছেড়ে দিতে হবে। খানিকটা হেঁটেই যাব।"

"কেন?"

সংগিনী শুধু সঙ্কুচিত ভাবে মুখের দিকে চাহিল।

তাহাতেই উত্তর পাইয়া যুবক বলিল, "ও !...বেশ যেমন আপনার অভিরুচি।" একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

মোটর উড়িয়া চলিল ; মনও কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে, কতদূর কোন্ অজানা জগতে।

নববধূ তীব্র বায়ুস্রোত হইতে যেন রসসঞ্চয় করিয়া বলিল, "মাগো বাঁচলাম! গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছল।"

গাড়ির ঝাঁকানির সুবিধায় 'লপেটা' একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল, দরদমাখা জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তেষ্টা পেয়েছিল ?"

"নাঃ।"

আবদারের সুরে—"না, নিশ্চয় পেয়েছিল, লুকোচ্ছেন।"

একটু চুপচাপ।

"বলবেন না ? আর সত্যিই তো আমার জানতে চাওয়ার অধিকারই বা কি ?"

"সেই চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—সেই থেকে—"

"কি সর্ব্বনাশ! সেই চারটে থেকে মুখে একটু জল দেন নি ? তাই বলি—মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেচে!"

একটু পরেই ট্যাক্সি গিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের বেশ একটি ছোট-খাট, ভদ্র অথচ নিরিবিলি হোটেলের সামনে দাঁড়াইল।

* * * *

বালীগঞ্জের রাসবিহারী এভিনিউতে পরস্পরের বিদায়-দৃশ্যটি হইল বড় করুণ। লপেটা হোটেলে গোপনে একটি পেগ টানিয়া লইয়াছিল, বিদায় দিবার সময় হাতের একটি সোনার আংটি খুলিয়া সঙ্গিনীর অনামিকায় পরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠ আরও গদগদ হইয়া পড়ায় বলিতে পারিল না। নব বধূটি দূরের একটা বাড়ি দেখাইয়া দিয়া নামিয়া পড়িল, তাহার পর লেক রোড ধরিয়া চলিল।

* * * *

মেসে আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড! সবার মুখে সুধু ত্রস্ত প্রশ্ন,—

"এ্যাঁ, তুই এই বেশে এই এতটা পথ এলি কি ক'রে ?"

"আর ওদের প্লে শেষ হয়ে গেল ?—এরই মধ্যে!"

"সে কি রে! তুই বাসরঘরের সীনের আগেই চলে এলি—ঝগড়া ক'রে ? বন্ধ হয়ে গেল তো তাদের প্লে ?"

"অবশ্য চালিয়ে নেবেই কোন রকম ক'রে তারা, থিয়েটার কিছু বন্ধ হবে না ; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হলধরবাবু, এটা আপনার ভাল হ'ল না মশাই।"

হলধর পরচুলাটা আছড়াইয়া টেবিলে ফেলিয়া, নব বধূর বেনারসীটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, মন্তব্য পরে হবে 'খন ; এখন তাড়াতাড়ি কেউ একটি সিগারেট ছাড় দিকিন, পেট ফুলছে, বাব্বা!"

রবীন্দ্র-পরিচয়

(তৃতীয় দফা)

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পূর্ব্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক সাধারণ মানুষের মতন নন—তাঁর মধ্যে যে মানুষ রবীন্দ্রনাথটি আছেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়, যখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝখানে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যেমন তাঁর প্রকাশ অনন্যসাধারণ, সাহিত্যের বাইরে লোকজনদের সঙ্গে মেলা-মেশাতেও তেমনি তাঁর ব্যবহার ঠিক সাধারণ রকমের নয়। নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা তাঁর নীতি নয়, ওটা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। সবকিছুর মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে সব কিছু থেকে বেমালুম নিজেকে দূরে টেনে নেবার কৌশল তিনি জানেন—এটা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে—যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে কৌশল ব'লে মনে হয়, সেইটাই তাঁর প্রকৃতি। মোহ হিসাবে যেটা তাঁকে পেয়ে বসে সেটার থেকে সজোরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা তাঁর প্রকৃতির ধর্ম্ম। বেশ মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র শ্রীমান্ নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মরণাপন্ন রোগে জার্মানিতে কাতর, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমরা যাঁরা কাছে ছিলুম যেন বুঝতে পারছিলেম, কী দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা কয়েক দিন তিনি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু বাইরে থেকে বাইরের লোকের পক্ষে সেটা বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। সেই মানসিক অবস্থার মধ্যেও, কবি-প্রকৃতি তার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নি; ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ-মোহ হতে মুক্তি নিয়েছেন অন্তরে। তাই তখন উৎসবের গান এবং কবিতাও লিখেছেন। উৎসব-আয়োজনের ব্যবস্থার মধ্যেও যোগ দিয়েছেন। বাইরে থেকে বিচার করলে মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের বোধ করি সেই মনটির অভাব আছে, যে মন, পারিবারিক সুখদুঃখকে, আন্তরিকতার মোহকে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু সেটা ঠিক ব'লে মনে হয় না। যেটাকে গভীর ভাবে আঁকড়ালে, মানুষের মনের প্রগতি অ-গতি কিম্বা কু-গতিতে এসে ঠেকে, সেইটার থেকে মুক্ত হওয়াই কবির জীবনের ধর্ম্ম। নীতুর মৃত্যু-সংবাদ যখন এল, এবং নীতুর মায়ের টেলিগ্রাম পড়ে যখন কবি বুঝলেন যে, পুত্রের মৃত্যু-জনিত শোককে পুত্রহীনা জননী সহ্য করেছেন ধৈর্য্যের সঙ্গে, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের চিত্ত হাল্‌কা, মনে যেন শান্তি ফিরে এসেছে। সাধারণত অধিকাংশ ব্যক্তি এ রকম খবরে চলতি কথায় মর্ম্মাহত হয়ে ব'সে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অশান্তির পীড়ন থেকে উঠে পড়লেন উপরে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে কবি তাঁর কন্যাকে জার্মানিতে টেলিগ্রাম পাঠালেন, যতদূর মনে হয় এই রকম,—Greatly relieved to see your fortitude.

মৃত্যুকে বীরের মতন গ্রহণ করা এবং মৃত্যু-বেদনার ভিতর দিয়ে চিরসুন্দরের সাধনায় এগিয়ে চলাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম। মৃত্যুর কাছে চিরাচরিত প্রথায় বেদনায় শোকে মুহ্যমান হয়ে নেতিয়ে পড়াটা সাধারণ মানুষের কাছে স্বাভাবিক হ'লেও রবীন্দ্রনাথ সেই স্বাভাবিক নীতি এবং রীতিতে

কোনদিন মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সমীন্দ্রনাথ ১৪ বৎসর বয়সে যখন মারা যান, তখনো রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত হতে দেখিনি।

তিনি নিজে মৃত্যু সম্বন্ধে যা ভাবেন, অন্যকেও সেই দিক দিয়ে মৃত্যুকে বিচার করতে বলেন, মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কন্‌সেপ্‌শন কি, সে বিষয় একটু ইঙ্গিত দেই। তাঁর এক অল্পবয়স্ক স্নেহভাজন ছাত্রের মৃত্যু উপলক্ষেই তিনি গান লিখেছিলেন—

"জীবনে যত পূজা হোল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

এই জীবনের উপর মৃত্যু যখন তাঁর দুঃখের কালো পর্দ্দা টেনে দেয়, তখন সেই পর্দ্দাকেই আমরা চরম ব'লে মেনে নিই এবং সেই জন্যেই সংসারে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে আমরা হই অতি মাত্রায় চঞ্চল এবং সেই চাঞ্চল্য হতেই অনেকটা প্রমাণ হয়ে যায় যে আমরা অধিকাংশেরা কেবল-মাত্র বুদ্ধিজীবী নই—আমরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষও বটি। কিন্তু যাঁদের চোখের সামনে ঐ কালো পর্দ্দাটা চরম ও শেষ কথা না কয়ে অন্তহীনের বাণী বলে, বলে, অশেষ পথে ক্রমাগত বিকশিত হবার পরম বার্ত্তা, তাঁদের কাছে মৃত্যুর রূপ, হয়ত বন্ধুর রূপ। কাজেই মৃত্যুকে যাঁরা ভয় পান না, তাঁদের মধ্যে আমরা অসাধারণ মনুষ্যত্বের একটা পরিচয় পাই, ও সেই মনুষ্যত্বের পরিচয়টা ফোটে রক্তে মাংসে তৈরী মানুষেরই ভিতর দিয়ে।

নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে, নিজের চিন্তা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ কত রকম যে পরীক্ষা করেন, তার গুনতি করা যায় না। এই রাজ্যেও সেই একই ধর্ম্ম, একঘেয়ে দৈনন্দিন-পাকে বাঁধা না পড়বার চেষ্টা। একবার বেশ মনে পড়ে, কবির ইচ্ছে গেল, কেবল কাঁচা শাকসব্‌জি খেয়ে থাকবেন। যেমনি ইচ্ছে অমনি কাজ।

(১) গজ ওঠা কাঁচা মুগ (এটা বহুকেলে অভ্যেস)
(২) কচি মূলো শাক
(৩) সরষে শাক
(৪) পালঙ্ শাক

(৫) পেঁপে,

(৬) কচি মূলো

(৭) কচি শসা—ইত্যাদি

সঙ্গে বড় জোর ২।১ স্লাইস্ রুটি।

দুই বেলা চল্‌ল এই রকম, কিছুদিন ধরে। তারপর দেখা গেল, শরীরে পরীক্ষা সইছে না—ছেড়ে দিলেন। একবার দেখি—(বেক্‌ড পটাটো, পোড়া আলু বা আলু পোড়া খাওয়া ভাল), রাঙাআলু পোড়া খাওয়া চল্‌ছে। সেটাও শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌ল না। বিপদ হয় যখন তিনি আশে পাশের অন্যদের পরম উৎসাহে খাদ্য ব্যাপারে ঐ রকমের পরীক্ষা করতে বলেন। বেশ মনে পড়ে—ছোট তখন আমি, চা খাচ্ছি কবির সঙ্গে। টেবিলে সাজানো উত্তম আহার্য্য বস্তু সবই খেতে দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য একটি কাঁচের গ্লাসে সবুজ রঙের যে পানীয়টি ছিল, তা দিলেন না। মনে মনে বললুম, নিশ্চয়ই ওটা উত্তম কিছু, তাই কবি ওটার ভাগ কাউকে দিতে চান না। একদিন যায়, দুদিন যায়, অবশেষে মুখ ফুটে বললুম ও জিনিসটা কি? তিনি সামান্য একটু হেসে, অথচ বেশ গাম্ভীর্য্য রক্ষা কোরে আর একটি গেলাসে আধ গেলাস ঐ সরবৎ ঢেলে বললেন, "যদি রোজ খেতে পার খুব উপকার হবে।" খোশ-মেজাজে দিলাম চুমুক—আঃ ছিঃ, বিশ্রী তেতো! কবি তখন হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "এই জন্যই ওটা কাউকে দেই না। কিন্তু তোমার লোভের একটা শাস্তি হওয়া দরকার ব'লে ভাবলুম আসল তত্ত্ব ফাঁস না করে, আগে খাইয়ে নিই।" ও রসটি কাঁচা নিমপাতা-বাটা। প্রায়ই ওটা পান করেন, পান করবার সময় মুখভঙ্গিমায় প্রকাশ পায় না যে উৎকট তিক্ত রসনাকে সিক্ত করেছে।

সময় নিয়ে খেলা করা এটাও দেখি তাঁর ধর্ম্ম। আলস্যে দিন তাঁর কাটে না। যখন কবিতা বন্ধ তখন গান লিখ্‌ছেন, যখন কবিতা-গানের মরসুম বন্ধ তখন প্রবন্ধ রচনা। যখন সিরিয়াস্ কিছু করবার মতন মনের অবস্থা নয় তখন হাল্কা-ছন্দে হাল্কা ভাবে হয়ত আটপহুরে বিষয়ের উপর হাস্য রসের কবিতা লিখে ফেললেন। কলম যদি নিতান্তই বিশ্রাম চায় তো ছবির তুলি ওঠে জেগে। তুলিও যদি বলে আমি ছবি আঁকব না, তা হ'লে বিবিধ বিষয়ের বই পড়তে বসে যান। সম্প্রতি দেখছি, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বই পড়েন বেশী। কয়েক দিন আগে দেখেছি, মানুষের ফিজিওলজীর একটা নূতন বই পড়ছেন। শুধু পড়া নয়, একেবারে ডাক্তারবাবুর কাছে খবর গেল যে, বইটা পড়া হ'লে, ডাক্তারবাবুকে কবির সামনে বসে, ডিসেক্‌ট ক'রে দেখাতে হবে, ছাগের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা। ঐ বইএর লেখার সঙ্গে ডিসেক্‌শনের হিসেব মিলিয়ে নেবেন কবি। পাঠকবর্গ মনে রাখবেন কবির বয়েস উনাশি বৎসর। কিন্তু নব নব দিক থেকে জ্ঞানার্জ্জনের উৎসাহ উদ্যম এখনও পর্য্যন্ত কী প্রবল! কিন্তু এ সবই তাঁর পক্ষে কতকটা রিক্রিয়েশন। কবিতায় কিম্বা গানে পেলে এসব বই ছিকেয় উঠে যায়। চিকিৎসাসংক্রান্ত বই বা প্রবন্ধ পড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ। বিশেষ ধ্যান দিয়ে এ সব বই পড়েন। কিছুদিন হ'ল একদিন যখন সিরিয়াস্ কিছু করবার নেই, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীমান অনিলকুমার চন্দ এবং আমাকে উপলক্ষ ক'রে দিলেন লিখে একটা ছড়া। আট-পহুরে সময় নষ্টের একটা কবিজনোচিত চেষ্টা। সেক্রেটারিদের সঙ্গে তিনি যে সম্বন্ধ রক্ষা করেন সেটাকে কোনদিন প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ বলা চলে না। প্রায়ই আমি আর অনিল কবির সঙ্গে চা খাই।

সে সময় মানুষ রবীন্দ্রনাথ যে সব কথা আমাদের বলেন, সব যদি নোট করা থাকত, তা হ'লে বিরাট গ্রন্থ হয়ে পড়ত। যাক্ সে কথা। সেদিনকার কবিতাটি দেখছি সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী-সম্পাদিত ভাদ্রের (সন ১৩৪৬ সাল) 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে ছাপা হয়েছে। এই রচনায় সেই কবিতাটির সন্নিবেশন প্রাসঙ্গিক ব'লেই 'বঙ্গলক্ষ্মী' থেকে সেটি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, কবিতাটি এই—

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজেষ্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন, মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি'
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্য যুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান,
ভাঙন কিন্তু আর্টিষ্টিক, কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হোত দেবতাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হোত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া,
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা রম্ভা
রিয়লিষ্টিক আধুনিকের এই মতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা,
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু জানি ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ,
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূল হস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম॥

হাস্যরসের একটি সহজ প্রকাশ তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি রসাত্মক বাক্য শ্রোতাদের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। এই সেদিনের কথা, চা-এ বসেছি আমি আর শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন। একটা বইতে কি একটা কথা ছিল, ঔষধসংক্রান্ত, আমাকে কবি বললেন "পড়ে দেখ, যদি মনে কর এ ওষুধ আনানো দরকার আনিয়ে নিও।"—আমার নিজের চশমা কাছে না থাকায় আমি তেজেশবাবুর চশমা নিয়ে লেখাটা পড়লুম। কবি হেসে বললেন, "তেজেশ তোমার বন্ধু সেইজন্যেই বুঝি তোমাদের "সমদৃষ্টি"।" সময় ও সুযোগ হ'লে বারান্তরে এই রকমের "রবীন্দ্র-পরিচয়" উপহার পাঠকবর্গের কাছে পাঠা'ব।

ট্রেণে আধঘণ্টা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে মণীশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠিয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটা পঁচিশের প্যাসেঞ্জার ধরিয়া আজ বাড়ী ফিরিবার কোনো আশাই তাহার ছিল না; করুণাকেও বলিয়া আসিয়াছিল যে সকালের গাড়ীতে অন্যান্য বরযাত্রীদের সঙ্গে সে ফিরিবে। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আজ বৈকালের গাড়ীতে এক বন্ধুর বিবাহে তাহারা বরযাত্রী আসিয়াছিল। পাশাপাশি দুটি ষ্টেশন—মাঝে মাত্র পনের মাইলের ব্যবধান, ট্রেণে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে এগারটা পঁচিশের পর রাত্রে আর গাড়ী নাই। তাই স্থির হইয়াছিল যে, রাত্রে ফেরা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে, পরদিন প্রাতে ফিরিলেই চলিবে। সকলেই প্রায় রেলের কর্ম্মচারী,—রেল তাহাদের ঘর-বাড়ী।

এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া অন্যান্য বরযাত্রীরা যখন গাড়ী ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া পান-সিগারেটের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল, সেই ফাঁকে মণীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িয়াছিল। বিবাহ বাড়ী হইতে ষ্টেশন পাকা দুই মাইল,—এই কয় মিনিটে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিল। চুরি করিয়া বন্ধুর বিবাহের আসর হইতে পলাইয়া আসার জন্য পরে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে তাহাও বুঝিতেছিল, কিন্তু তবু রাত্রেই বাড়ী ফিরিবার দুরন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। বাসায় আর কেহ নাই—করুণা সারারাত একলা থাকিবে—দিনকাল খারাপ এম্‌নি কয়েকটা কৈফিয়ৎ সে মনে মনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

করুণার জন্য বস্তুত ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। ষ্টেশনের কাছেই মণীশের কোয়ার্টার, আশেপাশে অন্যান্য রেল-কর্ম্মচারীদের বাসা; আজিকার বরযাত্রীদের মধ্যে তাহার মত অনেকেই তরুণী স্ত্রীকে একলা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে নাইট ডিউটির সময় সকলকেই তাহা করিতে হয়, কখনো কাহারও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। তবু যে মণীশ রাত্রেই বাড়ী ফিরিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ— ; কিন্তু ওটা একটা কারণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, মণীশের মাত্র দুই বছর বিবাহ হইয়াছে এবং বৌ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—এমন বদনামও তাহার রটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কৈফিয়ৎ হিসাবে ওকথা উত্থাপন করা অতীব লজ্জাকর।

সে যাহোক, বারটার মধ্যেই সে বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে, আধ ঘণ্টার পথ। হয়ত করুণা লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পরম আরামে ও গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত কেন, নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, করুণা মোটে রাত জাগিতে পারে না। মণীশকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখে বিস্ময়

ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। মণীশ পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। ট্রেণ তখন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কামরার মধ্যে দুইটি লোক। একজন একটা বেঞ্চি জুড়িয়া লম্বাভাবে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া ছিলেন; গোলাকৃতি থলথলে মুখমণ্ডলে হপ্তাখানেকের দাড়ি গজাইয়া কৃষ্ণতার একটা গাঢ়তর প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল; তিনি শুইয়া শুইয়া অনিমেষ চক্ষে মণীশকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অপর ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়,—সেও একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া অন্য ধারের বেঞ্চির কোণে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল এবং পরম কৌতূহলের সহিত মণীশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার চেহারা রোগা—হাড় বাহির করা, গাল বসিয়া গিয়া চোয়ালের অস্থি অস্বাভাবিক রকম উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, দুই চোখের কোলে গভীর কালির আঁচড়। এই দুই যাত্রীর মধ্যে একটা বেশ রসালো গল্প জমিয়া উঠিয়াছিল, মণীশের আগমনে তাহা অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

মণীশ বসিলে রোগা লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কদ্দূর যাওয়া হবে?'

মণীশ বলিল, 'আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব।'

একজাতীয় লোক আছে, রেলে উঠিয়াই অন্য যাত্রীদের পরিচয় গ্রহণ করিবার অদম্য আগ্রহ তাহাদের চাপিয়া ধরে। রোগা লোকটি সেই শ্রেণীর। মণীশের রূপালী বোতামলাগানো কালো রঙের ওভারকোট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি রেলেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, আমিও ষ্টেশনের পার্সেল ক্লার্ক্।'

লোকটি তখন হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেশ। আসুন, এই কম্বলের ওপর বসুন। আমি অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু রেলের বাবুদের মতন এমন মাই-ডিয়ার লোক খুব কম দেখা যায়। কিছুতেই পেছপাও নন। তা মশায়ের জলপথে চলা অভ্যাস আছে কি? যদি থাকে, মালের অভাব হবে না।'

মণীশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'জলপথ?'

লোকটি রসিক, একটা শিহরণের অনুকরণ করিয়া বলিল, 'মাঘ মাসের শীত, তার ওপর ট্রেণ-জার্নি। শরীর গরম থাকে কি ক'রে, বলুন দেখি!'

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, 'ও, বুঝেছি। না, আমার ও-জিনিষ চলে না। কিন্তু আপনি যদি চালাতে চান, কোনো বাধা নেই।'

লোকটি বেঞ্চির তলা হইতে একটি হ্যাণ্ড-ব্যাগ তুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিল, বোতলের তরল পদার্থ গেলাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিল, 'একলা এ জিনিষ খেয়ে সুখ হয় না। ও-ভদ্রলোককে অফার করলুম, তা উনিও এ রসে বঞ্চিত। বলুন দেখি, এর মত ফুর্ত্তির জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি?'

মণীশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা ত বটেই।'

গেলাসের পানীয় গলায় ঢালিয়া দিয়া উৎসাহিতভাবে লোকটি বলিল, 'সেই কথাই এতক্ষণ

ও-ভদ্রলোককে বলছিলুম, দুনিয়ায় আসা কিসের জন্যে? ফূর্ত্তি করার জন্যে। যতদিন বেঁচে আছি, প্রাণ ভ'রে মজা লুটব, কি বলেন?'

মণীশ যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা।'

বোতল গেলাস ব্যাগে পুরিয়া নামাইয়া রাখিয়া লোকটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, একটি নিজে ঠোঁটে ধরিয়া মণীশকে একটি দিল। সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আমার নাম চারুচন্দ্র গুপ্ত, ইন্সিওরেন্সের দালালী করি, ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। অনেক বাজার ঘেঁটে বেড়িয়েছি মশায়; কিন্তু এ দুনিয়ায় সার বস্তু যদি কিছু থাকে তো সে ওই বোতল, আর—; বুঝেছেন তো?'

মণীশ সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'হুঁ।'

চারুচন্দ্র গুপ্ত বলিল, 'এতে লজ্জাই বা কি? পুরুষ হয়ে জন্মেছি কি জন্যে? মজা লুটব বলে। কিন্তু মশায়, একটি বিষয়ে আপনাদের সাবধান করে দি, যদি ফূর্ত্তি করতে চান, বিয়ে করবেন না। খবরদার। খবরদার। ও পথে হেঁটেছেন কি সব ভেস্তে গেছে।'

মণীশ কোনো কথা বলিল না, চারু আবার আরম্ভ করিল, 'এই আমাকেই দেখুন না—পনের বছর বয়স থেকে ফূর্ত্তি করতে আরম্ভ করেছি, কখনো ঠকেছি কি? নিজে রোজগার করি, নিজের ফূর্ত্তিতে ওড়াই, কারুর তোয়াক্কা রাখি না। ক্যা মজায় আছি বলুন ত? কিন্তু বিয়ে করলে এটা হত কি? অ্যাদ্দিনে সতেরটা ছানা গজিয়ে যেত। প্যান্-প্যান্ ঘ্যান্-ঘ্যান্, ডাক্তার আর ঘর, একবার ভেবে দেখুন দিকি!'

মণীশ এবারও চুপ করিয়া রহিল। লেপের মধ্যে শয়ান লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, অবিবাহিত জীবনের অপ্রাপ্য সুখৈশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া এখনি তাঁহার মুখ দিয়া নাল গড়াইয়া পড়িবে। তিনি কোনো মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'যে গল্পটা হচ্ছিল, সেটাই হোক না।'

চারু মণীশকে বলিল, 'ওঁকে আমার জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছিলুম, ইতিহাস ত নয়, মহাভারত। পনের বছর বয়স থেকে আজ পর্য্যন্ত কত কাণ্ডই যে করলুম! শুনলে বুঝবেন।' গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কখনো প্রেমে প'ড়েছেন?'

মণীশ সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না।'

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটি স্মরণ করাইয়া দিলেন, 'ওটা হয়ে গেছে। শাল্‌কের গল্পটা বলছিলেন।'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, শাল্‌কের গল্পটা। কিন্তু ওতে নূতনত্ব কিছু নেই মশায়। অমন দশটা আমার জীবনে হয়ে গেছে।'

মণীশ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'শাল্‌কের গল্প?'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, তখন আমি শাল্‌কেয় থাকি। বছর তিনেক আগেকার কথা।—ঠিক পাশের বাড়ীতেই, বুঝলেন কিনা, একটি ষোলো বছরের তরুণী। খাসা দেখতে মশাই, রঙ্ ফেটে পড়ছে, ঠিক বাঁ চোখের নীচে একটি তিল, আর গড়ন, সে কথা না-ই বললুম, মনে মনে বুঝে নিন। এক কথায় যাকে বলে—রমণী! বলুন দেখি, লোভ সাম্‌লানো যায়?

তা'র তখনো বিয়ে হয়নি, তবে হব-হব করছিল। আমি দেখলুম, বিয়ে হলেই ত পাখী উড়বে ; অতএব তার আগেই বুঝলেন কিনা ? মতলব ঠিক করে জানলা দিয়ে চিঠি ফেলতে আরম্ভ করলুম। চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কিন্তু জবাব নেই। সে আগে জানলায় এসে দাঁড়াত, আজকাল আর তাও দাঁড়ায় না ; আমাকে দেখে মুখ রাঙা করে সরে যায়। কিন্তু আমিও পুরোনো ঘাগী, অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। লেগে রইলুম। বুঝলুম কিছুদিন খেলবে। তারপর দিন পনের পরে হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব গরম হয়ে বললে, 'আপনি আমাকে যদি আর চিঠি দেন, বাবাকে বলে দেব।'

চারু কিছুক্ষণ মনে মনে হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে বলে দেব কথাটা সব মেয়েরই বাঁধি গৎ, বুঝেছেন। ন্যাকামি। আসলে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। আমি আরো প্রেম্‌সে চিঠি চালাতে লাগলুম। কিন্তু এক হপ্তা কেটে গেল, তবু সে কোনো সাড়াশব্দ দিলে না। অবিশ্যি বাপকেও বললে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাড়ির ঝিটাকে আগে থাকতেই টাকা খাইয়ে হাত করেছিলুম, ঠিক করলুম, এবার আর চিঠি নয়, অন্য চাল চাল্‌তে হবে। খবর পেলুম, রোজ সন্ধ্যের পর ছুঁড়ি খিড়কির বাগানে যায়। একদিন শর্ম্মাও পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। আচমকা আমাকে দেখে তো সে আঁৎকে উঠল, পালাবার চেষ্টা করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালুম, থিয়েটারি কায়দায় বললুম, 'বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার জন্যে।' সে চেঁচামেচি করে লোক ডাকবার চেষ্টা করলে। আমি তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলুম, বললুম, 'চেঁচালে কোনও ফল হবে না। আমি বড় জোর দু'ঘা মার খাব, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকালের দফা রফা, সেটা ভেবে চেঁচিয়ে লোক জড় কর।'

মেয়েটা চেঁচালে না বটে, কিন্তু তবু বাগ মানতে চায় না। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লুম, বললুম, 'আমার দু'জন মুসলমান বন্ধু পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচামেচি গোলমাল করেছ কি তারা এসে মুখে কাপড় বেঁধে—বুঝলে ? কিন্তু যদি ভাল কথায় রাজি হও তাহলে আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।' চারু আবার ব্যাগটা বাহির করিল, বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটির চোখ হইতে লুব্ধতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর ?'

গেলাস গলায় উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া চারু একটু মুখ বিকৃত করিল, তারপর হাসি হাসি মুখে বলিল, 'তারপর আর কি—হে হে—রাজি হয়ে গেল।'

মণীশের হাতের সিগারেট অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নিবিয়া গিয়াছিল, সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া সে এই কাহিনী শুনিতেছিল। এখন হঠাৎ সিগারেটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চারু বলিল, 'কিন্তু হলে কি হবে মশায়, মেয়েটা পোষ মানলে না। তারপর থেকে খিড়কির বাগানে আসাই ছেড়ে দিলে। ওদিকে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আমারও শাল্‌কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল'—ব্যাগটা আবার বেঞ্চের নীচে রাখিয়া দিল, 'দিন কয়েক পরে আমিও

শালুকে ছেড়ে দিলুম, তার বিয়েটা আর দেখা হল না।—বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ট্রেণের বেগ ডিস্টাণ্ট-সিগ্নালের কাছে আসিয়া মন্দীভূত হইল। চারু আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বাক্সটা মণীশের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, 'খান আর একটা। আপনার তো এসে পড়ল। শুনলেন তো গল্পটা? এর পর আর কোন ভদ্রলোকের বিয়ে করতে সাধ হয়? ভাবুন দেখি, আমার কপালেই যদি ঐ রকম একটি; নিন না—'

মণীশ হাত নাড়িয়া সিগারেট প্রত্যাখান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশের মুখখানা স্বভাবত খুব ধারাল না হইলেও বেশ সুশ্রী, কিন্তু গত কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যেন কদাকার হইয়া গিয়াছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে থামিতেই সে কম্পিত হস্তে হাতল ঘুরাইয়া নামিবার উপক্রম করিল।

চারু বলিল, 'আচ্ছা, তাহলে নমস্কার মশায়।'

মণীশ নামিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সে মনে মনে বলিতেছিল, না, জিজ্ঞাসা করব না, জিজ্ঞাসা করব না; কিন্তু শেষে আর পারিল না, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, 'মেয়েটির নাম কি?'

চারু বলিল, 'নাম? নামটা, রসুন, করুণাময়ী, কিন্তু নামের সঙ্গে চরিত্রের একটুও মিল নেই মশায়, হ্যা হ্যা, আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার।'

* * *

মণিমণ্ডিত-দেহ বিষোদ্গারী সর্পের মত অন্ধকার আকাশে গাঢ় ধূম নিক্ষেপ করিতে করিতে ট্রেণ চলিয়া গেল।

মণীশও একটা হোঁচট খাইয়া প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিল। টিকেট-কলেক্টর তাহার বন্ধু, ডিউটির জন্য সে বরযাত্রী যাইতে পায় নাই, নিদ্রাজড়িত স্বরে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, মণীশ শুনিতে পাইল না।

স্টেশন হইতে একশত গজের মধ্যেই মণীশের ছোট্ট লাল ইটের বাসা; অন্ধকার পথ দিয়া এক রকম অভ্যাসবশেই সে সেই দিকে চলিল। মাথার মধ্যে তাহার রক্ত ঘুরপাক খাইতেছিল। করুণা। করুণা এই। আজ দুবছর ধরিয়া সে অন্যের উচ্ছিষ্ট নারীকে নিজের একান্ত আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে। একদিনের জন্যেও সন্দেহ করে নাই যে করুণা তাহাকে ঠকাইতেছে। উঃ, এই করুণা।

একটা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া সে বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইল। দেখিল তাহার শরীরের সমস্ত পেশীগুলা শক্ত হইয়া আছে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের নখ হাতের তেলোয় বিঁধিয়া জ্বালা করিতেছে। সে জোর করিয়া পেশীগুলা শিথিল করিয়া দিল; তারপর দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলিল। করুণা একটা—

কি করা যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ কি করে? খুন।…হাঁ, খবরের কাগজে তো এমন অনেক দেখা যায়। যাহার স্ত্রী কুমারী অবস্থায় লম্পট দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছে, সে আর কি করিতে পারে? করুণাকে খুন করিয়া নিজে ফাঁসি যাওয়া ছাড়া অন্য পথ কোথায়?

কিন্তু—, মণীশ থমকিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই লম্পটটাকে সে ছাড়িয়া দিল কেন? তাহাকে আগে খুন করিয়া তারপর করুণাকে—

বাড়ির সম্মুখস্থ হইয়া সে দেখিল, তাহার শয়নঘরের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। আলো কিসের? করুণা তো ঘুমাইয়াছে! তবে কি—?

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত গিয়া মণীশ জানালার কাচের ভিতর দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, করুণা মেঝেয় কম্বল পাতিয়া একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে।

মণীশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর গিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল, চাপা বিকৃতস্বরে বলিল, 'দোর খোল।'

করুণা দোর খুলিয়া দিতেই মণীশ ঘরে ঢুকিয়া দরজার খিল আঁটিয়া দিল, তারপর করুণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমি জানতুম তুমি এ গাড়িতে ফিরে আসবে, তাই শুই নি।'

মণীশের মাথার ভিতরটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। এই কথাগুলির পরিপূর্ণ অর্থ পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহার ছিল না; তবু সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিল যে, ইহার বেশী আর কেহ কোন দিন পায় নাই, প্রত্যাশা করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নিশীথরাত্রে তাহার জন্য করুণার এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা, ইহার তুল্য পৃথিবীতে আর কি আছে?

'করুণা!'

সহসা সে দুই হাত বাড়াইয়া করুণাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। এত জোরে চাপিয়া ধরিল যে, করুণার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি?'

মণীশ তাহার গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু না। ট্রেণে আসতে আসতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঃ! এমন বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলুম! চল শুইগে।'



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। তিন মাস বাড়ী বসিয়া থাকার দরুণ, বলাইয়ের চিকিৎসার দরুণ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার যো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজখবর যা নেবার, তিনিই লইয়া থাকেন, অন্য লোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপাড়া যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন? বেরিয়ে পড়, চলে যাও এবার। তোমার দোষ একবার বাড়ী এসে চেপে বস্‌লে তুমি নড়্‌তে চাও না।

বিপিন বলিল, সে চাকরী আর এতদিন কি আছে কাকা? সে গিয়েচে।

—কি করে জানলে?

—জানাজানি নয়, তবে আমি ধাত বুঝি কি না!

—ওসব কথা নয়, তুমি চলে যাও।

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকরী গিয়েচে আজ মাস খানেক হোল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিই নি।

—চিঠির উত্তর দাও নি? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্চ সে ভালো খুব, না? তোমার উপায় যে কি হবে আমি কিছু বুঝি নে বাপু! না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরী এখনও যায় নি। নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

—বেরিয়ে পড়্‌বো কাকা, তবে সে দিকে নয়। আমি ডাক্তারি কর্‌বো ভেবে রেখেচি অনেক দিন। ওই সোনাতনপুর, কামার গাঁ, পিপ্‌লিপাড়া এসব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসব অজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুর বস্‌বো ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বস্‌বো। দেখি কি হয়। জমিদারী শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর করচি নে কাকা। বলাই মারা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেচি ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদখেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথা বলচেন, কেন বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদারবাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারি বই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সেই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল,

তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে ওই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটাও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাই বলিবার ঝোঁকে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথা বলা। কৃষ্ণকাকার সামনে।

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদারবাবুর মেয়ে? বিয়ে হয়েচে? তোমার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে বৈকি। বাইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কিনা! বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ী ছেলেবেলায় যেতাম, তখন থেকেই আলাপ। এক সঙ্গে খেলা করেচি। এখনও আমাকে যত্ন আত্যি করে বড্ড, আর কিসে আমার ভাল হবে সর্ব্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার সুরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া উহার দিকে চাহিয়াছিলেন, বিপিন আবার দেখিল সে মানীর সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেন অদ্ভুত নেশা! মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরত তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা! মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিস চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন?

দিন পনেরো পরে।

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বল্লেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েচে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্ছি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর ওর বাড়ী থেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়ে মানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আর কি করি, কাল থেকে তাই করবো। ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখে দেখতে পারবো না।

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সে ঝাঁঝের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারবো না তো। না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ী ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে। চাকুরী তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলোযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তর দিকের ভাঙা জানালাটার ধারেই তক্তাপোষখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরেই কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল। এখন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারীর ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্‌বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার কেমন সহানুভূতি হইল। বেচারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, তাহাদের বাড়ীতে অনেক আশা করিয়াই উহার বাপ-মা বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতে পায় না পেট ভরিয়া দুবেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে কমই মেশে, কারণ গরীব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ীর আঁচলটা মাদুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যি কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ী থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবো ভেবেছি। তুমি কি বলো? পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষীবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছু পাবো। তুমি কি বলো?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিস বটে। সে একটু আশ্চর্য্য হইল, খুসিও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি?

—বই পেয়েছিলাম জমিদার বাড়ীর ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ী।

মনোরমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি? লাইব্রেরি তো বলে। আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠীমা বই আনাতেন, আমরা দুপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হোলো, হোলো। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো না কেন সেখানে ? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পুজোর পরেই নিয়ে আসবো এখন। কি বলো ?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন্ মুখ নিয়ে ? নিজের বাবা মা থাকলে অন্য কথা ছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছ। শুধু গায়ে শুধু হাতে তাদের সেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, দুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বউদিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়ে এখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার ওপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড়্ হুড়্ করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয় ? দুদিন একটু আমায় নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেঙ্কাডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব ? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি যাও তো চলো। আমাদের ভাবনা আমরা ভাব্বো।

—ঠিক ? সে ভার নেবে তো ?

—না নিয়ে উপায় কি বল। নিতেই যখন হবে।

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজে। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ি দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরোনো কোঠা বাড়ি, বহুকাল মেরামত হয় নাই, কার্নিসে স্থানে স্থানে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে! শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন।

দত্ত মহাশয়কে পূর্ব্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন। তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, বাহিরবাটির চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেস্টি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটী সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়। নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটি কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা পুরান শপ্ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাক খাইবার উপকরণ টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আসবাব চণ্ডীমণ্ডপে নাই।

খানিকটা অপেক্ষা করিবার পরে একটি ছোট ছেলে বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিপিন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, দত্ত মশায় বাড়ি আছেন খোকা ? বল গিয়ে একজন লোক ডাকছেন। বল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ছেলেটি একবার তাহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে জনৈক বৃদ্ধের পিছু পিছু সে আবার বাহিরের উঠানে আসিল।

বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে পাশেই নদী, ওই বাঁশঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গণিল। কচুরীপানার দামে স্নানের ঘাটের জল পর্য্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে, যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়া উঠিলে গা চুলকায়। কোনরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোল-কোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকাল সকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর এক পাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে নিন্, সেই কখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কম হয়েছে। ওরে, জল আনলি নে? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধ্যে আহ্নিক হয়েছে কি?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, সন্ধ্যে আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা হোল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ ভাগ্যে সে বাড়িতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই। তাহা হইলে এ বাড়িতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে।

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

দিন পনর কাটিয়া গিয়াছে।

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্ত মহাশয় বাড়ি হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধ বাধ ঠেকিলেও উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু,

আজ তোমার ঠাকুমাকে বল, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না। রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিসপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়া চলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে ছুইবার হাট বসে, আট দশখানি গ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরে টিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরান শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমত ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল ছুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালে উঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, ছুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হবার পূর্ব্বেই দত্তবাড়ি ফিরিয়া যায়, কারণ পথের ছুধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড় ফুঁক শিকড় বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া উপায় কি? তাহার মত হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ সহরে স্থান হইবে?

বাড়িতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়াছিল, সেটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোন রোগীর বাড়ি যাইবার সময় সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমার কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসা দেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়ই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে। তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষী, চশমা পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, স্যালাম ডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিন্‌সিল ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড্ড ডাক্তার গো। ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি' ব্যামো সারে। চেহারাখানা ছাখছ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। পসার যে খুব বেশি জমে, তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরীব, বিপিন দেখিল পয়সা দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যেতে হবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গিন। নরোত্তমপুরের যছু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনে বললেন, আপনারে ডাকৃত্তি। সলা পরামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। যছু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মত হাতুড়ে

বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে বলিল, ওসব কনসাল করার ফি আলাদা। সে আপনি দিতে পারবেন ?

—কত লাগবে বাবু ? যদুবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যদুবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? তিনটাকা ফি দিতে পারবে ?

লোকটা এক কথায় রাজি হইল।

—হাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবাম্নু। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে ?

এত সহজে লোকটা রাজি হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ি নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

বেলা দশটার সময় রোগীর বাড়ি পোঁছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন রোগা মত প্রৌঢ় লোক বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কাল সার্জ্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আঁটা জুতা। বুঝিল ইনি যদু ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কাল দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন, তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি। বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষী লোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোন দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলে মেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড় হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ও পসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যে করিয়াই হউক।

যদু ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায় ?

বিপিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিল যদু ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকর্দ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকীল মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ও ধরণ অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া যেন সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমা শুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উঁচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও ! কোন বছর পাশ করেছেন ?

—আজ তিন বছর হ'ল।

এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন ?

বিপিন বুঝিয়াছিল লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ি সে এত কাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিত বলিল, আই. এস. সি. পাশ করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি। যদু ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিসটা বড় সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ির পেশেণ্টের রোগটা কি ?

—রেমিটেণ্ট ফিভার। সঙ্গে রক্ত আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার।

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ির মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ কুড়ির বেশী নয়, চেহারা রোগের পূর্ব্বে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া বুকে পিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্য করেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়্কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেন্‌টা দেওয়া উচিত হয় নি। প্রেস্‌ক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের।

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দুখানা প্রেস্‌ক্রিপশন বিপিনের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়ে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরণের কত রকমের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত পরিচিত। কি ভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে। যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশী নয়। যদু ডাক্তারকে হাতে রাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক সুবিধা। এ অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীরস্বরে বলিল, চমৎকার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদ্‌লাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্ব্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেণ্ট্ করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবচি।

—আর একবার আজ জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ, নিশ্চয়ই। আমিও তা—

ফিরবার পূর্ব্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কিনা।

বাঙালীর নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযান

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

[বিদেশী অভিযাত্রীদের নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া একদিকে যেমন মানুষের অসাধ্য-সাধনপ্রিয়তার জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতাম, অন্যদিকে তেমনি, অসাধ্য-সাধন তো দূরে থাক, সাধ্যসাধনেও বাঙালীর আলস্যের কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইতাম; অর্থাৎ একদিকে হইতাম বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবাক এবং অন্যদিকে হইতাম লজ্জায় ও দুঃখে নির্ব্বাক।

কিন্তু এখন আর লজ্জার কারণ নাই, অথবা থাকিলেও সে কারণ অন্যপ্রকার। এতদিন যে বিনা কারণে লজ্জিত হইতাম সেই কথা মনে করিয়াই এখন লজ্জিত হই। কিছুদিন আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে; বিদেশীরা যখন হয়তো এ ব্যাপারটার কল্পনাও করে নাই সেই সুদূর অতীতে তিনি, অবশ্য তখন তিনি ছিলেন দুঃসাহসী তরুণ, নির্ভীক, বেপরোয়া—নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কল্পনা তো করিয়াছিলেনই, উপরন্তু অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, বাঙালী জাতির পক্ষে তেমনি গৌরবের। দুঃসাহসিক অভিযানে যে বাঙালী পশ্চাৎপদ নহে, তাহা বিশ্ববাসীকে আজ জোর গলায় জানাইয়া দেওয়া দরকার। সে কথা মনে করিয়াই এই কাহিনী সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

এই মহাগৌরবময় কাহিনী এতদিন যে ধামাচাপা ছিল, তাহার কারণ কাহিনীর নায়ক বঙ্গগৌরব ভদ্রলোকটির সঙ্গে এতদিন আমার আলাপ হয় নাই, এবং আত্মপ্রকাশ ব্যাপারে তিনি বরাবরই অতিমাত্রায় লাজুক। নেহাৎ দৈবক্রমেই আমার ইঁহার সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হইয়াছে; এবং কাহিনীটি তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতেও আমার কম বেগ পাইতে হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, এই ভদ্রলোকটির সহিত বাঙালী জাতির প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া একটা পুণ্য সঞ্চয় করিব। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে একরকম হাতে পায়ে ধরিয়াই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার নাম ধাম কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।

যতদূর মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমার কিন্তু মনে হয় এই আত্মবিস্মরণের ব্যাপারে শুধু জাতির উপর দোষ চাপানো অসঙ্গত; কারণ ব্যক্তির অপরাধও বড় কম যায় না। ব্যক্তিরা যদি নিজেকে এভাবে চির অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে জাতি বেচারা করিবে কি?

কিন্তু এত উত্তেজিত হইলে আসল কাহিনীটি ধামাচাপা পড়িবার ভয় আছে। অতএব বর্ত্তমান সত্য কাহিনীটির নায়কের নাম ধরা যাক বিরিঞ্চিকুমার পাকড়াশী, অথবা সংক্ষেপে বিরিঞ্চিবাবু। বিরিঞ্চিবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা ও আলাপ হইয়াছিল মনুমেণ্টের ধারে চিনাবাদাম খাইতে খাইতে। সেই আলাপ হইতে কি প্রকারে তাঁহার নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কাহিনীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে গেলে অনেক কিছু বলিতে হইবে, সময়ে কুলাইবে না। সুতরাং সে সব কথা এখন থাক। কাহিনীটাই বলা যাক—এবং তাহা বিরিঞ্চিবাবুর নিজের অননুকরণীয় ভাষাতেই। তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে পরিষ্কার গাঁথিয়া গিয়াছে। দুই একটা কথা এদিক ওদিক হইয়া যাইতেও পারে, কারণ হাজার হইলেও মানুষের মন গ্রামোফোন নহে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু লোকসান হইবে না।...]

বাঙালী না পারে এমন কর্ম্ম এখনো জন্মায় নি মশাই, জান্‌লেন? অন্য জাতের সঙ্গে বাঙালীর তফাৎ কোথায়? না, অন্য জাত যা পারে তাই ক'রে ফেল্‌তে চায়, আর বাঙালী যা পারে তা অনেক সময় করবার চেষ্টাই করে না। বলে "যাক্ গে ছাই; ও ক'রে আর কি হবে?"

তা ছাড়া অন্য জাত যা কিছু করে, তারি সঙ্গে বাজায় ঢাকের বাদ্যি। যেমন কাজ তার তেম্নি

ঢাক—অনেক সময় ঢাকটাই কাজের চাইতে বড়ো। কিন্তু বাঙালী, মশাই, ঢাক বাজাতে জানে না। বলে "কি দরকার?" তাই বাঙালী দেখবেন অনেক দুঃখুকষ্ট স'য়ে অনেক কিছু করে, আর তারি ওপর টেক্কা মেরে দেয় অন্যে।

আমার নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কাহিনী শুনতে চেয়েছেন আপনি। বিশ্বাস আপনি করবেন কিনা জানি না, তবু বলি। সে মশাই অনেক বছর আগেকার কথা। সায়েব ব্যাটারা তখনও এমন পাহাড়ী হয় নি। তখন যৌবন বয়েস, সারা গায়ে রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে। তখনকার দিনে কচি বয়েসেই বিয়ে হয়ে যেত, আজকালকার মত প্রেম ট্রেম চলত না। হ্যাঁ, আমারো বিয়ে হয়ে গিছিলো বই কি? সেই কথাই তো বল্‌ছি। এখন উনি স্বর্গে আছেন, বলতে নেই, গল্পের খাতিরে তবু বলি, বউ ছিল ভারী বদ্‌রাগী মশাই, একবার একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে রেগেমেগে গেল চলে বাপের বাড়ি। প্রথমটা দুঃখ হ'ল; শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু চ'টে উঠলুম। ভাবলুম "ধুত্তর্, একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার এবার করবই।" কিন্তু অ্যাড্‌ভেঞ্চার বাড়িতে বসে হয় না। বেরিয়ে পড়া চাই। কোথায় বেড়িয়ে পড়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে তো অস্থির হয়ে উঠলুম। একদিন হঠাৎ আনমনা ভাবে ভুগোলের পাতা উলটাতে চোখে পড়ল নাঙ্গা-পর্ব্বত। কিছুক্ষণেই যে তা চোখে পড়্‌ল মশাই! তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললুম "মিল্ গিয়া! মিল্ গিয়া! মার্ দিয়া কেল্লা!" ইত্যাদি। বেজায় চটলে অথবা বেজায় খুশী হয়ে গেলে অনেকের মুখ থেকে যেমন ইংরিজী বেরয় আমার বেরুত তেম্নি হিন্দী।

যাই হোক, ঠিক ক'রে ফেললুম যেমন ক'রেই হোক নাঙ্গা-পর্ব্বতে যেতেই হবে, তাতে প্রাণ যায় যাক, থাকে থাক, কুছ পরোয়া নেই। বিশেষ ক'রে বউর ওপর রাগের বা অভিমানের, যে জন্যেই হোক, প্রাণটার ওপর সামান্য যা একটু আধটু মায়া আগে ছিল তাও উবে গিয়েছিল কর্পূরের মত।

পাশের পাড়াতেই থাকত ভুগোলের মাস্টার ভজহরি সোম। তার সঙ্গে কনসাল্ট ক'রে আর টাইম-টেবিল ঘেঁটে প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেললুম, মতলবটা অবশ্য ভজু মাস্টারকে টের পেতে দিই নি। কেন তা বুঝতেই তো পারছেন। তারপর তল্‌পী তল্‌পা গুছিয়ে নিতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না, গুছানোর কাজটা অনেকদিন আগেই বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বেশী কিছু জিনিসপত্তরও নিলুম না, কেন তাও বোধ হয় বুঝতে পারছেন। পাঁজির ওপর বরাবরই একটা অচলা ভক্তি ছিল, ওটা কন্‌সাল্ট না ক'রে পার্‌লুম না। বেশ ভাল ক'রে যাচ্ছেতাই দেখে একটা দিন ঠিক করলুম, অশ্লেষা, মঘা না দিক্‌শূল, ঠিক এখন মনে হচ্ছে না। অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে হ'লে ঐ করতে হয় মশাই, তা নইলে অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে কেন? শুভদিন শুভলগ্ন বেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার হয় না।

তারপর তল্‌পী তল্‌পা নিয়ে একদিন রাত্তিরে সুট ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাঁ, তার আগে অবশ্য মার কাছে বিদায় নিয়ে নিলুম। মা মানেই মার একখানা ছবি—তিনি আমার জন্মের বছর পাঁচেক পরেই স্বর্গে গিয়েছিলেন কি না। বল্‌লুম "মাগো! যাবার ক্ষণে আজ আমায় দাও তোমার আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ। নিদারুণ অভিশাপ। সে অভিশাপ যেন হিংস্র সাপের মত অনবরত আমার পিছু পিছু তাড়া ক'রে নাঙ্গা-পর্ব্বতের মাথা পর্য্যন্ত নিয়ে যায়। সে অভিশাপ যেন কিছুতেই আমায় পথের মাঝখানে থাম্‌তে না দেয়, যেন একটু জিরিয়ে নেবার নেশায় পড়লেই

তখ্‌খুনি হাজার বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়। যেন সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—কখন একটা মুহূর্ত্তের জন্যও নাঙ্গা-পর্ব্বতকে ভুল্‌তে না পারি। ওগো আমার বাঙালী মা, আজ অন্ততঃ একটি মিনিটের জন্য অবাঙালী হও। আজ তোমার—" কান্নায় গলা ভারী হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না। দেখলুম ছবিতে, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, পষ্ট দেখতে পেলুম, মার চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠেছে। কোথায় অভিশাপের নির্ম্মম শুষ্ক ভ্রূকুটি? তার বদলে আশীর্ব্বাদের ছলছল অশ্রু। বাঙালী মায়ের ঐ তো দোষ মশাই। জানে শুধু প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করতে, অভিশাপ দিতে জানে না। ঐজন্যই বাঙালী গোল্লায় যাচ্ছে—যাক্‌গে। বেরিয়ে তো পড়লুম বাড়ির মায়া ছেড়ে। অ্যাঁ, কি বল্‌ছেন?…না না, ওসব অবান্তর কথা টেনে আনবেন না মশাই। তা হ'লে কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলব হয়তো। এ তো আর আজকের কথা নয়। আপনারা তখনো পৃথিবীর আলো দেখেন নি।…

চ'লে গেলুম পাটনা। সেখানে ছিল বৃন্দাবনপ্রসাদ ক্ষেত্রী, সুর্ত্তি, জর্দ্দা আর কিমামের দোকান ক'রে সে তখন দিব্বি জাঁকিয়ে বসেছে। অনেকদিন আগে হয়েছিল আলাপ কল্‌কাতায়। ব্যাটা কিছুতেই আমায় ভুলতে পারে নি। মাঝে মাঝেই চিঠি লিখত। উত্তর দিতুম বটে, নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে, কিন্তু সবগুলোর নয়। কে মশাই 'ফরনাথিং' পয়সা খরচা ক'রে মরতে যায়? পাটনা যেতে লিখেছিল কয়েকবার বিশেষ ক'রে, ওর বাড়িতে। ভাবলাম, এই সুযোগে ওকে একটু খুশী করাই যাক না কেন। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে উঠলুম গিয়ে ওর বাড়িতে। সে এক বিরাট বাড়ি মশাই। সুর্ত্তি-জর্দ্দা বেচে কেউ অমন এলাহি বাড়ি করতে পারে তা চোখে দেখলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা শক্ত।

আমায় পেয়ে তো বৃন্দাবন খুব খুশী। কি তার আদর যত্ন! রোজ ভোর হতে না হতেই চা, লুচি, হালুয়া, কিছু মিষ্টি, আর পাঁপরভাজা—সব বৃন্দাবনের বউএর নিজের হাতের তৈরী। কি মিষ্টি হাত! বৃন্দাবনের ওপর হিংসা হতে লাগল। প্রত্যেকটি জিনিস যেন অমৃত—কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা খাই, তাই হয়ে উঠ্‌ল সমস্যার ব্যাপার। তারপর দুপুরের আর রাতের খাওয়ার ফর্দ্দ দিলে আপনি হয়তো মনে করবেন ধাপ্পা দিচ্ছি। তা ছাড়া অত মনেও নেই এখন।

ক্ষেত্রী অনেকের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলে। তখন বিহার আর বাংলা ছিল দুটি যমজ বোনের মত মিলেমিশে। বিহারীরা বাঙালী পেলে বেজায় খুশী হ'ত, এখনকার মত ক্ষেপে উঠতো না। বাঙালীদের কথা আর কি বলব? তাঁরা তো মহাপ্রভুর মত প্রেমে গলেই আছেন, বিহারী পেলে এখন মহা খুশী। এ তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাংলার থানায়, রেল আর ষ্টীমার স্টেশনে, রান্নাঘরে, বাজারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পান-সরবতের দোকান—নানা জায়গায় বিহারীরা সানন্দে বিহার করছে বাঙালীর প্রেমের ধারায় স্নান করে। বাঙালীর বিহারী-প্রেম তখন এইরকম ছিল। তখনকার দুতরফা এখন একতরফা হয়ে গেছে, এই যা তফাৎ।

এর বাড়ি ওর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে হয়রান হয়ে গেলুম। বাড়ির কথার সঙ্গে সঙ্গে নাঙ্গা-পর্ব্বতের কথাও ভুলে যাবার যোগাড় হ'ল। ফের মনে হ'ল যখন বৃন্দাবনের বউ চ'লে গেল বাপের বাড়ি—অবশ্য রাগ ক'রে নয়, অন্য কোন কারণে। তখন আমারো মনে পড়ে গেল বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়া বউএর কথা, রাগ আর অভিমান আবার উঠল মাথা উঁচিয়ে, নাঙ্গা-পর্ব্বত যেন দুহাত বাড়িয়ে

ডাকতে লাগল। আবার তল্পী-তল্পা গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম এলাহাবাদ, বৃন্দাবনকে অনেক বুঝিয়ে। বৃন্দাবন সঙ্গে দিয়ে দিল প্রায় এক হাঁড়ি আধ-চাটনী আধ-মোরব্বা, ওর বউএর নিজের হাতের নাকি তৈরী। আচ্ছা বউ-পাগলা লোক ছিল এই বৃন্দাবন! খানিকটা আমলকী, খানিকটা তেঁতুল, এইরকম আর কি কি সব মিশিয়ে তৈরী—ভারী চমৎকার জিনিস! অমন জিনিস আর কোনদিন খাই নি। আশা করেছিলুম বেঁচে থাকলে আরো খাব। কিন্তু আমি বেঁচে থাকলেও বৃন্দাবনের বউ মরে গেল। তার দুমাস বাদে বৃন্দাবন ফের বিয়ে করেছিল বটে, কিন্তু এই দু নম্বর বউয়ের সখও ছিল না, গুণও ছিল না।

যা হোক, ট্রেণে প্রায় সারাটা রাস্তা ঐ অপূর্ব্ব জিনিস খেতে খেতে চ'লে গেলুম সটান আগ্রাতে। নাঙ্গা অভিযান থেকে ফিরে আসতে পারবো কিনা কে জানতো? তাই ভাবলুম শাজাহানের চিরন্তন অশ্রু তাজমহল একবার নিজের চোখে দেখে যাই। দেখলুম। অনেকে বলেন, তাজমহল দেখে নাকি তাদের ভুল ভেঙেছে; যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের জন্য তাজমহলের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে, বাস্তবিক পক্ষে তাজমহলে নাকি তার কিছুই নেই। সুতরাং অনেক আশা নিয়ে তাজমহল দেখতে এসে তাঁরা নাকি ফেরেন নিরাশ হয়ে। আমার বেলায় কিন্তু হ'লো তার ঠিক উল্‌টো। তাজমহল যে আমার এত ভালো লাগবে তা আমি আগে ভাবতে পারি নি। কথাটা কি জানেন? শুধু তাজমহলটাই সত্যিকারের তাজমহল নয়, সত্যিকারের তাজমহল হচ্ছে আদ্ধেক তাজমহল আদ্ধেক কল্পনা। তাই যারা শুধু তাজমহলটাই দেখে তারা সত্যিকারের তাজমহল দেখতে পায় না।

তাজমহল দেখে শাজাহান ও মমতাজের কথা মনে হতে লাগলো। ভাবতে লাগলুম এক একটা লোক কি ভাগ্য নিয়েই না জন্মায়!

আগ্রা থেকেই বেশ একটু ঠাণ্ডা পাচ্ছিলুম, দিল্লী গিয়ে আরো পেলুম; তারপর সিমলা গিয়ে দেখি রীতিমতো হাড়-কাঁপানো শীত। আমাদের বাংলাদেশের শীত মশাই, তার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষ। সাধে কি আর গভর্মেণ্ট সিমলাকে করেছে গ্রীষ্মকালের রাজধানী? ইংরেজ জাতটার লক্ষ্য ক'রে দেখবেন আপনি, মগজে পদার্থ আছে, যাকে আমরা 'কমন্ সেন্‌স' বলি।

আমার অভিযানের সত্যিকারের আভাস যেন প্রথম পেতে লাগলুম। যত নাঙ্গা-পর্ব্বতের কাছাকাছি পৌঁছুবো ততই শীত বাড়বে হু হু ক'রে, তাই নিজেকে আস্তে আস্তে শীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ভালো। বলে বটে "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়", কিন্তু নামে আর কাজে সব সময় মিল থাকে না। বেশী সওয়াতে গেলে শরীর আবার দুরাশয় হয়ে ওঠে। তাই বিশেষ ক'রে পাহাড়ী অভিযানের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের পলিসি। সায়েব ব্যাটাদের মাথায় এ পলিসিটা ঢোকে না, আর ঐ তো হয় ওদের কাল। ব্যাটাদের বুদ্ধি আছে, মরণকে ডোণ্ট কেয়ার করবার মতো সাহস আছে, কিন্তু শনৈঃ পন্থা ওদের ধাতে নেই। যে ঘোড়াকে চাবুক মেরেও নড়ানো শক্ত সে এক আপদ বটে, কিন্তু যে ঘোড়াকে রাশ টেনেও থামানো যায় না সেও আপদ কম নয়। এই যে কতগুলো সায়েব পাহাড়ে চড়তে গিয়ে মারা পড়লো, এরা মারা পড়তো না যদি শনৈঃ পলিসিটা এদের মাথায় ঢুকতো।



"সপ্ত-পদী" শ্রীসুধীরকুমার রায়

এরা করে কি জানেন? উঠছে তো উঠছেই। যতই ওরা উঠছে, থার্মোমিটারে ডিগ্রী ততই নামছে, তবু ব্যাটাদের প্রান্তি নেই। অবশ্য তার কারণ আছে। ঠাণ্ডা দেশের মানুষ কিনা, কাজেই রক্ত ওদের আমাদের গরম দেশের লোকের চাইতে ঢের বেশী গরম থাকে। ভগবান্ Law of Average, মানেই গড়ের নিয়ম মানেন কিনা, কাজেই যে দেশে যত বেশী গরম বা ঠাণ্ডা, সে দেশের রক্ত ততই বেশী ঠাণ্ডা বা গরম। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি থাকে কিনা। ও পদার্থটি বরফ রক্তকেও একেবারে গরম জল বানিয়ে ছেড়ে দেয়। কাজেই সায়েবরা যে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শেষকালে ব্যাটারা গড়ের মাত্রা ছাড়িয়ে উঠে যায়, ওদিকে ব্র্যাণ্ডিও যায় ফুরিয়ে। পাহাড়ে তো আর পিপে পিপে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ওঠা যায় না, বা রেললাইনও নেই যে ওয়াগন বোঝাই ক'রে ব্র্যাণ্ডি চালান দেবে।

তখন খাঁটি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কি? না, আস্তে আস্তে শরীরকে সইয়ে সইয়ে ওঠা। খানিকটা উঠে ঠাণ্ডাটা যখন দেহে স'য়ে গেল, তখন আরো উঁচুতে আরো ঠাণ্ডায় ওঠা। কিন্তু ওরা তো তা করে না। সবতাতেই ওদের 'ধেৎ-তেরি' ভাব কিনা। শরীরকে হঠাৎ অসম্ভব রকম সওয়াতে যায়। ফলে যা হয় তা তো খবরের কাগজেই দেখতে পান।

আমি কিন্তু সিমলার শীত দেখেই বুঝলুম গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গেলে কিস্সু হ'বে না। গরম সুট করিয়ে নিলুম এক জোড়া। প্রথম প্রথম পরতে একটু অসুবিধা হয়েছিল বটে, বরাবর ধুতি পরা অভ্যাস কিনা। কিন্তু অ্যাড্ভেঞ্চার করতে বেরুলে ওরকম অসুবিধা একটু আধটু এসে থাকে। ও 'মাইণ্ড' করলে চলবে কেন?

হোটেলটা কিন্তু ছিল ভালো। ম্যানেজার দিব্বি মিশুক ভদ্রলোক। সন্ধ্যাবেলা নানারকম খোসগল্প ক'রে অমন শীতেও হাসির হল্লায় আসর গরম ক'রে তুলতেন। কিন্তু একদিন তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলুম, যখন শুনলুম, ওঁর ধারণা বাঙালী মোটেই 'অ্যাড্ভেঞ্চারাস্' নয়। নিজের অপমান সওয়া যায় মশাই, কিন্তু জাতির অপমান কি প্রাণে সয়? ক্ষেপে গিয়ে আরেকটু হ'লেই আমার অভিযানের কথা ব'লে ফেলতুম, অনেক কষ্টে চেপে গেলুম। এত বড় একটা আইডিয়া ফাঁস ক'রে দেওয়াটা ঠিক মনে হ'লো না। আত্মসংযম, আত্মগোপন না থাকলে কোনো বড় কাজই করা চলে না। পাছে সংযম হারিয়ে ফেলি সেই ভয়ে চ'লে গেলুম কাশ্মীরে—শ্রীনগর।

বাস্তবিকই শ্রীনগর। স্বর্গ কোথায় লাগে মশাই তার কাছে? তখন তুষার পড়তে সুরু হয়েছে। ভোরবেলা উঠেই দেখতুম চারদিকে যা কিছু সব সাদা, ভোরের তুষার এসে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে দুহাত দিয়ে যেন মুছে দিয়ে গেছে। ধর্ম্মশালার জানালা থেকে ভারী চমৎকার লাগতো দেখতে। মুখে ব'লে আপনাকে বোঝানো যাবে না। পারেন তো গিয়ে দেখে আসবেন একবার।

ঠাণ্ডা তখন খুব। পথে অমৃতসর থেকে একখানা ভালো গরম দেখে শাল কিনে নিয়েছিলুম; অমৃতসরের শাল ও কার্পেট্ যে বিখ্যাত তা ভুগোলে প'ড়ে থাকবেন। কিন্তু শীত তাতেও মানতে চায় না।

বাড়ী ছাড়ার পর তখন বোধ হয় মাসখানেক হ'য়ে গেছে; এসেছিও বোধ হয় কম্‌সে কম্ হাজার দেড়েক মাইল। নাঙ্গা-পর্ব্বত আর বেশী দূরে নয়। গায়ের রক্ত যেন টগবগ ক'রে উঠলো।

এবার প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তৈরী করতে হবে। নৌকো তীরের কাছে এলো ; ওরে মাঝি! এবার কসে দাঁড় টানতে হবে, হাল রাখতে হবে ঠিক। মস্ত লম্বা পাড়ি দিয়ে এসেছিস তুই, বুকে নিয়ে অসীম অদম্য সাহস। আর সামান্য পথ মোটে বাকী।

আকাশের কোণে মেঘের মতো এক ঠাণ্ডা উদাসী সন্ধ্যাবেলা—হঠাৎ ঠাণ্ডাটা একটু বেশী পড়ার জন্যেই হয়তো—শরীরটা যেন একটু কেমন কেমন ক'রে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও। থার্ম্মোমিটার লাগিয়ে দেখ্‌লুম জ্বর হয়েছে একটু। কিন্তু একটু থেকেই অনেকটুকু হয়। কাজেই ভাবনা হ'লো সেবাধর্ম্মে মতি আছে এ হেন লোক দরকার হ'লে এ ধর্ম্মশালায় পাওয়া যাবে কিনা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা ক'রে যাচ্ছি। তখনকার অবস্থাটা কেমন যেন একটু নির্লিপ্ত ভাব ; চিন্তা আছে, অথচ উদ্বেগ নেই। সমস্ত শরীরটা যেন ঝিমিয়ে আছে। এক দিকে অনেক দূরে ধূ ধূ দেখা যাচ্ছে যেন আমার পেছনে ফেলে আসা বাড়ী, অন্য দিকে মাথা উঁচু ক'রে নাঙ্গা পর্ব্বত, আর মাঝখানে আমি। বাড়ীর চিন্তা, মোক্ষদাসুন্দরীর চিন্তা—সে সব যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেকে যখন খুব অসহায় মনে করতে থাকে তখন শেষটায় তার এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে নিজের অসহায়তার কথা ভুলে যায়। আমারো তাই হ'লো। তারপর আস্তে আস্তে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম টের পেলুম না। কেউই পায় না।

স্বপ্ন দেখলুম—নাঙ্গা-পর্ব্বতের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় নিজেকে অদ্ভুত কৌশলে ব্যাল্যান্স ক'রে দাঁড়িয়ে আছি আমি—প্রথম বাঙালী, প্রথম ভারতীয়, প্রথম মানুষ। মানুষের কাছে পরাজয়ের আনন্দে চুপ ক'রে আছে নাঙ্গা পর্ব্বত, আর অনেক নীচে কে এক নারী কাতর চোখে চেয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম মোক্ষদাসুন্দরী। বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে ডাকছে "ওগো নেমে এসো, নেমে এসো।"

স্বপ্ন আর ঘুম একই সঙ্গে ভেঙে গেল। দেখি বিছানায় আমার শিয়রের কাছে ব'সে আছে কে এক ভদ্রলোক। মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললুম "ন্যাপ্‌লা না?"

উত্তর হ'লো "হ্যাঁ, কিন্তু খবরদার! ন্যাপ্‌লা ন্যাপ্‌লা আর বল্‌বি না। আমি আজকাল রিভলিউশনারি।"

দুজনে পাঠশালায় পড়েছিলুম একসঙ্গে ছেলেবেলায়। তখন থেকেই ভাব জমে উঠেছিলো। তারপর কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ন্যাপ্‌লা যে বাড়ী ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো, তারপর তার আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। এতদিন পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদূর বিদেশে সজ্বর শয়ান সহায়হীন অবস্থায় তাকে পেয়ে মনটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠলো। এমন কি তার নিজের মুখ থেকে তার রিভলিউশনারিত্বের কথা শুনেও। ওর এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিকে কিছুতেই অপ্রত্যাশিত ব'লে ভাবতে পারলুম না ; মনে হতে লাগলো এই তো স্বাভাবিক।

বললুম "সে কি?"

ন্যাপ্‌লা বল্লে "সে ভাই অনেক কথা। যাই হোক, আমাকে এখন তুই যে নামে খুশী ডাক, কিন্তু ন্যাপ্‌লা নয়। ভরদ্বাজ, অতুলচন্দ্র, অরিন্দম...যা তোর খুশী। আমি এখন ফেরারী আসামী

কিনা। আসল নাম কেউ শুনে ফেললে ধরা পড়বার ভয় আছে। আর ধরা পড়লেই…” বলে ন্যাপ্‌লা নিজের গলা দেখিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো।

বললুম “বলিস্‌ কি অতুল?” যদিও ন্যাপলা বল্লেও শুনবার অন্য কেউ কাছাকাছি ছিল না।

ন্যাপ্‌লা হেসে বললো “নির্জলা খাঁটী কথা। বিপ্লবী হতে হ’লে প্রাণ হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তবে বেরুতে হয়। প্রাণের মায়া থাকলে রিভলিউশনারি হওয়া চলে না। এই তো সেদিন আমাদের দলের পিনাকী বাঁড়ুজ্যে—অবশ্য এ হচ্ছে তার বিপ্লবী নাম, আসল নাম তার অন্য—কিন্তু যাকগে। ও ‘কাউয়ার্ড’টার কথা মনে করলেও লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তোকে যে দেখবো এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, তা তো ভাবতেই পারি নি। ওদিকে তোকে নিয়ে তো হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।”

বললুম “বলিস্‌ কি অরিন্দম?”

“দুহাজার টাকা পুরস্কার।”

“তার মানে?”

“ওগো ফিরে এসো। বিরিঞ্চি ফিরে আয় বাবা।”

“হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথা বল অপরেশ।”

“নেহাৎই আমি ফেরারী রিভলিউশনারি। তা নইলে এবার দু হাজার টাকার বাজী মারতুম। কিন্তু তোর মত গোবেচারা নিরীহ ভালো মানুষ যে এত কাণ্ড করবে—এ আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি বিরিঞ্চি।” ব’লে ন্যাপ্‌লা আমার তক্তপোষের তলা থেকে টেনে বার করলো এক ছোট্ট সুটকেস। তারপর সুটকেস খুলে এক তাড়া খবরের কাগজের ছোট বড় নানা রকমের কাটিং—ইংরিজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু। কতকগুলো বিজ্ঞাপন দুঃখিনী মোক্ষদাসুন্দরীর নামে, তার সার কথা “ওগো ফিরে এসো।” উচ্ছ্বাস ছিল অবশ্য নানারকম। কতকগুলো বিজ্ঞাপনের সারমর্ম্ম “বিরিঞ্চি, ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়”, আর তার নীচে “তোমার হতভাগ্য পিতা।” কতকগুলো বিজ্ঞাপনে আমার ফোটো ছাপা, তার তলায় লেখা আমার খোঁজ ক’রে দিতে পারলে নগদ দু হাজার টাকা পুরস্কার।

বললুম “আশ্চর্য্য! না ব’লে বেড়াতে চ’লে এসেছি এতেই এত? ওদের কি মাথা খারাপ হ’ল না কি?”

ন্যাপলা বললে “অন্তত: একখানা চিঠি দেওয়া তো উচিত ছিল। ওরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে যে ফতুর হয়ে যাবে। আমি যতদিন ছিলুম বাংলা মুলুকে, একটি দিনও বিজ্ঞাপন বাদ যেতে দেখি নি।”

ভেবে দেখলুম বাস্তবিকই তাই। এমন বেপরোয়া হয়ে “ওগো ফিরে এস” আর “বিরিঞ্চি ফিরে আয় বাবা” ছাপ্‌লে কুবেরের ভাণ্ডারও যে ফাঁকা হয়ে যায়। আর কি বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো! সারা বাংলা মুলুকে একটা টি টি প’ড়ে গেল, না? দু হাজার টাকা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! কত লোক যে ওরি লোভে আহার নিদ্রা ভুলে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বিরিঞ্চি পাকড়াশীকে, কে তার

হিসেব রাখে ? তবু ভাগ্যি এ কথা কারুর খেয়াল হয়নি, আমি বাংলার সীমা ছাড়িয়েও পাড়ি দিতে পারি। তা হ'লে ভারতবর্ষের কোন কাগজেই বিজ্ঞাপন বাদ যেত না।

এ কথা ভেবে কিন্তু মনটা সত্যি ভারী খুশী হয়ে উঠল, যেমন খুশী তার আগে কোন দিন হইনি,—যে বউ যতই রাগ করুক, অভিমান করুক, তার প্রাণের বালুর তলায় প্রেমের ফল্গু ব'য়ে চলেছে আমার জন্যে। বাস্তবিক মশাই, এ রকম একটা কাণ্ড না করলে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না আপনাকে কে কত ভালবাসে।

কিন্তু মন খুশী হয়ে উঠলেও মাথাটা বিষম ধরেছিল। নাড়ী দেখে হ্যাপলা বললে "জ্বর হয়েছে বোধ হয়। আর খুব সম্ভব ভোগাবে। নাড়ী এ রকম নাচা ভাল নয়, আমায় একবার পাক্কা দুটি মাস ভুগিয়েছিল। আমি নেহাৎ রিভলিউশনারি ব'লে আমায় কাবু করতে পারেনি।"···ভুগলুম। দুমাস নয়, সাত দিন। রিভলিউশনারি হ্যাপলা না থাকলে যে কি অবস্থা হতো সেটা ভাবতেও ভয় হয়।

সেরে উঠতেই হ্যাপলা বললে "এবার আর দেরী নয়। সটান বাড়ি চ'লে যা। নইলে যা বিশ্রী রকম বরফ পড়তে স্থুরু হয়েছে, শেষ কালে ঠাণ্ডায় মারা পড়বি।"

কোন কথা সে শুনতে চাইলে না। এক রকম জোর ক'রেই টিকেট কিনে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললে "বিয়ে যখন করেছিস তখন বেচারা বউকে কেন কাঁদিয়ে মারিস ? ফিরে যা। তুই তো আর আমার মত রিভলিউশনারি নস্ যে পেছন পানে না তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলবি, কার চোখে ঝরল দু ফোঁটা জল বা কার বুক গেল ফেটে চৌচির হয়ে সে দিকে এক মুহূর্তও না তাকিয়ে তোর জীবন তো পিছল বা বন্ধুর আঁধার পথে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলার নয়। ফাগুনে ফুলের বাগিচায় যে যৌবন উতলা দখিন হাওয়ায় ভেসে আসে, তোর হচ্ছে সেই যৌবন ; উষর মরুর ধূ ধূ বালুতে যে শুকনো বসন্ত আসে, সে তো তোর নয়। তোর যৌবন গড়ে তুলবার, আমাদের যৌবন ভেঙে চুরমার ক'রে দেবার। তোর যৌবনের জন্যে আছে সুখের সোনার খাঁচা ; কাঁটা গাছের অনেক উঁচু ডালে ব'সে পুচ্ছ নাচাতে তুই পারবি কেন ?"

আমার যা কিছু বলার ছিল, কিছুই বলতে পারলুম না। ওর কথার স্রোতের প্রাবল্য একটু কমতেই মনে হ'ল এবারে আমার তরফ থেকে আমিও কিছু বলি, তখন হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

বললুম "আবার কবে কোথায় তোর সঙ্গে দেখা হবে বীরেশ ?"

হ্যাপলা বললে "সে কথা ভগবানও বলতে পারেন না বিরিঞ্চি।" ব'লে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে বাতাসে দোলাতে লাগল।

হু হু ক'রে ছুটেছে ট্রেণ, পেছনে ফেলে শ্রীনগর, রিভলিউশনারি হ্যাপলা আর নাঙ্গা-পর্ব্বত। গরম স্যুট্ আর অমৃতসরের শাল হার মেনে যেতে লাগল, এমনি কন্‌কনে শীত। সাত দিনের কাশ্মীরি জ্বরের জের এখনও রয়েছে ; কিছুদিন আরও থাকবে বলেও মনে হচ্ছে।

[illegible] পেতে লাগল হ্যাপলার কথা মনে প'ড়ে "কাঁটা গাছের অনেক উঁচু ডালে ব'সে পুচ্ছ [illegible] পারবি কেন ?" কোথায় নাঙ্গা-পর্ব্বত আর কোথায় কাঁটা গাছ। রিভলিউশনারি

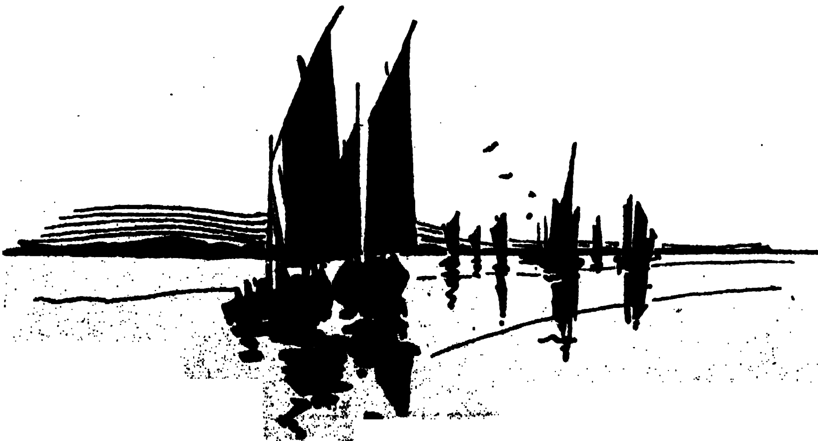
আপনা দুরূহ-নাঙ্গা-পর্ব্বত-অভিযাত্রী বিরিঞ্চি পাকড়াশীকে বলছে "তোর যৌবনের জন্যে আছে সুখের সোনার খাঁচা।" আপন মনে হাসতে হাসতে শালটা আরও ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিলুম, কাচের জানালা ভেদ ক'রেও যেন বাইরের ঠাণ্ডা হু হু ক'রে চল্‌তি কামরার ভেতরে আসছে ব'লে মনে হচ্ছিল।...

যাক্ গে'। কাহিনী লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এবারে সংক্ষেপ না ক'রে উপায় নেই। যে পথে বাড়ি থেকে এসেছিলুম, সে পথেই আবার বাড়ি ফিরে গেলুম যন্ত্রচালিতের মত। খুব হুঁশিয়ার হয়ে অবশ্য, দুহাজার-টাকা-পুরস্কার-লোভী ওঁৎ-পাতিয়েরা কেউ চিনতে পেরে পাকড়াও না করে।

বাড়ি ফিরে মশাই কি যে পরিবর্ত্তন কি আর বলব? বউ একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। বদ্‌রাগ যে এমন গভীর অনুরাগে পরিণত হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। পাছে আবার বিবাগী হয়ে চ'লে যাই সেই ভয়েই বোধ হয় বউ আর বাপের বাড়ি যাবার নামটিও করত না। আর সীতা, সতী, সাবিত্রী যে এদেশেই জন্মেছেন তা প্রমাণ করবার জন্যে যেন উঠে পড়ে লাগল। বুঝলুম অভিযান ব্যর্থ হয়নি একেবারে।

তারপর নাঙ্গা-পর্ব্বতের ডাক অনেকবার শুনেছি। খুবই স্বাভাবিক। এক রকম হাতের কাছে পেয়েও ফেলে চ'লে এসেছিলুম কি না? অনেকবার পা দুটো যেন সুর সুর ক'রে উঠতো। কিন্তু মোক্ষদার ম্লান অশ্রুছলছল চোখ দুটি, আর "ওগো, বল আমায় ছেড়ে আর কখনও তুমি যাবে না।" মনে পড়েই আবার সব গুলিয়ে যেত। ফলে আর যাওয়া উঠল না।

আমি আজ বৃদ্ধ। সে যৌবন আমার আর নেই। আর আসবেও না। তবু দুঃখ করি না। যখন তুমি আসবে এস, নোটিশ দিয়ে বা না দিয়ে, ওগো মরণ, ওগো বন্ধু! এই গর্ব্ব নিয়েই হাসিমুখে তোমায় আমি বরণ করব, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযাত্রী আমি বাঙালী!



কবিকঙ্কণ

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

নিরালা গ্রামের প্রান্তে, হে দরিদ্র কবি,
সহি' কত অত্যাচার কত না বেদনা
পেয়েছিলে মনোমাঝে কবির চেতনা
দেখেছিলে দারিদ্র্যের মূর্ত্তিমান ছবি—
ফুল্লরার খেদগীতি, অম্বিকার মায়া,
সরল সহজ প্রীতি, সরল বিশ্বাস,
হিংস্নুকের নিন্দুকের গরলনিঃশ্বাস,
খুল্লনার ফুল্লমুখে বিষাদের ছায়া।

দুঃখদাহে কাব্য তব নিকষিত হেম,
ঝটিকার ঊর্দ্ধে যেন তারকার ভাতি,
সাগর-গর্জ্জনমাঝে কমলে কামিনী,
মুমূর্ষু শিয়রে যেন অপলক প্রেম—
নিদ্রাহীন বসি' আছে জাগি' সারারাতি,
ঊষালোকে ম্লান যেন ধূসরা যামিনী।



সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র

সমাজ ও সাহিত্য কথা দুটি নিয়ে তর্ক আর কাটাছেঁড়ার অন্ত নেই। গবেষণার পর উদ্ধৃতি-কণ্টকিত গবেষণায়, তত্ত্বের পর গভীরতম দার্শনিক তত্ত্বের প্রহারে কথা দুটি জর্জ্জরিত। সে-সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যের পুনরাবৃত্তির জন্য এ-প্রবন্ধের অবতারণা নয়। সে-পাণ্ডিত্য এবং সে-অবসর সকলের নেই। এখানে শুধু সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক সাহিত্যবিবেচক মহলে যে মত চল্‌তি হয়েছে, তারই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো।

মাসিক কাগজের পৃষ্ঠায় আজকাল একদল সমালোচক প্রায়ই একথা বলে থাকেন যে, সাহিত্য-সম্পর্কে সনাতন যে কয়টি রীতি ও ধর্ম্ম সাহিত্যিকেরা এ যাবৎ মেনে এসেছেন, তা এক কালে সত্য ও কার্য্যকরী হ'লেও, বর্ত্তমানে অচল। তার কারণ, আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব্বেও, অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগের শেষভাগেও বাংলার সমাজ যে অবস্থায় ছিল, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিবর্ত্তনের ফলে আজ আর তা নেই। ভিক্টোরীয় যুগের সাবকাশ, পরিপুষ্ট সমাজের সঙ্গে, সমরোত্তর কালের হৃতস্বপ্ন, অশান্ত সমাজের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। সে যুগের জীবন ছিল পৃথক, সে যুগের মানুষ ছিল আলাদা। তাদের পক্ষে যা ছিল সত্য, যে আশা-আকাঙ্খা ছিল তাদের, ধর্ম্ম ও সমাজ বিধির প্রতি যে মনোভাব ছিল তাদের, ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে তাদের মূল্য অবিসম্বাদিত হ'লেও, আমাদের জীবন ও আমাদের বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে তা অপ্রযোজ্য অতীত-কাহিনী। এই দীর্ঘ ঘটনাবহুল শতকার্দ্ধে সেতুর নীচে দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, প্রগতির দ্রুতচক্রের আবর্ত্তনে আমরা ও আমাদের সমাজ সেই পুরোনো যুগের ছায়াশীতল পরিবেশ ছেড়ে বহু দূরে সরে এসেছি। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কারণে আমাদের জীবন জটিলতর ও কঠিনতর হয়ে উঠেছে; সমাজ, যার আশ্রয়ে এতকাল আমাদের জীবনের বাহ্যিক সমতা বজায় ছিল, তার সমস্ত গলদ আমাদের কাছে আজ প্রত্যক্ষ। আজ আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশৃঙ্খল সমাজের হাতে বিপন্ন, আমাদের ভবিষ্যৎ—অন্তঃক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্বাস্থ্যহীনতায় অন্ধকার। সুতরাং আমাদের জীবন ও সমাজের এই আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক রীতি ও আদর্শেরও পরিবর্ত্তন শুধু সঙ্গত নয়, অনিবার্য্য। কাজেই সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের, বিশেষ ক'রে কবির, যে ঐতিহ্যপুষ্ট নির্লিপ্ততা, যে আদর্শের দ্বারা এতকাল প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, সে-আদর্শেরও আজ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেন না, আদি কবি বাল্মীকির যুগ থেকে এমন কি প্রাগ্‌রবীন্দ্র-যুগের কবিকুল পর্য্যন্ত সমাজচক্র থেকে অল্পবিস্তর নিজেদের দূরে রাখতে সমর্থ হ'লেও বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব,—সমাজ-যন্ত্রের বৈকল্যের দরুন তার প্রতি অচেতনতা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের দিনের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হবে বলিষ্ঠ বাস্তবতা, মোহ-হীন সমাজ-সচেতনতা। শুধু আদর্শ ও দৃষ্টি-ভঙ্গিই নয়, আজ বিষয়বস্তুও বাস্তব হতে বাধ্য। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে-লেখায় সমাজের ছায়া না পড়বে, সে লেখা কিছুতেই ভালো হবে

না,—ভালো হবে না, যদি মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে রচনা না লেখা হয়, কিম্বা যদি বর্ত্তমানের ভাঙনধরা সমাজ ও তার আওতায় উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের সমস্যা থেকে তার বিষয়বস্তু হয় পৃথক্।

স্বীকার করবো, এ কথায় সত্য আছে অনেকখানি। কিন্তু তাই ব'লে সাহিত্য-সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। আজ নানা দিক দিয়ে সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর এবং বর্ত্তমান-কালের বাস্তবপন্থী সাহিত্য যে তারই একটা প্রধান ফল, একথা অনস্বীকার্য্য। এটা সত্য যে আধুনিক যুগের অনেক মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই সমাজ তার নোঙ্‌রামী আর ক্লীবতা, তার ব্যভিচার আর অন্তঃশূন্যতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। গোর্কী আর হামস্থন দুটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাই ব'লে এমন কথা কি ক'রে বলি যে, যে রচনা প্রধানত সমাজকে নিয়ে লেখা নয়; শুধু সেই কারণেই, তা প্রথম শ্রেণীর হবে না বা অমরত্বের দাবী তার গ্রাহ্য হবে না। সমাজকে নিয়ে ভালো, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য লেখা হয়েছে, কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না সমাজ-ছাড়া সাহিত্য-সৃষ্টি হতে পারে না বা হয় না। অনেক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে সমাজের ও রাষ্ট্রের ছবি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে কখনই প্রমাণ হয় না যে, আধুনিক সাহিত্য একটি আর্‌শি-বিশেষ—সমাজের মূর্ত্তি বিম্বিত করাতেই যার পরম চরিতার্থতা।

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ যে অঙ্গাঙ্গী—বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান যুগে—এ কথা সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। সাহিত্য যে ধীরে-ধীরে সমাজকে গড়ে তুলতে পারে, ইতিহাস তার সাক্ষী। আর চাঁদ যেমন ক'রে নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি সমাজও যে কখনও কখনও নিয়ন্ত্রিত করেছে সাহিত্যের স্রোতকে, এ কথা এতই সত্য যে তা' প্রায় ধরা বুলিরই সামিল। সাহিত্যিক যখন আর দশজনেরই মত সামাজিক জীব, সমাজের বিবর্ত্তন বা বৈকল্যের প্রতি তিনি কোন ক্রমেই নির্ব্বিকার থাকতে পারেন না। বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান কালে, যখন তমসার তীরে হোমাগ্নি-পরিশুদ্ধ নির্জ্জন তপোবনে বা শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে "কানন ঘেরা বিজন বাড়িতে", ধ্যান আর চিন্তা, গান আর কবিতা নিয়ে নিরুপদ্রব জীবন আমরা চাইলেও পাচ্ছি না। আজকের দিনে সমাজ অনস্বীকার্য্য এবং সমাজের অধীনে থাকতে গিয়ে সমাজ-সম্পর্কিত নানাজাতীয় অনুভূতি যে লেখকের হবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর যেহেতু অনুভূতিই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস, কখনও কখনও সমাজই যে হবে তার বর্ণনীয় বা মন্তব্যের বিষয়, সেটাও অস্বাভাবিক নয়। যে লেখক সমাজের কোন কোন ব্যাপার গভীরভাবে অনুভব করেছেন এবং তেমনি গভীরভাবেই পাঠককেও অনুভব করাতে পেরেছেন, তাঁর রচনা যে সার্থক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই সমাজ-সচেতনতা এবং সমাজ-চিত্রই যে আধুনিক লেখকের পক্ষে একমাত্র সার্থকতা, এমন জবরদস্তি আর যেখানেই চলুক, সাহিত্যে চলে না।

লেখক সমাজের অন্তর্গত, সুতরাং সমাজ-সচেতন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তিনি সব সময়েই যে সমভাবে সচেতন থাকবেন বা তাঁর সব লেখাতেই যে সমাজ-অনুভূতির প্রকাশ হবে এমন আইন লেখকের ওপর খাটে না। বরং এটাই সত্য যে, যে মন নিয়ে আমরা কংগ্রেসের রাইট-উইং লেফ্‌ট-উইং নিয়ে তর্ক ক'রে পেয়ালায় চা জুড়িয়ে যেতে দিই—চাকরির বাজার নিয়ে হা-হুতাশ করি, মন্ত্রী-সভার বিরুদ্ধে চেঁচামেচি করি;—যে মন নিয়ে আমরা খাই, ঘুমোই, পান চিবিয়ে আড্ডা দিই, বাজার করতে গিয়ে দরদস্তুর করি, সে মন নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি চলে না, কবিতা লেখা চলে না। অথচ

ঐ সব টুক্‌রো কাজের ভেতর দিয়েই আমরা সামাজিক এবং আমাদের সামাজিক অনুভূতি। আসলে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, যে মন সমাজের বিশৃঙ্খলার দ্বারা বিড়ম্বিত ও সমাজের অসমব্যবস্থার দ্বারা নির্য্যাতিত আর যে মন সৃষ্টি করে,—যে মনের অতল অন্ধকারের কুহেলি-স্রোত থেকে তরঙ্গ-উত্থিতা আফ্রোদিতের মত ফুটে ওঠে রূপের স্বর্ণকমল,—তারা মূলত এক হয়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিল্পী-মনের আবছা কুয়াসা সরিয়ে একটু একটু ক'রে যখন জ্যোতিষ্পিণ্ড নীহারিকার মত তাঁর প্রদীপ্ত সৃষ্টি ফুটে উঠতে থাকে,—ভাবী সৃষ্টির প্রজ্জ্বলন্ত শিখায় তাঁর মন যখন দ্যুতিময়,—তখন পৃথিবী, সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি তাঁর প্রতিদিনের সত্তা পর্য্যন্ত প'ড়ে থাকে তাঁর চেতনার বাইরে; তিনি এক হয়ে যান তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর কল্পনার স্বপ্নালোকে। সেই মুহূর্ত্তে তিনি উন্নীত, রূপান্তরিত, স্বতন্ত্র। যে শেলী "I arise from dreams of thee !"-র মত কবিতা লিখ্‌ছেন, সেই মুহূর্ত্তে নিশ্চয়ই তিনি গডুইন-শিষ্য চার্চ্চ-বিদ্রোহী নাস্তিক শেলী নন। যে লরেন্স রাইনের তীরে 'কৃষ্ণ অরণ্যের' মৌন ছায়ায় ব'সে দীর্ঘ, নিরবয়ব, বোবা গাছের সারি দেখে, তাদের কথা ভাবতে ভাবতে বৃক্ষজীবনের গোপন রহস্যময় মর্ম্মমূলে গিয়ে বৃক্ষজাতির মূক লোলুপতায়, উদ্দাম আরণ্য উল্লাসে মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছিলেন, কিম্বা পথে যেতে ছোট্ট লাল সাইক্লামেন ফুল দেখে চ'লে গিয়েছিলেন সৃষ্টির শৈশবকালে—যেখানে রক্তসন্ধ্যার পরিম্লান ছায়ায় গুহাবাসিনী আদিম নারী আনন্দে, বিস্ময়ে, ভয়ে সঙ্কোচে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এই ফুলকে তুলে নিয়ে খোঁপায় পরেছিল—তখন, অন্তত তখন তিনি মুক্ত, নিজের কাছ থেকে, সমাজের হাত থেকে, এমন কি স্থান ও কালের অমোঘ শাসন থেকে। হয়তো তার আধঘণ্টা পরেই তাঁকে চাকর পাঠাতে হয়েছিল ব্যাঙ্কে 'চেক্‌' ভাঙ্গাতে, সমর্পণ করতে হয়েছিল নিজেকে সমাজের হাতে—কিন্তু তখন নয়, সেই মুহূর্ত্তে নয়, কিছুতেই। সৃষ্টির সেই অবর্ণনীয় দৈবী মুহূর্ত্তে শিল্পী মনের ওপর কোন কিছুরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য চলে না—তখন সমাজের যেটুকু দাবী, রূপকথার কল্পলোকেরও ঠিক ততখানি, তখন মানুষের যতখানি অধিকার, অ-মানুষের (যেমন ঈশ্বর, কি ফুল) অধিকার তার চেয়ে কিছু কম নয়। সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁর বাণীর জ্যোতির্ম্ময় খড়্গ ঝল্‌সে ওঠে সমাজের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, আমাদের আপত্তির কারণ নেই, কেননা আমরা বুঝবো সে বিদ্রোহের পেছনে আছে তীব্রতম অনুভূতি। কিন্তু তিনি যদি এমন কোন রূপরাজ্যের বর্ণনা করতে বসেন, যেখানে :

Midnight's all a-glimmer, and noon a purple glow
And evening full of the linnet's wings.

তা হ'লেও আমরা এ-কথা বলবো না, এ রচনা সাহিত্য নয়। কেননা আমরা জানি এই যন্ত্রযুগের ভীড় আর কোলাহলময় রাজপথে দাঁড়িয়েও সত্যিই ঐ হ্রদসনাথ প্রবালদ্বীপের স্বপ্ন দেখা শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব নয়। নিছক এস্‌কেপিজ্‌ম্‌ নয়,—এ হচ্ছে প্রতিদিনের পুরোনো পারিপার্শ্বিককে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে অভ্যাসের পর্দ্দা সরিয়ে পরিচিত পৃথিবীকে নতুন ক'রে 'দেখা'। এই নতুন ক'রে দেখার ক্ষমতা আছে ব'লেই অনেক অসাধারণ ও বিচিত্র অনুভূতি কবি ও লেখকের বরাতে ঘটে। এবং সাহিত্যের মৌল উৎস এই অনুভূতি কেন এক বিশেষ জাতীয় হবে না, অর্থাৎ সমাজ-সম্পর্কিত হবে না, এ-জাতীয় অভিযোগ শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর।

শিল্পীর সামাজিক সত্তা আর তাঁর সৃষ্টিশীল মন কখনও এক নয়। সুতরাং এদের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কি ক'রে স্থাপন করি? তবে এইটুকু আমরা বলতে পারি যে কখন কখনও একটা অন্যটার চেয়ে প্রবল হয়ে উঠতে পারে। এবং তা পারে ব'লেই কেউ সমাজের পরিণাম ভবে চিন্তাকুল, কেউ বা জল্পনা করছেন জোরোয়াস্টর, গ্যালিলিও এমন কি কীট্‌স্‌ পর্য্যন্ত যা দেখেন নি, চাঁদের সেই চির অদৃশ্য উল্টো পিঠ নিয়ে। কিন্তু তাই ব'লে এক জাতীয় লেখক অপর জাতীয় লেখকের চেয়ে কম কি বেশী উন্নত নয়। বিষয়বস্তু কখনই সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাপকাঠি হতে পারে না।

আমার বিশ্বাস এই কথাটি বুঝলেই সাহিত্য সম্পর্কে অনেক জটিলতার নিরসন হয়ে যায়। বিষয়বস্তু রচনার একটা প্রধান অঙ্গ, সে-কথা ঠিক—কিন্তু কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর গৌরবেই রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। তা যে ওঠে না তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কাঁচা অনুকারীরা,—রবীন্দ্রনাথের ভাব আত্মসাৎ ক'রেও তাঁরা বড় বেশী সুবিধে ক'রে উঠতে পারেন না। সাহিত্য তাঁদের লেখাকে কেউ কোন কালে বলবে না,—যদিও তাঁদের উপাদান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে যা মহত্তম, সেখান থেকেই আহৃত। উপাদান এক হিসেবে উপলক্ষ্য ছাড়া কিছু নয়। কল্পনা ও অনুভূতির রসে রূপান্তরিত হয়ে, লেখনীর মায়াবী জাদুর স্পর্শে যে-কোন বিষয়বস্তুই আর্টের দুরধিগম্য শিখরদেশে উত্তীর্ণ হতে পারে,—এবং সে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানুষের সমাজের, মানুষের সংসারের কোন যোগ যদি নাও থাকে, তবুও;—যদি তা হয় দূর আকাশের সবুজ তারা, হ্রদের বুকে মূর্চ্ছিত গোধূলি আলো, যদি হয় নির্জ্জন বনের রজনীগন্ধার নিশীথ গন্ধ। উদাহরণ ইয়েট্‌স্‌। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ।

তা ছাড়া, ট্রামে, বাসে যেতে যেতে, আপিসে কলম চালনার বা দিনানুদৈনিক জীবনের বিরল অবকাশে যা কিছু আমরা দেখতে বা অনুভব করতে না পারি, তাই যে মিথ্যা, অবাস্তব এ-কুসংস্কার আমাদের কেন? সাহিত্যের সত্য তো আর সংবাদপত্রের বা Statistics-এর সত্য হতে পারে না। যে জিনিস 'আছে', যে জিনিস আমরা দেখছি, যা ঘটছে সর্ব্বদা আমাদের আশে-পাশে, তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল হ'লেই সাহিত্য সত্য বা বাস্তব হবে, এ-দুর্ব্বুদ্ধিতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা যেন আমাদের কোনদিন না হয়। সাহিত্যের সত্য একমাত্র অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নয়, অনুভূতি-নির্ভরও,—যাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি এ-মিথ্যা হতে পারে না। রাস্কল্‌নিকফের মতো হত্যাকারী, আর্পাডের মতো অধ্যাপক, মিকবারের মতো উড়নচণ্ডী, সাইলাস মার্নারের মতো কৃপণ যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা ব্যস্ত হই না জাগতিক দৃষ্টান্তের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নিতে। প্রাত্যহিক সংসারে হয়তো হত্যাকারী প্রায়ই রাস্কল্‌নিকফের মতো দার্শনিক হয় না, অধ্যাপক যাদের আমরা দেখি সত্যিই হয়তো তারা আর্পাডের সমগোত্রেয়, আমাদের পরিচিত অমিতব্যয়ীরা হয়তো মহাপ্রাণ নয় মিকবারের মতো। কিন্তু এদের প্রতি-রূপ দৈনন্দিন জীবনে থাক বা না থাক, কিছু এসে যায় না। থাকে ভালোই, না থাকে, তাতেও ক্ষতি নেই। পার্থিব অর্থে অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ ব'লেই তারা অবাস্তব নয়। তারা যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ, এদের সহজেই আমাদের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি—

সহজেই আপনার ক'রে নিতে পারি, মিলিয়ে নিতে পারি মনোজগতের পটভূমি সঙ্গে—যেখানে ঈশ্বর সত্য, পরীরা সত্য, যেখানে সত্য ইয়েটসের Lake Isle of Innisfree, সত্য রবীন্দ্রনাথের 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ'। যখন বলি সারা গ্যাম্প মিথ্যা নয়, ফল্‌স্টাফ সত্য, সত্য সাঙ্কো পাঞ্জার মত প্রভুভক্ত ভৃত্য, তখন ভিতর দিক থেকে কোন প্রতিবাদ আসে না। প্রতিবাদ আসে না নিখ্‌লুডফের মত Altruist, সোনিয়ার মত গণিকা, ম্যাদাম বোভারীর মত ভাবপ্রবণা নারী, অমিত রায়ের মত কবিপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। এদের কোনটিই সরকারী অর্থে 'ছাপ-মারা' বাস্তব চরিত্র নয়। প্রতিদিনের জীবন থেকে এরা 'নকল'-করা নয়, কল্পনার রসে এরা চিরকালের জন্য 'সৃষ্টি' করা। এরা যদি বাস্তব না হয়, তবে ও-কথার কোন অর্থ নেই। হয়তো বলা চলে, 'কই রেস্টর াঁতে এদের কারুর সঙ্গেই তো আমাদের দেখা হয় না জীবনে, ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেশলাই চাবার অছিলায় তো এদের কেউ-ই গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে আসে না, এ রকম চরিত্র তো আমরা কখনও দেখি নে।' এর জবাব সূর্য্যাস্তের চিত্র প্রসঙ্গে টার্ণার দিয়েছিলেন, 'কিন্তু দেখতে পেলে কি খুশি হতেন না?' ডি-এইচ-লরেন্সও এই মর্ম্মে বলেছিলেন—"If you are too personal, too humun, the flicker fades out, leaving you with something awfully lifelike, and as lifeless as most people we meet."

বাস্তব-সৃষ্টির বেলাতেও বিষয়বস্তু গৌণ। কলের মজুর কি গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালাদের নিয়ে লিখলেই যে, সে লেখা বাস্তব এবং প্রথম শ্রেণীর রচনা হবে, এবং কল্পনা থেকে যে জিনিস লেখা তাই 'এস্‌কেপিস্ট' এবং তৃতীয় শ্রেণীর হবে, এ অন্ধ ধারণা আর যার থাক্‌, সমালোচকের থাকা উচিত নয়। গোর্কী, হামসুন, শলোকভ্‌ মহৎ লেখক, তাঁদের লেখায় সমাজচিত্র ও প্রোলিটেরিয়াটদের নিয়ে প্রোপাগাণ্ডা আছে ব'লেই নয়; আমরা বরং বলব, থাকা সত্ত্বেও,—অর্থাৎ সাহিত্যের যা প্রাণ, অনুভূতির প্রগাঢ়তা আর প্রকাশের সততা তা আছে ব'লেই।

আসল কথা, সমাজ যদি লেখকের বর্ণনীয় বিষয় হয়, ভালই, যদি না হয় তা হ'লেও মাথায় হাত দিয়া ব'সে পড়বার কোন হেতু নেই। অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ একদা এই মর্ম্মে আক্ষেপ করেছিলেন যে,—'My business had been with Ariel, but I set to wrestle with Caliban' কিন্তু এ-আক্ষেপের মূলেও ছিল ভুল ধারণা। আর্টের ক্ষেত্রে এরিয়েলের যে দাবী, ক্যালিবানের দাবী তার চেয়ে কম কি বেশী নয়। আর্টিস্টের কারবার উভয়ের সঙ্গেই। কিন্তু তাই বলে এত বড় দাবী ক্যালিবান করতে পারে না যে, শিল্পীর একমাত্র কাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারই বিকৃত মূর্ত্তি আঁকা। শিল্পী-মনের ওপর সমাজেরও এই ধরণের নিরঙ্কুশ অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য। সমাজ-চেতনা অথবা বিচারবোধ অবশ্য প্রত্যেক উঁচুদরের সাহিত্যিকের মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু তাই ব'লে কেবলমাত্র কোন মত বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে লেখকের ব্যক্তিত্ব উৎসর্গ করতে হবে, এ কথার কোন অর্থ নেই। সহানুভূতি নিশ্চয়ই একটা অপরিহার্য্য উপকরণ, তা সে সামাজিক হোক, কিংবা মানবীয় হোক। কিন্তু এ-সহানুভূতি যদি লেখার বাহন মাত্র না হয়ে লেখকের ওপর প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করে, তা হ'লে নাওমি মিচিসন হওয়া যায়, সংযত কল্‌ডার-মার্শাল হওয়া যায় না।

সাগরিকাদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা!
নিদ্রা-গহন অতলে জ্বালাই
দীপাধারে নীল আলো-শিখা।
তারি আভা লেগে রঙে টলমল
শ্যামল-সুনীল সাগরের জল,
সে-ছায়ে উজল দূর-নভতল,
হিমানী-সজল নীহারিকা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা!

জ্যোৎস্না-অধীর বিজন নিশীথে রক্ত-গভীর পাখা মেলি'
দিকে দিকে তাই মোরা ভেসে যাই
সোনালি তনুর ছায়া ফেলি'।
মোদের অলক-গন্ধ-নেশায়
রাতের নাবিক পথ ভুলে যায়,
পাতাল-পুরীর কুমারেরা হায়,
জলে লিখে যায় প্রেম-লিখা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই,—সাগরিকা!

রতি-বিহ্বল দেহ হ'তে খুলি' রঙীন মেখলা লীলাভরে
আসি বারে বারে মোরা অভিসারে
শৈবালময় বালুচরে।
ছড়ায়ে পাখায় ঝিকিমিকি জল
আমরা শুকাই মেঘ-কুন্তল
দেখাই সবারে করি' কত ছল
তনুর তরুণ মরীচিকা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই,—সাগরিকা।

খেলা শেষে মোরা ফেলে রেখে যাই মাণিক মুকুতা যাহা কিছু,
এঁকে রেখে যাই বালুকা-বেলায়
চরণ-চিহ্ন পিছু পিছু।
মানুষের লাগি' আমরা যে নিতি
গেয়ে চ'লে যাই সাগরের গীতি,
স্বপ্ন-মধুর মোদের এ-প্রীতি
জানাতে নহি যে সাহসিকা!
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা।

নটী

শ্রীকল্পিতা দেবী

সহরের সন্ধ্যা। ধুলো ধোঁয়ায় নোংরা আকাশ, সূর্য্যাস্তের লালচে আভায় মরচে পড়া। 'বট্‌ল্‌পামে'র পাতার হাতছানি, ধূসর পর্দার পিছন থেকে ছমছমে ছায়ার ভূতুড়ে ইসারা। হঠাৎ আকাশ-ফাটা আওয়াজ উঠল—দৈত্যের হুঙ্কার যেন, জলস্থলের বুক উঠল ধড়াস করে। প্রকাণ্ড ছুই ডানা ছড়িয়ে নেমে আসে উভচর যন্ত্র-গরুড়, নিরীহ ডিঙিগুলো কে কোথায় সরে পড়ে। ঠেলা খেয়ে ফুলে ওঠে নদীর জল, শিউরে ওঠে সহর।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে জীর্ণ দোতলা-ঘরের জানলা খোলা, জ্বলচে লণ্ঠন, আয়না হাতে রিণি এঁকে চলেছে নিজের মুখ, আজ তার রিহার্সলের দিন। দেখতে দেখতে চেহারা তৈরী হ'য়ে উঠচে, বিধাতার হাতের কাজে চালাচ্চে কারিকুরি, মনের কামনা কল্পনার পোঁচ লাগিয়ে চলেছে। চোখের পাতার তলায় কালো কাজলের টান। আনত চোখের বাঁকা চাউনির কোণে থমকে রইল আবেগের চাতুরী। ঠোঁটের ভাঙনের ধারে অস্পষ্ট রঙের বিন্যাসে মুচ্‌কে হাসির জাছু।

ঘরের চেহারা অত্যন্ত এলোমেলো, অযত্নের হেলাফেলা চারিদিকে। পাশের ঘরে অসুস্থ স্বামী শুয়ে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে, দারিদ্র্যকে উপহাস করে হারিকেন-লণ্ঠনের আলো আভা দিয়েছে তার মুখের উপরে।

হর্ণ বাজিয়ে মোটর এসে খিড়কিতে থামে। সওয়ার বেরিয়ে আসে হাল-ফেশানের সৌখীন বাবু, রিষ্টওয়াচ হাতে। নতুন খোলা থিয়েটারের ম্যানেজার। খোলা জানলায় পড়ল তার নজর, তীক্ষ্ণ শিষের সিগ্‌ন্যাল পৌঁছল ঊর্দ্ধে। সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল, দাঁড়াল তরুণীর পিছনে, বড়ো আয়নার উপরে ফুটে ওঠে ছুজনের ছবি, আর গলির ছাদে ঘেরা আকাশের তারাখচিত খণ্ড নীলাম্বরীর এক আঁজলা।

রিণি হেসে বেঁকে পড়ে, সিগারেট ধরায়। তেল শুকিয়ে দীপ ঝিমিয়ে পড়েছে, কেবল শিখার ছুটি ফোঁটা অন্ধকারে আয়নার উপর রোম্যান্সের ইঙ্গিত করে। দেয়ালের পিছন থেকে অসম্ভব কাশীর ফিট ছুজনকে চমকিয়ে তোলে। মেয়েটি দৌড়ে চলে যায় পাশের ঘরে, একখানা দশ টাকার নোট রুগীর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "ঝিকে দিয়ে ছুধ আনিয়ে নিও। আমাকে এখনি যেতে হবে রিহার্সলে।" পরক্ষণে দমকা হাসির আওয়াজে সিঁড়ির শূন্যকে আলোড়িত করে দিয়ে দ্রুত নেমে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়াল ভেদ করে পিছনে ডাক দেয় রোগের কাৎরানি। অন্ধকারের ব্যর্থ অনুনয় ভাঙা চৌকাঠের উপর মাথা ঠুকে পড়ে। রোগীর হিম হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে আসে, অজানিতে নোটখানা মাটীতে পড়ে গড়ায়, মেয়ে কেঁদে উঠে ডাকে "বাবা," জবাব পায় না।

হলিউডের নকলে থিয়েটরের আসর জমেছে। জুটেছে কুমারী, কিশোরী, তরুণী; নানা-রকম চেহারা, রঙীন আলোর ভোজবাজী; চাদরের আবরণের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখের পালিস ঝকঝক করে আলোর ঢেউয়ে। বিবিধ মনের নাট্যলীলায় হরেক রকম বহুরূপীর চেহারা নতুন নতুন

ছাঁদে তৈরী। মুখগুলো তরুণ কোমল বিহ্বল ব্যঞ্জনায় বানানো মুখোষ। ঘরের হাওয়া গাঁজিয়ে উঠেছে রঙ্গভঙ্গের কচ্‌লানিতে। মুক্তির ভরসায় যে বেরিয়ে পড়েছিল, বেড়া ভাঙল, গহ্বরের মধ্যে সে পড়ল আটকা।

অসংলগ্ন ঢিলে মন রিণির, আত্মবিজ্ঞাপনী-নেশায় মত্ত, কালের কলের পুতুলের ছাঁচ সে, হাল-ফেশানের আঙুলের চাপের ছাপে তৈরী ; কোন্ যন্ত্রে চালাচ্ছে তাকে !

রাত অনেক হয়েছে। দূরে দূরে মিটমিট করছে রাস্তার বাতি। প্রাণের শেষ উত্তেজনার মতো কোনো আধেক বন্ধ জানলার প্রদীপ দপ দপ করতে করতে নিবে এল। থার্ড ক্লাস গাড়ীর খড়্‌খড়ে আওয়াজে আকাশের বিরক্তি ধরে, নগরের বুক-আঁচড়ানো তার চলা।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের নিশাচরগুলো তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে গলিতে। রাত জাগা চোখ তাদের লাল, চোখের কোটরে দাগ কেটেছে জীবনের লুকানো ইতিহাস, গালে টোল খেয়েছে, বিষবাষ্পের ভুসোকালি মলিন করে দিয়েছে তাদের মুখ। বাড়ির কাছে গাড়ী এসে থামে। লক্ষপতি স্টেজ-ম্যানেজার গেছে তার প্রাসাদে ফিরে। বল হরি হরিবোল—রব আসে গলির মোড় থেকে। জানিনে কোন ঘাটের পাশে কার চিতার আগুন তখন নিবু নিবু। পোষা কুকুরটি ছটফট করে বেরিয়ে আসে, আঁচল ধরে টানে, মরণের গন্ধ পেয়েছে সে ঘরের আকাশে। মাথার উপরে রাতের পাখী ডাক দিয়ে চলে যায়, নির্মম বিধাতার টিটকারির মতো।

উড়ো জাহাজ চলেছে শুকতারার শান্ত চোখের সামনে দিয়ে, সমুদ্রের পার থেকে সমুদ্রের পারে। ভোরের ফ্যাকাসে চাদরের তলায় ঢাকা পড়ল নাট্যভূমির যবনিকা, কালরথের নকীব মোরগ আস্তাবলের আবর্জ্জনার উপর থেকে জানিয়ে দিল জীবনযাত্রার নূতন পরিস্থিতি।



একদা বসন্তকালে

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

'কামারপুর সাহিত্য-বাসর' যদিচ এই সতর দিন মাত্র হইল জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু এই কয়দিনের ভিতরই ইহার দপ-দপানীতে কামারপুরের অধিবাসীবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার আলো-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, পুকুর-ডোবা, মাঠ-ঘাট-পথ সচকিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

'সাহিত-বাসর' বসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সকাল হইতে সুরু করিয়া রাত এগারটা পর্য্যন্ত কেহ না কেহ 'বাসরে' হাজির থাকেই এবং একের অধিক সভ্য-সমাগম ঘটিলেই সাহিত্য সম্বন্ধে তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কেহ স্বরচিত কবিতার আবৃত্তিতে ঘর এবং পাড়া ফাটাইয়া দেয়; কেহ গিরিশ ঘোষ বা ডি. এল. রায়ের নাটকের কোন একটা অংশ-বিশেষের সাহিত্যিক অভিনয় করিয়া স্তব্ধ বাতাসকে চঞ্চল করিয়া তোলে; কেহ বা উচ্চকণ্ঠে কোন দৈনিক-পত্রের সম্পাদকীয় পড়িয়া যায় এবং তাহা লইয়া শ্রোতাদের মধ্যে স-কলরব এবং সচঞ্চল আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয়।

'সাহিত্য-বাসরে'র এই ভীষণ আসর বসে, খোদ সেক্রেটারী শিবকালীরই বৈঠকখানায়। শিবকালী আর হরকালী দুই ভাই। হরকালী বড়, শিবকালী ছোট। হরকালীর বয়স ছত্রিশ, শিবুর ছাব্বিশ। হরকালী বিবাহিত, শিবু অবিবাহিত। মাস-খানেক হইল, হঠাৎ কলিকাতায় একটা চাকুরী পাইয়া হরকালীর বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার পরই সুযোগ পাইয়া শিবু অত্যন্ত উৎসাহ এবং জাঁক-জমকের সহিত তাহাদের বৈঠকখানা-ঘরে এই 'সাহিত্য-বাসর' বসাইয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর খুব মৃদু এবং মোলায়েম ভাবে আলোচনা সুরু হইল, বঙ্কিম বড়, না শরৎচন্দ্র বড়? ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী এই মৃদু মধুর আলোচনা কিছু পরেই পেঁছাইল তর্কে। আরও কিছু পরে এই তর্ক দাঁড়াইল হাতা-হাতিতে। সর্ব্বশেষে এই তর্ক-যুদ্ধ যখন প্রবল আকার ধারণ করিয়া ঘরের টেবিল, চেয়ার, তক্তাপোষ, আয়না, আলো, ছবি প্রভৃতি ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে খোলা দরজায় কাহার ছায়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হরকালী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া বজ্রকঠোর স্বরে কনিষ্ঠের উদ্দেশে কহিল—"এখনি সব বন্ধ কর।"

সুতরাং তখনি সব বন্ধ করিতে হইল। হরকালীর ছিল সিংহ রাশি। তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা একটা শিবকালীতে সম্ভব নয়, দশটাতে সম্ভব কি না, সন্দেহের কথা। অতএব, শুধু সেদিনের জন্য বন্ধ নয়, 'সাহিত্য-বাসর' সেই সতর দিনের আঁতুড়-ঘরেই তাহার কচি দেহ রক্ষা করিল।

করিলেও, শিবুকে দিয়া গেল একটা মর্ম্মান্তিক লজ্জা এবং অপমানের তীব্র আঘাত। আঘাতে পীড়িত হইয়া শিবু তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে মরিবে, অর্থাৎ আত্মহত্যা করিবে। এবং সাধারণ ভাবে আত্মহত্যা নয়, সে অনশন দ্বারা আত্মহত্যা করিবে। সুতরাং সেই রাত্র হইতেই শিবু অনশন সুরু করিয়া দিল।

কলিকাতার চাকুরী সুবিধাজনক না হওয়াতে একটা মাস কাজ করিয়া হরকালী সেইদিন সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পরদিন সকালবেলা গিরিবালা স্বামীর নিকট আসিয়া জানাইল, "ঠাকুরপো অনশন আরম্ভ করেছে।"

"কারণ ?"

"কারণ, কালকের ব্যাপার।"

"বেশ। করে যা'ক।"

কিন্তু 'করে যাওয়া'টা চলিল না। উনিশ ঘণ্টা পরে শিবুকে পান খাইয়া অনশন ভঙ্গ করিতে হইল।

শিবু সব পারে, কিন্তু পান না চিবাইয়া বেশিক্ষণ থাকা তাহার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রাণ যায় ক্ষতি নাই, কিন্তু পান তাহার চাই-ই। উনিশ ঘণ্টা বিনা পানে থাকিয়া শিবু অন্তরে-বাহিরে ছটফট করিতে লাগিল। অবশেষে বেলা তিন প্রহরের সময় আর থাকিতে না পারিয়া গোটাকতক পান খাইয়া অনশন ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য যে, পান যখন তাহাকে খাইতেই হইল, তখন পানাহারও আর তাহার বাকি রহিল না।

ইহার পর তিন চার মাস সাধারণ ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন শিবু নিজের মনে বলিল, 'সাহিত্য-বাসর উঠে গেল, কিন্তু সাহিত্য সাধনা ছাড়ি কেন ? সে তো আমার অন্তরের জিনিষ, সেটা তো আর দাদার বৈঠকখানা নয়। সুতরাং যতদিন বাঁচব, সাহিত্য সাধনা ছাড়ব না।' এই মনে করিয়া, সে কাগজ কলম লইয়া একটি গল্প লিখিতে সুরু করিল। বহুক্ষণ ধরিয়া গল্পের প্লটকে মনের মধ্যে সাজাইয়া গোছাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল, 'একদা বসন্তকালে—

"ঠাকুরপো।"

জমাট ভাব, সব নষ্ট হইয়া গেল। একটু বিরক্ত হইয়া শিবু মুখ তুলিয়া কহিল, "কি বলছ, বউদি ?"

"বলছি যে, তোমার পান খাওয়াটা একটু কমাতে পার ?"

গল্পের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া, দেয়াত-কলমটা সরাইয়া, বউদির মুখের দিকে চাহিয়া শিবু কহিল, "কেন বউদি ?"

"তোমার অত পান খাওয়ার জন্যে সংসারে বড্ড অযথা খরচ হচ্চে।"

একটুখানি ম্লান হাসির সহিত শিবু কহিল, "বড্ড না হলেও যৎসামান্য কিছু হয় বটে। কিন্তু কত লোকের কত রকম সখ থাকে, আমার তো আর কোন সখই নেই বউদি; সুতরাং দুটো পান যদি বেশিই খাই, তা'তে আর এমন কি—"

কথাটা সম্পূর্ণ না শুনিয়া গিরিবালা অপ্রসন্ন মনে মুখখানা ভার করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে হরকালী শিবুকে কহিল, "দেখ, পানে বড্ড বেশি খরচ হ'চ্চে। রোজ ষাট-সত্তর করে পান খাওয়া—

"হ্যাঁ, বউদিও বলছিল বটে।"

"সুতরাং পানটা একটু তোমায় কমাতে হবে; অর্থাৎ বড় জোর আট দশটা পর্য্যন্ত তুমি সারা দিন রাত খেতে পার।"

"তা হলে আমার অকাল-মৃত্যু ঘটবে, দাদা।"

"তা'র মানে?"

"তা'র মানে, না খেয়ে ছ'মাস বাঁচতে পারব, আফিং খেয়ে আত্মহত্যা ক'রে মরতে পারব, মাটিতে শুয়ে রাত কাটাতে পারব, জলে ডুবে থাকতে পারব, বর্ষায় ভিজতে, শীতে জমতে, গরমে পচতে, সবই পারব দাদা, কিন্তু পান খাওয়া কমাতে পারব না।"

"দেখ, অত কথা শুনতে চাই না; কাল থেকে দশ খিলি পানের বেশি তুমি পাবে না। পৈতৃক বিষয়ের তোমার যা অর্দ্ধেক ভাগ, তা থেকে তোমার পান, আর ভাত, দুটো হয় না; বড় জোর একটা হতে পারে, হয় ভাত, নয় পান।"

দাদা কথা কয়টি বলিয়া চলিয়া গেলে, শিবু খানিকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল; তারপর একটা সুদীর্ঘ শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে নিজের মনে বলিল, 'পান ছাড়ব না, ঘরই ছাড়ব।'

পরদিন শিবুকে আর গৃহে কিম্বা গ্রামে দেখা গেল না। হরকালী শুনিল শিবু কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে।

২

শিবু কলিকাতায় আসিয়াছে।

বেলেঘাটায় তাহাদের গ্রামের নন্দীদের বাঁশ খুঁটি প্রভৃতির একটা আড়ৎ ছিল। শিবু সেইখানে আসিয়া আশ্রয় লইল। দু'বেলা তাহাদেরই ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে, আর অবসর সময়ে এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কাজের সন্ধান করে। একদিন একটি ভদ্রলোক শালের খুঁটি কিনিতে আসিলে, শিবুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। ভদ্রলোকটি কহিলেন, "আমার ছোট ছোট চারটি নাতি-নাতনী আছে। দু'বেলা তাদের একটু-আধটু পড়াবার জন্যে একজন মাস্টার দরকার। দশ টাকা করে আমি দোব। পারবেন আপনি?"

শিবু লাফাইয়া উঠিল এবং তখনি তাঁহার সহিত কথা পাকা-পাকি করিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার বাড়ি চিনিয়া আসিল।

এত সত্বর যে শিবু এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা কাজ পাইয়া যাইবে, ইহা সে আশা করে নাই। নন্দীদের এখানে খাওয়ার খরচ তাহার না লাগিলেও, বেশীদিন তো আর এইভাবে ইহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকা যায় না। তারপর তার পানের খরচ। দৈনিক প্রায় দুইটি আনা তাহাতে লাগে। সে কলিকাতা আসিবার সময় গ্রামের একজনের নিকট হইতে দশটা টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ট্রেণভাড়া বাদে যাহা বাকী ছিল তাহাতে বর্ত্তমানে তাহার পানের খরচ চলিতেছে। কিন্তু কলসীতে মধ্যে মধ্যে সময়মত জল না ভরিয়া, কেবলই তাহা হইতে ঢালিয়া পান করিলে সে জল আর কতদিন থাকে? তাই তাহার হাতের পয়সা যতই কমিয়া আসিতেছিল,

তাহার ভাবনাও ততই জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এই দশ টাকার কাজটি পাওয়াতে তাহার সেই চিন্তা এখন প্রসন্নতায় রূপান্তরিত হইল। সে মনে মনে একটা হিসাবও প্রস্তুত করিয়া ফেলিল,—যথা, খোরাকির জন্য নন্দীদের পাঁচ টাকা, পানে টাকা চার এবং বাকী একটা টাকার এ-ও-তা খুচরা খরচ।

পরের দিন হইতেই শিবু, বিধুবাবুর নাতি-নাতিনীদের পড়াইতে সুরু করিয়া দিল। বিধুবাবু লোক খুবই সৎ। ভয়ানক ধর্ম্মভীরু। কাহাকেও তিনি মনে ব্যথা দিতে চান না। জীব-জন্তুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া। যতই দিন যাইতে লাগিল, শিবু বিধুবাবুর গুণাবলীতে ততই মুগ্ধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের পড়াশুনা হইয়া গেলে পর, বিধুবাবু শিবুর কাছে আসিয়া বসেন এবং উভয়ের মধ্যে নানাবিধ গল্প এবং ধর্ম্ম-কথার আলোচনা হয়।

এইভাবে এক একটি করিয়া দিন কাটে, আর শিবু মনে মনে তাহার প্রাপ্য বেতনের হিসাব করে—আজ ৭৲, আজ ৭।/৫, আজ ৭৷৵১০—, আজ—।

মাস কাবার হইলে শিবু একদিন ছেলেদের মধ্যে যেটি বড় তাহাকে বলিল, "আমার মাইনেটা চেয়ে আন দেখি।" সে তাহার উভয় হাতের মুঠা এবং মুখের সংযোগে অদ্ভুত ভাবে বংশীধ্বনি করিতে করিতে ভিতরে গেল এবং সেইরূপ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদামশাই বিছানায় শুয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন আর চোখ বুজে আছেন; মাইনে এখন পাওয়া যাবে না।"

শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "চোখ বুজে রয়েছেন?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম চোখ বুজে ধ্যান করেন।"

বহুক্ষণ হইতে একটি মশক শিবুর কর্ণমূলে দংশন করতঃ রক্তপান করিতেছিল। শিবু চটাস করিয়া একটি চড়ে তাহাকে মারিয়া ফেলিতেই, নন্দরাণী বলিয়া মেয়েটি চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "মাস্টারমশাই, কী করলে তুমি?"

"কি করলুম?"

"মশা মারলে!"—বলিয়াই সে বাটীর ভিতরে ছুটিল। অপর তিনজন মুখে কিছু না বলিলেও হাঁ করিয়া শিবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিনিট কয়েক পরেই বিধুবাবু শিবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পশ্চাতে নন্দরাণী। বিধুবাবু শিবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কাল থেকে আর আপনার পড়াতে আসবার দরকার নেই। দিন ১০।১২ পরে আপনার মাইনেটা এসে নিয়ে যাবেন।"

ব্যাপারটা শিবু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, "আজ্ঞে হঠাৎ এরকম—"

"হঠাৎ-টঠাৎ নয়; আমার বাড়িতে জীবহত্যা! আপনি চটাস্ করে একটা মশা মেরেছেন? যান—আপনি চলে যান এক্ষনি; আর আপনি আসবেন না। উঃ! মশক মার! জীবহত্যা!"

অতিমাত্রায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শিবু কহিল, "আজ্ঞে সামান্য একটা মশা মেরেছি তাতে—"

মনে মনে ভীষণ কুপিত হইয়া বিধুবাবু কহিলেন, "সামান্য হউক, অসামান্য হউক, জীব তো বটে। সেদিন কাদের একটা বেড়াল ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে একটা আরশোলা মেরেছিল। তাকে

মুগুরের বাড়ি এমন মার মারলুম যে বাছাধনকে তক্ষুনি অক্কা পেতে হ'ল। জীবহত্যা-টীবহত্যা আমার বাড়িতে চলবে না, যান আপনি—।"

"আজ্ঞে, আর কখনও এমন কাজ হবে না। দেখুন, বর্দ্ধমান জেলায় বাড়ি—একেবারে খাস মশার ডিপো; নিত্যি মশা মেরে মেরে কেমন একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে তাই—তবুও অনেকক্ষণ ধরে তার দংশন-জ্বালা সহ্য করেছিলুম; শেষকালে যখন আর থাকতে পারলুম না, তখন—"

"তখন চটাস্ করে অমনি জীবহত্যা করে বসলেন? যান—যান; ওসব এখানে চলবে না।—" বলিয়া বিধুবাবু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। শিবু হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

৩

নৌকা কূলে লাগিয়াও লাগিল না। অর্থাৎ শিবুর একটা উপায় হইয়াও ফসকাইয়া গেল। কিন্তু সে বিধুবাবুর নিকট হইতে তাহার মাহিনার পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত পাইয়াছে। জীবহত্যাকারীকে তিনি হিসাব করিয়া ১২।/৭॥ চুকাইয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, আবার শিবু কাজের জন্য ঘোরা-ঘুরি করিতে সুরু করিল।

নারীর চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—গভীর রহস্যাবৃত; এ উভয়ের কখন কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। শিবুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আর একটি নূতন কাজের যোগাড় হইয়া গেল। ছেলে পড়ানো নয়—ছেলের বাবাকে পড়ানো! অর্থাৎ, নোয়াখালীর এক জমিদার, চোখের অসুখের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এখন হইতে কলিকাতাতেই থাকিবেন। চোখের ডাক্তাররা তাঁহার লেখাপড়ার কাজ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই কারণেই তাঁহার কাছে ও কাজে শিবুর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শিবু তাঁহাকে প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে, জমিদারীসংক্রান্ত চিঠিপত্র পড়িয়া শুনাইবে, সে-সবের জবাব লিখিবে, আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে বই-টইও পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মোট কথা, লেখাপড়ার কাজে শিবুর চক্ষু এবং হস্তই হইবে জমিদারবাবুর উপচক্ষু এবং উপহস্ত।

সুতরাং শিবু মনে মনে খুবই খুসী হইল; ভাবিল, 'বার টাকা মাহিনা, খোরাক, আর থাকবার জন্যে নীচের তলায় সম্পূর্ণ পৃথক একখানা ঘর। এর চেয়ে সুবিধা আর কি হ'তে পারে। তবে, পানটার কথা একবার ব'লে দেখলে হয়। ঐ সঙ্গে ওটাও যদি বেয়ারিং-পোস্টে হ'য়ে যেত, তা হ'লে সোনায় সোহাগা হ'ত। কিন্তু, যাক। বেশী বাড়াবাড়িতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। অত পান খাওয়ার কথা শুনলে হয় তো শেষে—'

উপর হইতে বাবু ডাকিলেন, "শিববাবু!"

"আজ্ঞে, এই যে!"—শিবু দোতালায় ছুটিল।

বাবু কহিলেন, "সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রোজ খানিক করে বেড়িয়ে আসবেন; তাতে শরীরটা ভাল থাকবে। তবে, খুব সাবধান! কোন 'পার্কে' যেন বেড়াবেন না। আজকাল অনেক টি. বি. রোগী 'পার্কে' এসে বেড়ায়। বুঝেছেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টি. বি.-টা দিন দিন বড্ডই ছড়িয়ে পড়ছে! কি বলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আপনার বংশাবলীর মধ্যে কারো কখনো ও-রোগটা—"

"আজ্ঞে, আমাদের কোন পুরুষেও ওসব নেই।"

"ভাল—ভাল।"

অতঃপর দিন পনর কাটিয়া যাইবার পর, শিবু ভাবিল, 'আমার অসমাপ্ত গল্পটা এইবার ফের লিখতে আরম্ভ করলে হয়। দুপুরবেলাটায় ত কোনই কাজ আমার নেই। সুতরাং সেটা আবার—'

পরদিনই শিবু দোকান হইতে আধদিস্তা কাগজ কিনিয়া আনিল এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে তাহার সেই অসমাপ্ত গল্পটি লিখিতে বসিল। তাহার মনের মধ্যে গল্পটির সূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার পর সে সেই হারানো সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তখনি তাহা তাহার কাগজের পাতার মধ্যে গাঁথিয়া রাখিতে সুরু করিল—'একদা বসন্তকালে—'

"কি হয় শিববাবু?"

মুখ তুলিয়া শিবু দেখিল, সমুখে দাঁড়াইয়া তাহার নোয়াখালীর জমিদারবাবু।

তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মাস কতক আগে, এই গল্প লেখার সূত্রপাতেই, একদিন এমনি ভাবেই তাহার বউদিদি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহার ফলে তাহাকে দেশ ছাড়িতে হইয়াছে। আজও অবস্থা সেইরূপ। প্রভেদের মধ্যে—সেবার ভ্রাতৃবধূ, এবার প্রভু; সেবার নারী, এবার নর। তাহার ভাগ্যে বা আবার কি ঘটে! তবে আশার কথা এই যে, শক্তির আধার নারীর তুলনায় পুরুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; নারীর পদতলেই পুরুষের স্থান। সুতরাং দেশ ছাড়ার চেয়ে বড়, এক্ষেত্রে তাহার আর কিছু হইতে পারে না।

প্রভু ডাকিলেন, "কি হয় শিববাবু?"

"আজ্ঞে, এই একটু লিখছিলুম। অনেকদিন আগে একটা—"

"আচ্ছা, আমাদের ঠাকুরের চেহারাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন?"

"আজ্ঞে, খাবার সময় ত বিশেষ করেই লক্ষ্য করতে হয়।"

"ওটা দিন দিন ওরকম শুকিয়ে যাচ্ছে কেন বলুন দেখি? গায়ে যেন রক্ত নেই, চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, মুখখানা ফ্যাকাসে, যেন—। ব্যাটাকে টি. বি.-তে ধরল না ত?"

"আজ্ঞে, তা নয়, তবে—"

"তাই-ই ঠিক। বিকেলের দিকে প্রায়ই দেখছি শুয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, পেটের ব্যথা। আমার মনে হয়, পেট ব্যথা-ট্যথা ওসব কিছুই নয়। বোধ হয় একটু করে ওর জ্বরই হচ্ছে। না—না—ও ঠিকই টি. বি.।"

সেইদিনই রাত্রে খাইতে বসিয়া শিবু শুনিল, ঠাকুরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে এবং একজন নূতন ঠাকুরকে আনা হইয়াছে।

ইহারই দিনকয়েক পরে, একদিন সকালবেলা শ্রীযুক্ত বাবুর কথামত নোয়াখালীতে এবং অন্যান্য স্থলে দুই চারিখানি চিঠি লিখিবার পর যখন শিবু উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন শ্রীযুত তাহার হাতে একটি মোড়ক দিয়া কহিলেন, "বেশ করে বিছানার চারিপাশে ছড়িয়ে দেবেন, ছারপোকা মরবে।"

শিবু মোড়কটি হাতে লইয়া কহিল, "ছারপোকা ধ'রে ধ'রে না মারলে ওষুধ-বিষুধে কিছু হয় না।"

"কিছু হয়। তবে, আপনার দুপুরবেলা ত কোন কাজ নেই, ধরে ধরে মারতে পারলেই অবশ্য ভাল হয়; পারবেন না?"

ঘর-পোড়া গরু যেমন ভয়ে ভয়ে সিঁদুরে মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইভাবে শিবু জমিদারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞে, জীব-হত্যাটা আর কোরবো!"

"জীবহত্যা! সে কি! আপনার দেখছি শিবুবাবু, জীবের প্রতি অসীম দয়া! এদিকে জীব যে আপনাকে দিন দিন হত্যা করছে, তার কি? আরও গুরুতর একটা ব্যাপার আছে। মনে করুন, আমি টি. বি. রোগী। জীব মহাশয় আমার রক্তটি শুষে ফেললেন; তারপড় গুড়্-গুড়্ করে দেওয়াল বেয়ে আপনার ঘরে গিয়ে আপনাকেও আপ্যায়িত করলেন, তার থেকে কি হোতে পারে বুঝেছেন ত?"

"বুঝিছি; কিন্তু ছারপোকার কামড়ে ত ও সব কিছু হয় না। ডাক্তারেরা বলে যে শুধু কালাজ্বরই—"

"রেখে দিন ডাক্তারের কথা। ওদের থিওরী এ বেলা ও বেলা বদলাচ্ছে। আগেকার সব ভাল ভাল ডাক্তার বলতেন যে, চল্লিশের পর কারো টি. বি. হয় না। আর এখনকার দিগ্‌গজেরা বলেন যে, ওটা নাকি সব বয়সেই হোতে পারে।"

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াখালীর জমিদারবাবুর মুখের উপরে একটা বিমর্ষতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। শিবু আর কিছু না বলিয়া, এক পা এক পা করিয়া নীচে তাহার ঘরে চলিয়া আসিল।

৪

নোয়াখালীর জমিদারবাবুর বাড়ীর চাকুরী শিবুর গিয়াছে। অপরাধ—জীবহত্যা নয়, থুতু ফেলা। হঠাৎ একদিন তাহার থুতু দেখিয়া জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্তের ছিটা বেশ?"

শিবু কহিল, "রক্ত নয়, পান খেয়েছিলুম, তারই—"

জমিদারবাবু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং নূতন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিববাবুর ভাত তাহার ঘরে দিয়ে আসবে।"

ভাগ্যদোষে সেইদিনই বিকালের দিকে শিবুর সামান্য একটু জ্বর হইল। ফলে, পরদিন সকালেই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার নন্দীদের বাঁশ-খুঁটির গোলায় আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল।

এবার শিবু প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর বাঙালীর কাছে চাকুরী করিবে না। সুতরাং সে এবার মরিয়া হইয়া সাহেব পাড়ার আফিসগুলিতে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। তাহার মত সামান্য ইংরাজী-জানা লোকের পক্ষে সাহেবের আফিসে কাজ পাওয়া দায় হইলেও, শিবুর চাকুরী-ভাগ্য ছিল ভাল এবং সেই সৌভাগ্যের জোরে শীঘ্রই সে এক আফিসে পঁচিশ টাকা বেতনে একটা কাজ পাইয়া গেল।

এই কাজটি পাইয়া শিবুর উৎসাহের আর সীমা রহিল না। সে তাহার দৈনিক পানের খরচ আরও কিছু বাড়াইয়া দিল। তাহার সেই অসমাপ্ত গল্প 'একদা বসন্তকালে—' লিখিবার কথা এই সময় একবার তাহার মনে হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, ঐ অপয়া গল্পটাই যত নষ্টের মূল। সুতরাং তাহার মন হইতে এই আপদকে নোয়াখালীর জমিদারবাবুর মত সে সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় দান করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, যতদিন বাঁচিবে, আর কখনো গল্প লেখার নামও সে করিবে না।

অতঃপর বেশ আনন্দেই শিবুর দিন কাটিতে লাগিল। খায় দায়, অফিস যায়, সারাদিন পান চিবোয় আর অবসর সময়ে খোসগল্প করিয়া কাটায়। মধ্যে মধ্যে দেশের কথা, দাদার কথা, বউদির কথা তাহার মনে পড়ে। সে সময়ে তাহার চিরকালের গ্রাম,—তাহার জন্মভূমির জন্য মনটা তাহার একটু চঞ্চল হইয়া পড়ে, কিন্তু সহরের অবিশ্রান্ত কলরব ও হট্টগোলের মধ্যে শীঘ্রই সে চঞ্চলতা মিলাইয়া যায়। তবে শিবু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, মাহিনা পাইলে সে এইবার কোন এক শনিবারে দেশে যাইবে। সমস্ত মাহিনাটা দাদার পায়ের তলায় ধরিয়া দিয়া সে একটা প্রণাম করিবে, আর যাইবার সময় কলিকাতা হইতে দুইশো পানের খিলি অর্ডার দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে, দাদা ও বউদিকে দেখাইয়া দেখাইয়া রবিবার সারাদিন ধরিয়া তাহা চিবাইয়া, সোমবার ভোরের ট্রেণে আবার সে ফিরিয়া আসিবে।

সকল আফিসেই মাহিনার দিনে বাবুদের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহ আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিনার দিন শিবুও তাহার আফিসে আসিয়া দেখিল, সকলের মধ্যে খুব একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও দুই চারিজন বায়েস্কোপের গল্পে মশগুল, কোথাও বা ফুটবল ম্যাচের গল্প, কোথাও রেঞ্জার্সের লটারীর টিকিট লইয়া হট্টগোল। শিবু যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, সেখানে কে একখানি 'চির-বসন্ত' মাসিক পত্র লইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই কি একটা গল্প লইয়া সকলের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছিল।

একজন বলিল, "গল্পের মত গল্প বটে!"

আর একজন বলিল, "গল্প তো অনেকেই লেখে, কিন্তু এরকম গল্প—"

মধ্যপথে বাধা দিয়া আর একজন বলিয়া উঠিল, "আরে তা না হ'লে দেশ জুড়ে ওঁর এমনধারা নাম জাহির হ'য়ে পড়ে!"

শিবু একবার কাগজখানা লইয়া গল্পের লেখকের নামটা পড়িয়া লইল,—পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী। মনে মনে বলিল, হায় রে পাঁচকড়ি! আজ যদি সে তাহার গল্প লেখা চালাইয়া আসিতে পারিত, তা হলে দশ বিশ হাজার কড়িও তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিত না। শিবু তখনি মনে মনে স্থির

করিয়া ফেলিল, সে আর লেখে বা না লেখে, তার সেই অসমাপ্ত গল্পটাকে সে লিখিয়া শেষ করিবে এবং ইহাদের একবার শুনাইয়া দিবে।

সুতরাং বাসায় আসিয়াই সে কাগজপত্র গুছাইয়া লইল এবং তাহার সেই, 'একদা বসন্তকালে—' লিখিতে বসিয়া দেখিল, তাহার কৌটার পান সব ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন গল্প লেখা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়া সে বাজার হইতে পান কিনিয়া আনিবার উদ্দেশে বাহির হইল।

পরদিন সকালে গোলার নন্দী মশাইয়ের সঙ্গে শিবু এমন এক গল্প জুড়িয়া দিল যে, তাহার 'একদা বসন্তকালে—'-তে আর হাত দিবারই অবকাশ পাইল না। আফিস যাইবার সময় হইয়া পড়িলে, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আফিসে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হইলেও 'একদা বসন্তকালে—' তাহার মগজের মধ্যে ক্রমাগতই ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

আফিসে পদার্পণ করিয়াই, শিবু শুনিল, সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছে। শুনিবামাত্র 'একদা বসন্তকালে—' তাহার মাথা হইতে খসিয়া পড়িল; এবং সমস্ত মাথাটা তাহার ঘোলাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও একটু কাঁপিয়া উঠিল, সাহেব ডাকিয়াছে। কেন? সাহেব তো তাহাকে ডাকে না; ডাকিবার কথা নয়। সাহেব যে বড় রাগী মেজাজের। কি করিয়া তার সামনে সামনে গিয়া দাঁড়াইবে। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কি-ই বা তার জবাব দিবে।

বড়বাবু তাড়া দিলেন, "যান না শিববাবু।"

"আজ্ঞে, যাই। যাই।"

"মুখের পানটা ফেলে দিয়ে যান।"

কথাটায় শিবু কর্ণপাত করিল না; কারণ মুখের পান ফেলিয়া দিতে সে রাজী নয়। তাহা কষের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া সে সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব মুখ তুলিয়া শিবুর দিকে চাহিল; কহিল, "Do you know the Electric Corporation Head Office?"

শিবু ভিতরে-ভিতরে কাঁপিতেছিল। 'Yes, sir' বলিতে গিয়া হঠাৎ সে ভয়ানক এক বিষম খাইল এবং তাহার ফলে, তাহার মুখের সমস্ত পান ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল সাহেবের মুখে, চোখে, জামায়, কলারে, নেকটাইয়ে এবং টেবিলের কাগজপত্রে। সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবের মুখের একটা ভীষণ গর্জ্জন শিবুর কানে গেল মাত্র, কিন্তু সে নিজেই বুঝিতে পারিল না যে, সে সজীব, কি নির্জ্জীব।

ইহার কিছু পরেই শিবুকে কেন্দ্র করিয়া আফিসের বাবুদের মধ্যে একটা ঘোর আন্দোলন আলোচনা সুরু হইল। বড়বাবু কহিলেন, "আমি বার বার বললুম যে, মুখের পানটা ফেলে দিয়ে যান; এখন হল তো?"

হরিশবাবু বলিলেন, "সাহেবের হুকুম, কাল থেকে আফিসের মধ্যে আর একটি পানও খেতে পাবেন না; পারবেন তো শিববাবু?"

নন্দ বলিল, "পানের বদলে বিড়ি ধরুন, বিড়ি ধরুন, এক পয়সায় আটটা।"

জ্ঞানবাবু কহিলেন, "সাহেবের কড়া হুকুমের কোন্‌টা তামিল করবেন? পান ছাড়বেন, না চাকরী ছাড়বেন? একটাকে ছাড়তেই হবে।"

শিবু কাহারো কোন কথার জবাব না দিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পাঁচটা

বাজিলেই সে বাসায় চলিয়া আসিল। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও চিন্তায় সেরাত্রে তাহার আর ঘুম আসিল না। সারা রাতের অনিদ্রার পর ভোরের বেলা সে সকল চিন্তার শেষ করিয়া ফেলিল। মনে মনে স্থির করিল, সে পান ছাড়িবে না, চাকুরিই ছাড়িবে এবং দেশে ফিরিয়া যাইবে। দেশে গিয়া সে তাহার নিজ অংশের ধান-জমিগুলাতে সারি সারি পানের বরজ বসাইবে। আর তারই ধারে ধারে পাঁচ হাজার সুপারী গাছ লাগাইবে। অত্যন্ত রোকের মাথায়, মরিয়া হইয়া, এ প্রতিজ্ঞাও সে করিয়া বসিল যে, তাহার ঘোর অপয়া সেই 'একদা বসন্তকালে—' গল্পটি, যাহার সংস্পর্শে আসিবামাত্রই বার বার তাহার কোন না কোন বিপদ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, দেশে গিয়াই সে সর্ব্বাগ্রে ঐ গল্পটি লিখিতে সুরু করিবে। তাহাতে ভাগ্যে তাহার যাহাই ঘটে, ঘটুক।

সুতরাং সেইদিনই দেশে যাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিয়া ফেলিল। তারপর স্নানাহার শেষ করিয়া, আফিসের সাহেবের নামে একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল; তাহাতে লিখিল—'পান ছাড়িতে পারিব না। পানের জন্য দাদা ছাড়িয়াছি, বউদি ছাড়িয়াছি, দেশ ছাড়িয়াছি; চাকুরীও ছাড়িলাম।'

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে শিবু কামারপুরের বাটীতে গিয়া পৌঁছাইল এবং পৌঁছিয়াই যখন হরকালীর পায়ে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল, তখন হরকালী অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "বস্তাটায় কি ঠাকুরপো ?"

তাহার পায়েও একটা প্রণাম করিয়া শিবু কহিল, "ওতে পাঁচ হাজার পান, পাঁচ সের সুপুরী আর পাঁচ পোয়া খয়ের আছে।"

তারপর মুখ হাত ধুইয়া কিছু জলযোগান্তে শিবু তাহার গল্পের কাগজ লইয়া তাহার সেই অপয়া গল্পটাই লিখিতে সুরু করিল—

একদা বসন্তকালে—



আলীবর্দ্দী খাঁ ও বাঙ্গালার শাসন-বন্দোবস্ত

স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়

সরফরাজের দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের গৌরব উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হয়। যদিও তিনি নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, মহারাষ্ট্রীয়গণের রণহুঙ্কারে ও আফগানগণের অসিঝনৎকারে সর্ব্বদাই তাঁহাকে চকিত ও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তথাপি ঐ সমস্ত বিপ্লবের মধ্যে তিনি যেরূপ রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজের যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে সরফরাজের সময় পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ রাজকোষে অনেক কোটি টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সেই সমস্তেরই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি সরফরাজের উকীল যুগলকিশোরকে বাধ্য করিয়া বাদসাহদরবার হইতে তিন সুবার সনন্দ আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারই বলে তিনি মুর্শিদাবাদের নিজামতআসনে সুদৃঢ় হইয়া বসেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী লাভের জন্য তাঁহাকে বাদসাহদরবারে কোটি মুদ্রা প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন উজীর ইসাক খাঁ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক বহুমূল্য সামগ্রী প্রেরিত হয়। সেই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ সুজা উল-মুল্ক ও হেসামউদ্দৌলা উপাধি লাভ করিয়া সহস্র অশ্বারোহীর অধীশ্বর ও মাহীচিহ্নে * ভূষিত হন। তাঁহার পরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তি বাদশাহদরবার হইতে সম্মান ও উপাধি লাভ করেন। নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ রেজা নওয়াজিস্ মহম্মদ মাহীচিহ্নে ভূষিত হইয়া সামতজঙ্গ দ্বিতীয় সৈয়দ আহম্মদ সৌলদজঙ্গ ও কনিষ্ঠ জৈনউদ্দীন আহম্মদ হায়বতজঙ্গ উপাধি লাভ করেন। † নওয়াজিস মহম্মদের সহিত আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘষিটা বা মেহেরউন্নিসার, সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যা মায়মানার ও জৈনউদ্দীনের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার বিবাহ হইয়াছিল। জৈনউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা সাকুলী খাঁ বাহাদুর এবং তৎকনিষ্ঠ এক্রামউদ্দৌলা বাদশা কুলী খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

এইরূপে সম্মানিত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদ প্রদান করিয়া অন্যান্য উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকেও শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ও বাঙ্গলার দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রদেশদ্বয় ঢাকাবিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সৈয়দ আহম্মদকে রঙ্গপুরের ফৌজদারী হইতে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা স্থির হয়। কিন্তু সে

---

* মৎস্যচিহ্নকে "মাহী" কহিয়া থাকে, ইহা একটি সম্মানের চিহ্ন।

† রিয়াজুস সালাতীনে নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ও জৈনউদ্দীন আহাম্মদ খাঁ উপাধিও এই সময়ে প্রদত্ত হয় বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু মুতাক্ষরীণে তাহা নাই।

সময়ে উড়িষ্যা সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁর অধীন ছিল। তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া পরে সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জৈনুদ্দীন আহম্মদ পূর্ব্ব হইতে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উক্ত প্রদেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার নৌবিভাগের অধিপতির পদ লাভ করেন। নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের জামাতা আতাউল্লা খাঁ ভাগলপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তিনি পূর্ব্বে রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। এতদ্ভিন্ন হোসেন কুলী খাঁ ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে এবং নবাবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আতাইয়ার খাঁ, ফকীরউল্লা খাঁ, নূরউল্লাবেগ খাঁ, নবাবের বৈমাত্রেয় ভগিনীপতি মীরজাফর খাঁ ও মুস্তাফা খাঁ প্রভৃতি সসম্মানে প্রধান প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। রায়রায়ান আলমচাঁদের সহকারী চায়েন রায় রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। চায়েন রায় পূর্ব্বে জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরের ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ ও শান্তপ্রকৃতির বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ব দেওয়ান জানকীরাম সৈনিক বিভাগের দেওয়ানী লাভ করেন। তদ্ব্যতীত নসরৎ আলি খাঁ বক্‌সীর পদে এবং ফকির উল্লাবেগ খাঁ সহকারী বক্‌সীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মোরাদ খাঁ নামক বাদসাহের জনৈক কর্ম্মচারী বাঙ্গলার রাজস্ব ও সরফরাজের ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণের জন্য বাদসাহ-দরবার হইতে প্রেরিত হন। তাঁহার বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা-সংবাদ পাইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মোরাদ খাঁকে কিছুদিন পাটনায় অবস্থান করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাব রাজমহলে উপস্থিত হইয়া সকরীগলিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব করেন ও তথায় সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি ও বাঙ্গলার রাজস্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। মোরাদ খাঁ তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে আলিবর্দ্দী রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করিয়া তথায় মোরাদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি বলিয়া নগদ কয়েক লক্ষ মুদ্রা, ৭০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জহরৎ, বহু সংখ্যক স্বর্ণরৌপ্যের পাত্র, বহুমূল্যের কারুকার্য্যসমন্বিত সামগ্রী, অনেকগুলি হস্তী ও অশ্ব প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একখানি প্রাপ্তিপত্র লিখিয়া লইলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকেও যথোচিত উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। মোরাদ খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। *

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যমধ্যে একেশ্বর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একমাত্র সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার অন্তরায় হওয়ায় আলিবর্দ্দী তাঁহাকে দমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। মুর্শিদকুলী উড়িষ্যা প্রদেশের সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন। নবাবের অপরিমিত সৈন্যের কথা শুনিয়া মুর্শিদকুলী সুরাটবাসী আগা মহম্মদ তকী খাঁর দ্বারা তাঁহার

---

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজের সম্পত্তি হইতে বাদসাহ-দরবারে ৪০ লক্ষ টাকা ও পেস্কস স্বরূপ ১৪ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ কোমরুদ্দীন উজীরকে, ১ লক্ষ আসফজা নিজাম-উল-মুল্‌ককে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকেও যথোচিত অর্থদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। যৎকালে উভয়পক্ষের সন্ধির কথা চলিতেছিল, সেই সময় মুর্শিদকুলী খাঁর স্ত্রী দুর্দ্দানা বেগম ও তাঁহার জামাতা মির্জা বাখর খাঁ তাঁহাকে সন্ধি করিতে বারংবার নিষেধ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শৈথিল্য দর্শনে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে যতদিন মুর্শিদ কটকে অবস্থিতি করিবেন ততদিনপর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সেই জন্য তিনি যত শীঘ্র পারেন, উড়িষ্যা-পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে ভাল হয়। * মুর্শিদকুলী খাঁ উক্ত পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিজয়ী আলিবর্দ্দীর সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি জানিতেন যে, আলিবর্দ্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার সেই বিপুল সৈন্য-সাগরের নিকট মুর্শিদকুলী আপনাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগেলেন। দুর্দ্দানা বেগম উড়িষ্যাবাসীগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গৌরবের বলেও আপনাকে অপরিসীম ধনশালিনী মনে করিয়া স্বীয় জামাতা মির্জাবাখরকে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। মুর্শিদকুলী অগত্যা তাঁহাদের পরামর্শে চালিত হইয়া আলিবর্দ্দীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় রহিল না। আলিবর্দ্দী হাজি আহম্মদ ও নওয়াজিস মহম্মদের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সহ মুর্শিদাবাদ হইতে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। †

আলিবর্দ্দীর উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রার কথা শুনিয়া মুর্শিদকুলী আপনার কর্ম্মচারিগণকে দরবার-গৃহে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আলিবর্দ্দীর ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে আলিবর্দ্দী অন্যায়রূপে সরফরাজকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন এবং এক্ষণেই বা কিরূপে তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, সমস্ত বিবৃত করিয়া আপনার কটিদেশ হইতে তরবারি ভূমিতলে স্থাপন করিয়া সকলকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী আবেদআলি খাঁ সমস্ত সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া কটিদেশে পুনর্ব্বার তরবারি সংলগ্ন করিয়া দিলেন এবং আলিবর্দ্দীর কার্য্যের প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইতে অঙ্গীকার করিলেন। সকলেই তাহাতে সম্মত হইলে মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় জামাতা বাখরআলির সহিত কটক পরিত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ‡ তিনি বুড়াবালাং নদী পার হইয়া চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত বন

---

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ সন্ধির জন্য হাজী আহম্মদের জামাতা মোখলেস আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠান। মোখলেস আলি খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিলে হাজী ও আলিবর্দ্দী চতুরতা পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া মুর্শিদকে নিশ্চিন্ত করেন। কিন্তু মুর্শিদের সৈন্যগণকে হস্তগত করিবার জন্য পুনর্ব্বার মোখলেস খাঁকে পাঠাইয়া দেন। মোখলেস মুর্শিদের সহিত মৌখিক প্রণয় করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। এদিকে আলিবর্দ্দীও ধীরে ধীরে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন।

† রিয়াজে লিখিত আছে যে, তিনি লক্ষাধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ উড়িষ্যা যাত্রা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট বলেন, তিনি ১২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন।

‡ সালাতীনে লিখিত আছে যে, তাঁহার অপর জামাতা আলাউদ্দীন মহম্মদ খাঁও তাঁহার সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি দুর্দ্দানা বেগম ও পুত্র ইয়াহিয়া খাঁকে রায়াবতীর দুর্গে রাখিয়া যান।

ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি উচ্চ ভূমিতে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। * শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন, বুরুজ নির্ম্মাণ করা হইল। তিনশত বন্দুক ও কামান দ্বারা উক্ত বুরুজ সজ্জিত করিয়া তাঁহারা বিপক্ষপক্ষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুর্শিদের শিবির এরূপ সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে পরাজিত করা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁ মেদিনীপুর হইতে জলেশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত শিবির দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করা ক্লেশকর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। বাঙ্গলার সীমান্তপ্রদেশস্থ জমীদারগণ তাঁহার শিবিরে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণে অবহেলা করিতেছিলেন, এবং যাহা কিছু প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ উড়িষ্যার জমিদারগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া যায়। নারায়ণগড়ের শাসনকর্ত্তা কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও পথিমধ্যে অপহৃত হইয়াছিল। এইরূপ খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে আলিবর্দ্দী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী মেদিনীপুর হইতে প্রথমে জলেশ্বরে উপস্থিত হন। সুবর্ণরেখা নদীর রাজঘাট নামক স্থানে ময়ূরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ † আপনার চাওয়ার ও খণ্ডাইত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময় হওয়ায় দুর্গম হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দী রাজা রঘুনাথকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। রঘুনাথের অধীনে অনেক সৈন্য ছিল, তিনি নবাবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হন। আলিবর্দ্দী তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে কামান স্থাপন করিয়া গোলাবর্ষণে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলেন। রাজসৈন্যগণ অবশেষে বনমধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। নবাব রাজঘাট উত্তীর্ণ হইয়া মুর্শিদকুলীর শিবিরের নিকট রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ শত্রুপক্ষের এইরূপ বাধাপ্রাপ্তি আরও কিছুদিন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিরও এক প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহাতে কালক্ষয় হইতেছে বিবেচনা করিয়া মুর্শিদের জামাতা মির্জাবাখর যৌবনসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত মুর্শিদকুলী খাঁর নিষেধ সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য সেই সুরক্ষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দুঃসাহসের জন্য বন্দুক ও কামান সজ্জিত শিবির-প্রাচীরের কতক ভগ্ন হওয়ায় আলিবর্দ্দী খাঁ ঐ সমস্ত বন্দুকাদি অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ ধীর ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা এক বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার অভয়দাতা সেনাপতি আবেদ খাঁ স্বদেশবাসী মুস্তাফা খাঁর সহিত যোগদান করে। আবেদ খাঁ অত্যন্ত তৎপরতার সহিত যুদ্ধের ভান করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে চালিত করিল। সে মুস্তাফা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে সমস্ত

---

* সালাতীনে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ তিলিয়া গড্ডির পাহাড়ের ফুলওয়ার নামক ঘাট হইতে জুন নদী পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন।

† রিয়াজে জসরধর আছে আবার তারিখ বাঙ্গলার চক্রধর দেখা যায়। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের তালিকায় চক্রধরকে ১৭৫০–৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে দেখা যায়, তৎপূর্ব্বে রঘুনাথ বিদ্যমান ছিলেন। রঘুনাথ ১৭২৮ হইতে ১৭৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এই সময়ই রঘুনাথ ময়ূরভঞ্জাধিপ ছিলেন।

সৈন্য সহ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।* মুর্শিদকুলী খাঁ আবেদ খাঁর ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া আবদুল আজিজের অধীন বাঢ়-বাসী † কতিপয় সাহসী সৈয়দের সাহায্যে নবাবের সৈন্যকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। আলিবৰ্দ্দী খাঁ অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বিজয়-গৌরবের লোপ হইবার উপক্রম হইল। বৰ্দ্ধমানের রাজ্যের পেস্কার মাণিকচাঁদ সসৈন্যে নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে স্থির করিতে না পারিয়া গোপনে মুর্শিদকুলী খাঁর সহিতও আনুগত্য করিয়াছিলেন। তিনি মির্জা বাখর খাঁর সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর পতাকা উত্তোলন করেন। বাখর তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উহাকে মাণিকচাঁদের চতুরতা মনে করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিতে থাকে। মির্জাবাখর দক্ষিণ দিক পরিত্যাগ করিয়া বামপার্শ্বে নবাব-সৈন্য আক্রমণ করিলে আলিবৰ্দ্দীর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মীরজাফর খাঁ সৈন্যগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একদল সাহসী সৈন্যের সহিত মুস্তাফা খাঁ, দীলার খাঁ ও আনালত খাঁর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অপরিসীম সাহস প্রদর্শনের জন্য তাঁহার গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ভীষণ যুদ্ধে মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে মীর মহম্মদআলি ও মীর আকবরআলি নামক সৈয়দ বীরদ্বয় প্রাণত্যাগ করে, এবং মির্জাবাখরও অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার প্রতি বিজয়লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া মির্জাবাখরকে শিবিকারোহণে অপসারিত করিলেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলে, তথায় তিন সহস্র লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। মুর্শিদ বালেশ্বরে শিবির সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্যে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর উত্তোলন করিলেন। পরে নদীতীরে গমন করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য স্বীয় হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় তাঁহার মিত্র সুরাটবাসী হাজী মসিনের একখানি জাহাজ দ্রব্যাদি বহন করিয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। হাজী মসিন বালেশ্বরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। উক্ত জাহাজের একখানি পান্‌সী মুর্শিদকুলী খাঁর সংবাদ অবগত হইবার জন্য তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। হাজী মসিন জাহাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর এক্ষণে উত্তম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, কদাচ এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। মুর্শিদকুলী খাঁ কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া মির্জাবাখরের সহিত নৌবিহার ছলে পান্‌সী আরোহণে জাহাজে উপনীত হইলেন এবং মহলিপত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মহলিপত্তনে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি আপন পরিবার ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি কটকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বীয় স্ত্রী পরিবারের অভাবে ও তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি

---

* পলাশীর যুদ্ধে মীর্জাফরও এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† বাঢ় দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে, এই নামে বেহারেও একটি নগর আছে।

মির্জাবাখরকে উড়িষ্যার সীমাস্থিত চিকাকোল ও গঞ্জামে প্রেরণ করিয়া কটক হইতে সংবাদপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সকল আশার শান্তি হইল। পুরুষোত্তমের রাজা মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ স্বীয় দুরবস্থ মিত্রের পরিবারবর্গের আনয়নের জন্য কটকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পরিবারবর্গ ও যাবতীয় ধন-সম্পত্তি সা মোরাদ নামক জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর অধীনে গঞ্জাম প্রদেশস্থ ইক্ষাপুরে আনীত হইলে * উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলী খাঁর বন্ধু বিখ্যাত আনোয়ারউদ্দীন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মির্জাবাখরও তথায় উপস্থিত হইয়া যাবতীয় ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে নিজেও তথায় গমন করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ এক্ষণে সপরিবারে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল্‌-মুলকের রাজ্যে বাস করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে লাগিলেন।

বিজয়লাভের পর আলিবর্দ্দী খাঁ সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশ আপনার বশে আনয়ন করিলেন। সুজা খাঁর উড়িষ্যা-শাসনকালে তিনি তথায় অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত প্রদেশের কোন বিষয়ই তাঁহার অবিদিত ছিল না। তৎপ্রদেশস্থ অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। অতঃপর তিনি সমস্ত জমীদারগণকে আহ্বান করিয়া সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় প্রদান করেন। অবশেষে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে আনাইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিয়া মসনদে বসাইয়া সাধারণের সমক্ষে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক হওয়ায় নবাব গুজর খাঁ নামে আপনার এক বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির ভারার্পণ করিয়া উড়িষ্যা ত্যাগ করিলেন, এবং যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজস্বসংক্রান্তবিষয়ে সৈন্যগণের সুশিক্ষা প্রদানে এবং প্রজাবর্গের সন্তোষোৎপাদনে মনোনিবেশ করিলেন। কি সম্ভ্রান্ত, কি ইতর, সকলেরই মনোরঞ্জনের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তৎকনিষ্ঠ এক্রামউদ্দৌলার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি লইয়া আপনার দরবার গঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সরফরাজের মাতা জিনেতেন্নেসা বা নফিসা বেগমকে † তাঁহার

---

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্যের হস্তে মুর্শিদের সমস্ত ধনরত্ন নিপতিত হইয়াছিল।

† জিবেতেন্নেসা বেগমকে মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক অনেক স্থলে নফিসা বেগম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম প্রথম জিন্নতেন্নেসা বলিয়া লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিন্তু সর্ব্বত্রই জিনেতেন্নেসাই লিখিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদে নফিসা বেগম দেখিয়াও ষ্টুয়ার্ট একস্থলে নফিসা বেগমকে সরফরাজের ভগিনী কিন্তু তাঁহাকে নওয়াজিন মহম্মদের অন্তঃপুরপরিদর্শিকা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মুতাক্ষরীণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে তিনি স্বীয় পিতা জাফর খাঁর খাসতালুকের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রিয়াজে নফিসা বেগমকে সরফরাজের ভগিনী ও তাঁহার নওয়াজিসের অন্তঃপুরে অবস্থানের কথা দেখা যায়।—Vide Mutakherin, Vol, I p 585, also Stewart, p 279.

অনুমতিক্রমে সসম্মানে স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিস মহম্মদের অন্তঃপুর কর্ত্রী নিযুক্ত করেন। নওয়াজিস মহম্মদ তাঁহাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়া মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং নওয়াজিসের পত্নী ঘসিটা বেগম জিনেতেন্নেসার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, এমন কি আলিবর্দ্দী খাঁ পর্য্যন্ত, তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জিনেতেন্নেসা স্বীয় পিতা জাফর খাঁর খাস তালুকের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার যাবতীয় উপস্বত্ব তিনি ভোগ করিতেন, ইহাতে কেহই তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতেন না। যেদিন গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজের প্রাণত্যাগ হয়, সেই দিন তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। জিনেতেন্নেসা তাহাকে স্বীয় দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। * সরফরাজের কোন বিবাহিতা পত্নী না থাকায় তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ নওয়াজিস মহম্মদের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় প্রেরিত হইয়া উপযুক্ত রূপ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। নওয়াজিস আপনাকে সরফরাজ খাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া প্রচার করিয়া বহুলোককে সাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি নিজে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার টাকা বিধবা, অনাথ ও বিপন্ন কর্ম্মচারিগণের জন্য ব্যয়িত হইত। এইরূপে সরফরাজের পরিবারবর্গ ঢাকায় বসতি করিতে লাগিলেন।



* ইহার নাম আকাবাবা কুচুক খাঁ, রিয়াজে নফিসা বেগম কর্ত্তৃক ইনি পোষ্যপুত্র গৃহীত হন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দক্ষিণবঙ্গে শিবের গীত

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্র শিবের ছড়া-গান প্রচলিত হইতে থাকে। এ সময় একদল লোক শিবের নাম করিয়া উপবাস করে এবং শিবঠাকুরের পাট কাঁধে করিয়া গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর একদল লোক সঙ্ সাজিয়া নাচিতে গাহিতে থাকে। চৈত্রমাসের শেষের কয়েকদিন গ্রামবাসী আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে।

চৈত্রসংক্রান্তির উৎসব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে গাজনের পূজা বলে, দক্ষিণবঙ্গে ইহা দেলপূজা নামে অভিহিত। প্রধানতঃ ইহা চড়ক পূজা নামে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গের দেলপূজার সময় গ্রাম্য যুবকেরা সঙ সাজিয়া নাচ-গান করে। উহা অষ্টকের গান নামে পরিচিত। এ সময় সাধারণতঃ আট সখী সাজিয়া নাচ-গান চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল লইয়া এক দল লোক মাতিয়া যায়। পাড়ার ছেলের দল তাহাদের সঙ্গ লইয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে।

অষ্টক গানের মধ্যে শিবের বিয়ে, ঘরকন্না, শিব-দুর্গার বিবাদ প্রভৃতি উপভোগ্য রূপে স্থান পাইয়া থাকে। শিবের গীত আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বৈদিক রুদ্র পরবর্ত্তী কালে শিবের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া বাঙলার ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের উদ্ভব। কারণ, শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ, তিনি সত্য এবং সুন্দর। সকলেই শিব পূজার অধিকারী, সেজন্য আমরা শিবকে আমাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। পারিবারিক মিলন-কলহের সহিত তিনি বিজড়িত। বস্তুতঃ শিবের গীতে বাঙালীর পূর্ব্বতন পারিবারিক জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালা দেশ ক্রমে তাঁহাকে কৃষির দেবতা করিয়া লইল এবং সাধারণ কৃষি-গৃহস্থের মত তাঁহার দ্বারা অনেক ক্ষেতের কাজ করাইয়া লইল। বাঙ্গালার মনসামঙ্গল তথা ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে শিবের মালঞ্চ-সৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের দেলপূজার ছড়ার মধ্যে শিবের মালঞ্চ-সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃষ্টি করিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বল্লুক সাগর বর্দ্ধমানের দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। আমাদের দেশে অনেক সময় বড় বিলকে সাগর বলা হইয়া থাকে— পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্টের দিকে "হাওর" অর্থে বিল বুঝায়। "সায়র" শব্দ আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত, তাহা সাগরের অর্থদ্যোতক। অন্য পক্ষে, বল্লুকসাগর গঙ্গোপসাগরের শাখাবিশেষ বলিয়া ধারণা করা চলে। যাই হউক, শিবের আজ্ঞাক্রমে নন্দী বল্লুক সাগরের কাছে মালঞ্চ-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। ভূমি চাষ করিয়া সে শিবের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

চাষ মই দিয়া ভূমি করিল সুসার।
সংবাদ পাঠাইল নন্দী প্রভুর গোচর ॥

(দেল পূজার ছড়া—খুলনা জেলা)

রামেশ্বরের শিবায়নে অনুরূপ বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক রুদ্র শিবরূপে পরিণত হইলে ত্রিশূল স্থলে তিনি লাঙ্গল ধারণ করিলেন। ক্রমে শিব কৃষিকর্ম্মের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রের নিকটে শিব ভূমিভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন—

তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ॥
(রামেশ্বরের শিবায়ন)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শিবের গীতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সন্ধান মিলে। পূর্ব্বে বাঙলা-দেশে বহুবিবাহের রীতি ছিল এবং বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক বৃদ্ধ তরুণী ভার্য্যার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। এমন কি বুড়ো শিবের সহিত দুর্গার বিবাহ হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গের "অষ্টক গানে"র মধ্যে শিবের বিয়ের বিষয় উপভোগ্য রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহ করিবার জন্য শিব গিরিপুরে গমন করিলে তাঁহাকে দেখিয়া গিরিপুরের এয়োতি যুবতীগণ রঙ্গ করিতে লাগিল। "মেয়ের মামী" তাঁহাকে দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলে বলিলেন—

গিরিপুরের আইয়েগণ সকলে,
ও মামার কাজল পরায় কপালে,
আর মাইয়ের মাসি এসে বলে,
দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলে।"

এরূপ "দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলের" সহিত কচি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলেই নারাজ। শ্রীদুর্গার সখীগণ রাণীর নিকট যাইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিল—এ রকম বরের হাতে মেয়ে দেওয়া অন্যায়।

বলে রাণীর কাছে ডাকি
অমন বরে দিস্‌না বিয়ে
তোর কাঁচা মেয়ে॥

সখীগণ বলে—

ও তোর জামাইর মুখে পাকা দাড়ী,
ননীর পুতুল সোনার বেড়ি,
আমরা সকলে বারণ করি,
কি জন্যেতে বুড়ার হাতে
দিস মা তাড়াতাড়ি॥

এ সব নিষেধ সত্বেও গৌরীকে বুড়ো শিবের হাতে সম্প্রদান করিতে হইল। বাঙলার গৌরীদান প্রথা এই ভাবে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। মেয়ের বাপ মা, বৃদ্ধ কিম্বা যুবার পার্থক্য দেখিতেন না। "অষ্টমবর্ষে" মেয়েকে দান করিতে পারিলে, গৌরী দানের অক্ষয় (?) ফল লাভ করা যায় বলিয়া একটা ধারণা জন্মিয়াছিল।

এ রকম ক্ষেত্রে মেয়ে যে সুখে থাকিতে পারে না, তাহা স্বাভাবিক। সেজন্য বোধ করি গৌরীর জীবনে সুখ ছিল না। বুড়োদের স্বভাবতঃ একটু সন্দেহের বাতিক থাকে, সেজন্য বহুদিন পরে গৌরী পিত্রালয়ে গমন করিতে চাহিলেও, শিব তাহাতে বাদ সাধিতেন। নারদ সব সময় কোন্দল বাধাইবার চেষ্টায় থাকিতেন—তিনি ও তলে তলে শিবকে নিষেধ করিতেন।

তবে নারদ বলেন মামা, এও ক'র না ভাল।
ব'স্‌-কালে নারীলোক না'য়েরে পাঠাও কেন॥

দুর্গাকে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য শিব নিষেধ করেন। তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করেন।

ও নাইয়ারের[১] ছুতো নিয়ে,
কলঙ্ক রটাবি গিয়ে,
শুন সতী ভাল না ভাল না॥

শ্রীদুর্গাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। ভোলানাথ যে চুপি চুপি কুচনগরে যাতায়াত করেন, তাহা পার্ব্বতী লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাকে যদি না যাইতে দেন, তাহা হইলে তিনি আর সংসারের কাজ করিবেন না।

ও তবে দেবী বলে শূলপাণি
তোমার বৃত্তান্ত জানি,
কুচ-নগরে কর যাতায়াত।
ও তবে পাঠায়ে না দেও যদি,
তোমার সঙ্গে এই অবধি,
রান্ধিয়া না দিব তোমার ভাত॥
ও তবে নাইয়ারে যাব আমি,
যা' পার তা কর তুমি,
পুরাইব মনের বাসনা।

মহাদেব বেগতিক বুঝিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গ লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কারণ এ বুড়ো বয়সে তাহাকে দেখিবার আর কেহ নাই। ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

দেখিয়া গমনোদ্যোগী, মহাদুঃখে মহাযোগী
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি॥
তুমি সদয়া অচলে, আমার কিরূপে চলে,
চলাচল শক্তি নাই ঈশানি।
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হ্রাস হচ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি॥

১। নাইয়ার—কুটুম্ববাড়ী, বাপের বাড়ী।

বাধ্য হইয়া শিবকে লইয়া পার্ব্বতী গিরিপুরে আগমন করিলেন। পার্ব্বতীর গিরিপুরে আগমন-ই বাঙলাদেশে "আগমনী" নামে পরিচিত। "আগমনী গান" পশ্চিমবঙ্গের দিকে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। শ্রীদুর্গার পিত্রালয়ে আগমনকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙলার বহু কবি "আগমনী গান" রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণবঙ্গের "শিবের গীতে" গঙ্গা-দুর্গার বিবাদের বিষয় উল্লিখিত আছে। "সতীনের ঘর" করা পূর্ব্বেকার বাঙালী মেয়েদের একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল; সতীনের সঙ্গে অনবরত কলহ লাগিয়াছিল। গঙ্গাদুর্গার কলহের মধ্যে তাহা রূপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বলিছে গঙ্গাধনি, পতি হয় শূলপাণি,
পতির বুকে পা দিয়েছ, লজ্জা নাই ভবানী॥

দুর্গাও তাহার উত্তর দেন।—

রাগ করে ভবানী কয়,
সব দোষ কি আমার হয়,
আমি থাকি পতির বুকে,
তুই কেনে পতির মাথায়॥

শিবের গীতের সন্ধান করিলে এরূপ অনেক বিষয় জানা যায়। ইহাদের মধ্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

প্রতীক্ষা

শ্রীশোভারাণী রায়

নভের মতন সুনীল বসনে
এ তনুদেহটি ঢাকি'
তোমারি লাগিয়া সাঁঝের বেলায়
একেলা বসিয়া থাকি।
শিথিল খোঁপাটি ঘিরিয়া আজিকে
পরেছি বকুল মালা
নিরালা তারার মতন কপালে
এঁকেছি সিঁদুর-জ্বালা

কনক-কাঁকণে বেঁধেছি আজিকে
আমার এ বাহু দু'টি—
মুখর নূপুর সহসা জাগিয়া
নীরবতা ফেলে টুটি'।
মেঘের মতন সঘন কাজল
আঁখির পাতায় আঁকি'
প্রদীপ জ্বালিয়া বসেছি আশায়,
আজিকে আসিবে না কি?



চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্রষ্টার ছাপ সৃষ্টের মধ্যে পড়ে, এই বিশ্বাসে তাহারা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করিত। এখন দিন বদলাইয়াছে। আমরা বিজ্ঞান শিখিয়াছি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন শুনিলে আমরা ক্ষেপিয়া যাই। আমরা জানি আত্মা-টাত্মা বাজে কথা; মন বুদ্ধি চৈতন্য পর্য্যন্ত সমস্তই দৈহিক ব্যাপার; এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে গঠিত। জানিয়া আমরা পরম হৃষ্টমনে ভূত হইয়া যাইতেছি।

*

ভুলটা আসলে ঈশ্বরের। মানুষের পূর্ব্বে তিনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানুষ গড়িয়া তাহাকে তিনি সেই সমস্ত দেখাইলেন। বলিলেন, বৎস, এই সমস্তই তোমার জন্য আমি গড়িয়াছি। এখন চরিয়া খাও।

মানুষ সহর্ষে কহিল, প্রভু, সমস্তই খাইব?

ঈশ্বর কহিলেন, চিবাইয়া যতদূর নরম করিতে পার, গিলিয়া যতদূর হজম করিতে পার, আমার আপত্তি নাই।

মানুষ পরমানন্দে চাখিতে আরম্ভ করিল।

জগতে ও জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য যে খাওয়া, সে কথা ঈশ্বরই প্রথম মানুষকে শিখাইয়া দিলেন। মানুষের কানে সেই তাঁহার প্রথম উচ্চারিত মন্ত্র। মানুষ মন্ত্রের মর্য্যাদা রাখিয়াছে। ঈশ্বরের মুণ্ড পর্য্যন্ত সে বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে চিবাইয়া খাইয়াছে।

*

প্রথমে সে খাইল ফলমূল। একটা ফল ঈশ্বর তাহাকে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; জানিতেন, সেইটা না খাইলে তাহার জ্ঞাননেত্র খুলিবে না, সে রাঁধিতে শিখিবে না, কাজেই অন্য জীবকেও খাইতে পারিবে না।

কিন্তু অত সহজে ঠকিবে, মানুষ অমন গাধা নয়। সে সেই ফল খাইল। খাইবার ফলে তাহার জ্ঞান বিকশিত হইল, সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। আগুন জ্বালাইল,

অস্ত্র বানাইল, পশুপক্ষী মারিতে শিখিল। তাহার ভোজ্যবস্তুর তালিকাও উদ্ভিদ্‌রাজ্য ছাড়াইয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে জীবরাজ্যে প্রসারিত হইল।

*

তিমি ও ডাইনোসর হইতে সুরু করিয়া ফড়িং উইপোকা পর্য্যন্ত চাখা সারা হইয়া গেল। মানুষ কহিল, ওহে বিধাতা-পুরুষ, এখন কি চাখিব? তোমার সৃষ্টি তো ফুরাইয়া গেল!

বিধাতা কহিলেন, নূতন জীব সৃষ্টি করিতেছি। আমাকে খাইও না, রক্ষা কর।

মানুষ কহিল, আচ্ছা, মানুষের মাংস কেমন লাগে? ওটা তো চাখা হয় নাই, ঐটাই শুধু বাকি আছে।

বিধাতা বাঁচিয়া গেলেন। কহিলেন, করিয়াছ কি? মানুষই চাখো নাই! চাখো, চাখো।

মানুষ চাখিয়া দেখিল। দেখিয়া কহিল, এতকালে যথার্থ সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান পাইলাম। তোমাকে আর নূতন অখাদ্য সৃষ্টি করিতে হইবে না, আমরা মানুষই খাইব।

*

মানুষের মাংসই যে খাইতে মাংসোত্তম, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ দেখানো যায়। ভাষায় ইহার নাম মহামাংস। শাস্ত্রে বলে, দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা মাংসাশী তাঁহারা নরবলিই সকলের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। জীবজন্তুদের তো কথাই নাই। বাঘ একবার মানুষ খাইলে আর গরু খাইতে চায় না, পেশাদার নরভুক্‌ হইয়া উঠে। রূপকথার রাক্ষসেরাও তাই করিত। তান্ত্রিক সাধনার বৃহৎ কথা নরমাংস-ভক্ষণ। সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ মানুষের মাংসই একমাত্র মাংস, যাহা খাওয়া আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। খাইতে বিস্বাদ হইলে আইন করিতে হইত না। বাঘের কামড় খাইও না, লাঠির বাড়ি খাইও না, কানমলা ঘুষি বা আছাড় খাইও না, শকুনির মাংস বা পচা কৎবেল খাইও না বলিয়া আইন বানাইতে হয় না। মানুষ নিজের গরজেই ওগুলা বাদ দিয়া চলে। মানুষের মাংস খাইতে বারণ করা হয়, তবু খাওয়া ঠেকানো যায় না, ইহার একমাত্র কারণ তাহার স্বাদ ভাল, তাহার মোহ বেশি।

*

প্রাচীনকালকে আমরা স্বর্ণযুগ বলি, কারণ তখন মানুষের আনন্দ ও তৃপ্তির পথে কৃত্রিম বাধা আসিয়া রসভঙ্গ করিত না। প্রাণের কথা মুখ খুলিয়া বলা যাইত বলিয়া আর্য্যরা ইহার নাম দিয়াছিলেন—সত্যযুগ।

সেই মহান্‌ যুগে এ রকমের কুৎসিত আইন ছিল না। মানুষ তখন নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে মানুষের মাংস খাইতে পাইত। খাইতও। সেই যুগের ভাগ্যবানদের হিংসায় পরবর্ত্তী কালের মানুষরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। জ্বলুনির চোটে তাহারা তাঁহাদের নাম দিয়াছিল—ক্যানিবল। এমন করিয়া নাক সিঁটকাইয়া তাহারা কথাটাকে উচ্চারণ করিত, যেন ক্যানিবল হওয়াটা অতীব রকমের একটা হীনতা ও নোংরামি। অথচ তাহাদেরই যুগকে স্বর্ণযুগ বলিতে ইহারা সঙ্কুচিত হইত না। ভাবটা ছিল এই, যুগটা স্বর্ণময়, কিন্তু মানুষগুলা যাচ্ছেতাই। যথোচিতরূপ ভদ্রলোক তাহারা নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, হইলে তাহারা ভদ্র আচরণ করিত, নিজেরা মরিয়া যাইয়া আমাদের

জায়গা ছাড়িয়া দিত, যেন মহামাংসের সেই মহাভোজে আমরা পাতা পাতিতে পারি। ছাড়ে নাই অতএব তাহারা পাজি লোক ; আমরা খাইতে পাই নাই, অতএব সেই আঙুর খাওয়া নিশ্চয়ই গর্হিত কাণ্ড। যাহারা খাইত তাহারা অশিষ্ট।

*

আমরা শিষ্ট। আমরা নরমাংস খাই না। খাইবার প্রবৃত্তিটাকে আমরা অবদমন করিয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—সাব্লাইমেশন। প্রবৃত্তিকে চুনকাম করিয়া আমরা অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকি। কামড়াইয়া খাইবার প্রবৃত্তিটাই চুম্বনে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা কিছুদিন আগে বাংলা মাসিকে পড়িয়াছিলাম। মানুষের মাংস খাইতে হইলে মানুষ শিকার করিতে হয়, কারণ মৃতমাংসের তুলনায় জীবন্ত-হত মাংস খাইতে ভাল। মানুষ শিকারের গ্রাম্য নাম হত্যা, সেটা মূর্খদের সমাজে নিন্দিত। অধিকাংশ মানবই মূর্খ, তাই এই জঘন্য সমাজের মধ্যে বাস করিয়া ভদ্রলোকে শান্তি পায় না। যেখানে মহামাংস ভক্ষণ তো দূরের কথা, মহামাংস আহরণের অনাবিল আনন্দটুকুও ভোগ করার সুযোগ জোটে না, সে সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মনোদুঃখে জীবন্মৃত হইয়াই থাকিতে হয়। নরহত্যার প্রবৃত্তি তবুও টিকিয়া থাকে ; হাতে মারিতে না পারিয়া আমরা ভাতে মানুষ মারি। মামলা মোকদ্দমা করা এবং দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় কুৎসা লেখা, হত্যা-প্রবৃত্তির চুনকাম-করা বহিঃপ্রকাশ।

*

ভরসার কথা এই, এখনও যুগে যুগে মহামানবেরা জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনের ব্রত জনগণের হিতার্থে নিজের কর্ম্মক্ষমতা নিয়োগ করা। পঞ্জরের পিঞ্জরে বদ্ধ মানবের মুক্তিকামী আত্মার বিক্ষোভ দেখিযা ইঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। বিধিনিষেধশৃঙ্খলার শৃঙ্খলে নিপীড়িত মানব-মনের আকুতি ইঁহারা সহিতে পারেন না। হউক ক্ষণিকের জন্য, তবু সেই শৃঙ্খল মোচন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলিবার স্বাধীনতা আনিয়া দিতে পারিলে ইঁহারা ধন্য হইয়া যান। সেই আত্মপ্রসাদই ইঁহাদের পরম পুরস্কার ; ব্যক্তিগত মস্তকে অভিনন্দনের পুষ্পমাল্য কিংবা পরাজয়ের কলঙ্ক যাহাই বর্ষিত হউক, সেদিকে তাঁহারা দৃক্‌পাতও করেন না। ইঁহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলে যুগে যুগে সমাজশৃঙ্খলাপীড়িত মানব এক একবার সমস্ত বাধানিষেধের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া মহোল্লাসে হত্যামহোৎসবে মাতিয়া উঠে। সেই মহোৎসবের নাম যুদ্ধ। সেই মহামানবদের প্রতিভূ জেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, আলেক্‌জাণ্ডার, হিট্‌লার।

*

যুদ্ধ উত্তম জিনিস। যুদ্ধে মানুষের মনের সঞ্চিত দ্বেষ ও বিদ্বেষ কাটিয়া যায়, জাতীয় দেহের জড়তা কাটিয়া যায়। লোকভারপীড়িত, জন্মনিরোধব্যস্ত দেশের অনাবশ্যক মানুষগুলা মরিয়া যাইয়া তাহার স্থান-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার অতি সহজ সুষ্ঠু ও নিশ্চিত সমাধান হইয়া যায়। সাধারণত পুরুষদেরই যুদ্ধে যাওয়া ও মরা অভ্যাস বলিয়া যুদ্ধের অন্তে দেশের অনূঢ়া তরুণীরা প্রসাধন ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। ফলে দেশের রাস্তা ও

ট্রামগাড়ি সুন্দরতর হইয়া উঠে। শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মন্দার জড়তা কাটিয়া শিল্প-প্রগতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। উঠানের কোণের ভাঙা কড়াইটা পর্য্যন্ত সাড়ে তিন টাকা দরে বেচিয়া আমরা লাভবান হইতে পারি। খবরের কাগজ অধিক বিক্রয় হয়। দেশের জমি উর্ব্বর হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে ক্রেসি ও এজিনকোর্টের মাটি নররক্তে সিক্ত প্লাবিত হইয়াছিল। এখনও এই জায়গা দু'টি আঙুরের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। আঙুর গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল সার রক্ত, এবং তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নররক্ত। ফলের মধ্যে আঙুর অতি মূল্যবান ও সুস্বাদু, শৃগালেরা যাহাই বলুক।

*

তবুও এমন মূর্খ আছে, যাহারা বলে যুদ্ধ ভাল নয়। যে দুর্ব্বুদ্ধি মানুষেরা নিজেদের হীনবুদ্ধির গর্ব্বে মহামাংস ভক্ষণ ও মহামৃগয়া নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, যুদ্ধ-নিবারণের অপচেষ্টাও তাহাদেরই আবিষ্কার। যুদ্ধের নিয়ম, দুই পক্ষ পরস্পরকে মারিতে মারিতে শেষ পর্য্যন্ত যাহারা বা যাহাদের ধ্বংসাবশেষরা বাকি থাকে, তাহাদেরই জয় হইল বলিয়া স্বীকার করা হয়। এ পক্ষের একজন মানুষ আর ও পক্ষের একজন মানুষ মোটামুটি সমান যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে মোটের উপর যাহারা দলে ভারী তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত জিতিবে, এই রকম একটা আন্দাজ করাও চলে। সেই আন্দাজের জোরে ইহারা স্থির করিল, মারামারি করার দরকার নাই, দুই দলের কার কি লোকসংখ্যা গণিয়া দেখিয়া, অঙ্ক কষিয়াই জয় পরাজয় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। মাথা ভাঙিবার বদলে মাথা গণিয়া কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেওয়ার এই পদ্ধতির নাম—ডিমোক্রাসি।

*

মারামারি করা আর অঙ্ককষার মধ্যে কোন্‌টা বেশি শক্ত, সেটা ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার। আমি নিজে মনে করি প্রথমটাই সোজা ; আমি জানি মারামারিতে তবু পরের মাথায় একটা বাড়ি মারিতে পারিলেও পারি এবং আমার মাথায় বাড়ি বসাইতে সে না পারিলেও পারে ; কিন্তু অঙ্ক কষিতে হইলে আমার মাথায় বাড়ি নয়, একেবারে বাজ পড়ে। তবুও, যদি দেশে প্রচুর পরিমাণ অঙ্কবিদ্‌ থাকে, হয়তো ডিমোক্রাসি চলিতে পারে। চলা উচিত নয়, কারণ ডিমোক্রাসি মানুষকে হীনবল, ভীরু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

*

কিন্তু এখন আর তাহাকে গালাগালি দিতে চাই না। ভূপতিত শত্রুকে পদাঘাত করা—কাপুরুষতা। ডিমোক্রাসির ডিম ঘোড়ার ডিম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডিমোক্রাসির কাঁধে চড়িয়া তাহার মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার যে সিদ্ধবাদী পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার নাম ডিক্টেটরশিপ। সেই মহা-আবিষ্কারের জয় হউক, মানুষ প্রাণ খুলিয়া মারামারি করিয়া বাঁচুক, শোণিতসিঞ্চনে স্নিগ্ধ বসুন্ধরা উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। ডিমের রাজত্বের ছলনায় মূর্খরা ভুলিতে পারে। আমরা মূর্খ নই।



সম্পাদকীয়

ইউরোপে যে যুদ্ধের আগুন লেগেছে, এ খবর আমরা তারে বেতারে গত পয়লা সেপ্টেম্বর বিকেলে পাই। এ সংবাদ শুনে আমি চমকে উঠি নি, কেন না এ ঘটনার উদ্যোগ-পর্ব্ব বহুদিন হতে চল্‌ছিল।

(২)

যুদ্ধ যখন বেধেছে, তখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন্ বিষয়ে কথা কওয়া যায়? পাঁচজন ঘরে ঘরে আজকের দিন, আর কি বিষয়ে আলাপ করছেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধের খবরবার্ত্তা বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। গত যুদ্ধের সময় আর যে বস্তুরই আমদানি বন্ধ হোক—খবরের হয় নি। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বড় বড় জাতরা এক্ষেত্রে লুকোচুরি খেলছে। যুদ্ধের আগুন লেগেছে শুনছি, কিন্তু চোখে দেখছি সুধু ধোঁয়া।

(৩)

একটি মাত্র অপ্রত্যাশিত খবর পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়া পোলাণ্ডে—অর্থাৎ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং অর্দ্ধেক পোলাণ্ড—বেওয়ারিশ মাল বলে আত্মসাৎ করেছে। এ খবর শুনেও আমি চমকে উঠি নি। কারণ Bolshevism রাশিয়ার স্বদেশের শৃঙ্খলার নব পদ্ধতি। কিন্তু ইউরোপের রাজ্য মাত্রেই পরস্পরে পরস্পরের শত্রু।

(৪)

আমি এক্ষেত্রে রাশিয়ার যোগদানটা অপ্রত্যাশিত বলেছি। কেন না বাংলার হঠাৎ-দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, Bolshevism পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছে, যার বিলেতি নাম Utopia। অর্থাৎ Karl Marx নামক মহাদার্শনিক যার কল্পনা করেছিলেন, Lenin তা বাস্তবে পরিণত করেছেন। এ দর্শনের নাম হেগেলিয়ান বামমার্গ—অর্থাৎ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে হেগেল জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই একই পন্থা অনুসরণ করে Marx কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নূতনত্বের প্রধান কথা praxist। জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্ম প্রধান এ কথা ভারতবর্ষে পূর্ব্বমীমাংসকরা বহুকাল পূর্ব্বে বলে গেছেন, এবং তাঁরাও ছিলেন নাস্তিক।

যাঁরা কোন দর্শনেরই ধার ধারেন না, তাঁরা এই নূতন দর্শনের মহাভক্ত হয়ে পড়েছেন। এ দর্শনের মোদ্দা কথা হচ্ছে revolution, evolution নয়; এ দু'য়ের আসলে প্রভেদ কি?—Evolution-এর তাল বিলম্বিত, আর revolution-এর দ্রুত। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানব-সমাজের চরম উন্নতি। সে যাই হোক, মারামারি কাটাকাটির ইউটোপিয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ইউটোপিয়া সনাতন।

(৫)

জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মিলনেতে আমি বিস্মিত হয়েছি; কিন্তু এ 'মোতা' বিবাহ যে অসম্ভব, তা কখনই মনে ভাবি নি। রাশিয়াও Totalitarian State, জার্ম্মাণীও তাই; এ উভয়ের ভিতর নাড়ীর যোগ আছে। সুতরাং এ উভয়ের মিলন হচ্ছে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।

(৬)

শুনতে পাই Democracy রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ। Totalitarian State ডিমোক্রাসীর হন্তারক, সুতরাং ডিমোক্রাসীকে রক্ষা করতে হলে Nazismকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। ডিমোক্রাসী যে কি, তার definition আমি দেব না। Kant থেকে সুরু করে Morley পর্য্যন্ত ইউরোপের বহু মনীষী তা দিয়েছেন। কিন্তু কোন definitionই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় নি। তবু কোন্ রাষ্ট্র democratic আর কোন্ রাষ্ট্র তা নয়—তা আমরা দেখলে চিনতে পারি। আর কি লক্ষণে যে তাদের চিনতে হবে—সে সন্ধান Bertrand Russell সম্প্রতি দিয়েছেন। তাঁর কথা এই:

"This is the essential differece between the liberal outlook and that of the totalitarian state, that the former regards the welfare of the state as residing

ultimately in the welfare of the individual, while the latter regards the state as the end, and individuals merely as indispensable ingredients, whose welfare must be subordinated to a mystical totality, which is a cloak for the interest of the rulers."—'Power', 317

(৭)

এই যুদ্ধ নামক জঘন্য ব্যাপারে আমরা অবশ্য অবশ্য হিটলারের বিরোধী ও ডিমোক্রাসির জয় কামনা করি, যদিচ আমাদের দেশে ডিমোক্রাসি নেই, কেন না আমরা পরাধীন জাত। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেস বলেছে যে, ভারতবাসীরা ইংরাজের সহায় হ'তে প্রস্তুত যদি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের ডিমোক্রাসির পথে অনেকটা অগ্রসর করে দেয়। এ দাবী সম্পূর্ণ সঙ্গত কেন না ডিমোক্রাসি কোনও জাতের একচেটে নয় বিশ্বমানবের কামনার ধর্ম্ম।

(৮)

দেখে খুসী হলুম যে দেশবিদেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে জনৈক বিদেশীরও এই মত। Gunther-এর 'Inside Europe' একখানি জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি সম্প্রতি 'Inside Asia' নামক আর একখানি বই লিখেছেন, উক্ত গ্রন্থের India-র বর্ত্তমান পলিটিক্সের পরিচয় তিনি এই বলে শেষ করেছেন—

"Crisis will probably come in the event of an European war. Will India be loyal, as it was in 1914? The easy thing to say is of course that if Congress plays its cards correctly, it could gain enormously by any such crisis. It could promise to remain loyal—in return for an advane in independence."

—'Inside Asia', p. 528

(৯)

পলিটিক্সের তাস খেলায় মহাত্মা গান্ধী নেহাৎ আনাড়ী খেলোয়াড় নন, তিনি ইংলণ্ডের এই বিপদের সুযোগ নিয়ে—যে ছক্কাপাঞ্জা ধরবেন তার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব war profit করা তাঁর ধাতে নেই। কিন্তু মনে হয় এ বাজি তিনি হাতের পাঁচ রাখবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এ্যান্টনি রোড হইতে প্রকাশিত

অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা, ষাণ্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাকখরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়ভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতিমাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৩০৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার


"তোমার কাছে গোপন কিছু নাই
তোমার পূজায় সাহস এত তাই
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি
অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ"
'সুষমা'
'সুষমা'
তেলই
আধুনিক
রুচি

রিক্তা

ফিল্ম কর্পোরেশনের
সামাজিক ছবি
রূপবাণীতে
চলিতেছে !

রাধা ফিল্মসের
পৌরাণিক ছবি

বামনাবতার

আসিতেছে !

ফোন : বি, বি, ১১৩
গ্রাম : রূপবাণী

রাধা ফিল্মসের

দ্রৌপদী

পৌরাণিক ছবি !

ফিল্ম কর্পোরেশন
অব্ ইণ্ডিয়ার
আগতপ্রায় চিত্রকাহিনী

তটিনীর বিচার

যে সব
ছবি
দেখিবার
জন্য
দর্শকসাধারণ !
অত্যন্ত ব্যগ্র

নিউ থিয়েটার্সের
কৌতুকরসমধুর চিত্রকথা

রজত-জয়ন্তী

যে চিত্রগৃহেই দেখান, তাহার পাঁচ মাইল দূরে বসিয়াও আপনি দর্শকদের হাসির কলধ্বনি শুনিতে পাইবেন।

নূতন ছবি
নূতন ছবি

নিউ থিয়েটার্সের আর একখানি নূতন ছবি 'বড়দিদি'র
যশস্বী পরিচালক অমর মল্লিকের পরিচালনায়

কুঙ্কুম দি ড্যান্সার

সাগর মুভিটোনের
বাঙলা ও হিন্দী ছবি
পরিচালক : মধু বোস
শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বোস

সোল-ডিষ্ট্রিবিউটর্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড

রূপবাণী-বিলডিংস ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

কার্ত্তিক ১৩৪৬

mothers are not MARTYRS!



ON the proper care of the expectant mother and t..e child to come hang issues of supreme happiness or supreme sorrow. Both in the pre-natal and post-natal stages of maternity the health of the mother must be adequa:ely sustained and conditioned to stand, unimpaired, the strain of motherhood.

LADCOVINE

A PORT WINE TONIC

Manufacturea under strict Excise Supervision. Contains, besides the best Port Wine, a number of carefully selected ingredients that eliminate physical and nerv›us tension during the pre-natal and post natal periods.

TITAN OF TONICS

In the Hour of Trial.

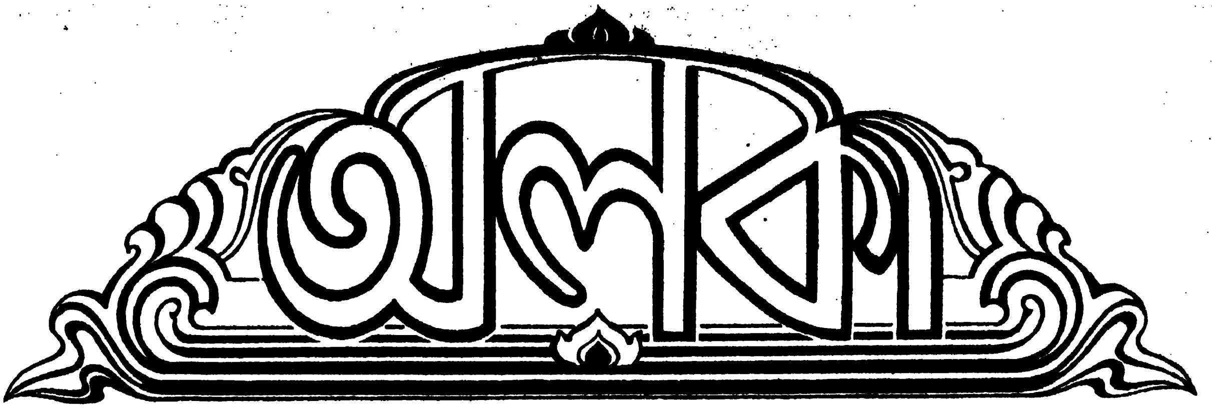
THE LISTER ANTISEPTICS & DRESSINGS Co. (1928), Ltd.,

COSSIPORE, CALCUTTA.





শকুন্তলা



দ্বিতীয় বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৬ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালী হিন্দু

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১)

বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ইংরেজী-শিক্ষিত উপরের স্তর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এ চাঞ্চল্যের কারণ বাইরের আঘাত, সুতরাং ও অংশের সজীবতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসন-আমলে সে বিদেশী শাসন তার অধীন দেশের লোককে যতটা সুযোগ দিয়েছিল তার ষোল-আনা সুবিধা নিয়েছিল উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু। রাজার দেশের ভাষা শিখে, এবং মোগল-শাসন ও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মিশিয়ে কর আদায় ও শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষার যে প্রকাণ্ড ও জটিল শাসন-যন্ত্র ইংরেজ এ দেশে আমদানি ক'রেছে তার মোটা কলকব্জাগুলো চালাবার বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে তার প্রতিষ্ঠা ও চলার কাজে সে কম সাহায্য করে নি। এই মিস্ত্রিগিরির মজুরি সে যা পেয়েছে তাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণী বাঙ্গালী হিন্দুর এ দেশে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের বাস্তব ভিত্তি। বাঙ্গালী হিন্দু যে এই নূতন ভাষা ও বিদ্যায় সহজেই নিজেকে রপ্ত ক'রে তুলেছিল তার এক কারণ তার মনে অতীত গৌরবের এমন কোনও স্মৃতি ছিল না যার অভিমান এর বাধা জন্মাতে পারে। বৃটেনের রাজতক্ত-দখল সে সানন্দেই বরণ করেছিল। আর পাটনা থেকে পেশোয়ার, কটক থেকে মধ্য-ভারত ইংরেজের বিজয়-নিশানের পিছু পিছু সে ছুটেছিল—হাতে কলম, বগলে ইংরেজী বিদ্যা শেখাবার পুঁথি। বিজিত দেশে নব শাসন-রীতি চলতি করতে, আর সে বিদ্যায় সে দেশের লোকের হাতে খড়ি দিতে। কেরাণীগিরি ও গুরুগিরির এই একচেটে ব্যবসায় উত্তরাপথ জুড়ে বাঙ্গালী হিন্দুর বহুদিন কায়েম ছিল। আজও সেখানকার বড় বড় সহরে তার ধ্বংশাবশেষ আমাদের আপসোস ও আস্ফালনের খোরাক যোগাচ্ছে। স্বভাবতই এ 'মনপলি' ছিল সাময়িক; আর তা না হ'লে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হ'তে হ'তো। যে মাস্টার আশা করে ছেলেরা স্কুলের বিদ্যা শেষ ক'রে নিজেরা কখনও মাস্টার হবে না, নিরাশ তাকে হ'তেই হয়।

কিন্তু এইটুকুই পুরো সত্য নয়। রাজশাসনের সঙ্গে সঙ্গে নব ইউরোপের যে সব ভাব ও বিদ্যা ইংরেজ এ দেশে এনেছিল, সাংসারিক সুবিধার উপায় স্বরূপে ছাড়াও বাঙ্গালী হিন্দুর তা মনে হয়েছিল পরম উপাদেয়। কারণ যাই হউক হিন্দু বাঙ্গালীর মনে এমন কিছু ছিল যা এদের অনুকূল। সেইজন্য রামমোহন রায়ের মত আশ্চর্য্য মানুষের বাঙ্গালায় আবির্ভাব হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মত প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত এ নব বিদ্যা ও ভাব প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। এবং প্রথম প্লাবন কেটে গেলে দেখা গেল যে বাঙ্গালীর মন এ বন্যায় ডুবে মরে নি, উর্ব্বর হয়েছে। ফলে ইংরেজ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য—যা আধুনিক ইউরোপের প্রধান সাহিত্যগুলির তুলনায় নানা দিকে ছোট, কিন্তু কেবল সেই তুলনাতেই ছোট। কারণ ভারতবর্ষ কি এশিয়ার আর কোথায় এর তুল্য মূল্য আধুনিক সাহিত্য আজ নেই। এ সাহিত্যের একটা প্রধান বাণী নব ইউরোপের মুক্তির বাণী—মনে, সমাজে, রাষ্ট্রে। বাঙ্গালার এই মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালী হিন্দু ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে বার্ত্তা প্রচার করেছে, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় চেষ্টার দুরূহ পথে সাহস, নিষ্ঠা ও ত্যাগের যে আদর্শ দেখিয়েছে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম্মে তা ভারতবর্ষের নবজন্ম। বৃটিশ-শাসনের কলের মজুরি কেমন ক'রে করতে হয় বাঙ্গালী হিন্দু অর্দ্ধেক ভারতবর্ষকে তা শিখিয়েছিল, ভারতবাসীকে মানুষের মত বাঁচতে ও মরতে হ'লে ও কলের যে বদল দরকার এ জ্ঞানেও বাঙ্গালী হিন্দু ভারতবর্ষকে দীক্ষা দিয়েছে। প্রথম গুরুগিরির পুরস্কার সে ইংরেজের হাতে পেয়েছে। দ্বিতীয় গুরুগিরির দণ্ড-ও হাতে না পেলে প্রমাণ হ'ত সে গুরুগিরি নিস্ফল হয়েছে।

(২)

নিস্ফল কিন্তু হয় নি। ভারতবাসীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় চেতনা ভারতবর্ষে ইংরেজের সর্ব্বময়ত্বের অবসান সূচনা করেছে। ওর পরিপুষ্টিতে তার ধ্বংস। এ চৈতন্যের প্রধান উৎস যে বাঙ্গালী হিন্দু তাতে অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর মনে যে মোহই থাকুক ইংরেজের মনে কোনও সংশয় নেই। এই উৎসের মুখ বন্ধ করতে সাম্রাজ্যভোগী বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের যে চেষ্টা হবে তা স্বাভাবিক। এ শতাব্দীর প্রথমে সে চেষ্টা হয়েছিল বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় জীবনকে দু-ভাগ ক'রে। ফল হ'ল উল্টো। রুদ্ধ স্রোত বাধাকে ঠেলে ফেলে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল—যার গতিবেগে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও চেষ্টা আজকের খাদে প্রবাহিত হচ্ছে। এইবার চলেছে দ্বিতীয় চেষ্টা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর অবস্থা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা আজ এমন হয়েছে যে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণের পূর্ব্বরীতির বদল হয়ে উঠেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন। আশা আছে ওর ভিতরটা বহাল রেখে চেহারাটা বদলে দিলেই এখনকার মত কাজ চলবে। বৃটিশ শাসকেরা যখন এ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 'রিফর্মে'র কথা বলেন তখন সম্ভব তাঁদের মনে থাকে কথাটার ধাত্বর্থ—'ফর্ম' অর্থাৎ আকারের পরিবর্ত্তন। আর যদি বাধ্য হয়ে বাইরের আকারের সঙ্গে ভিতরের উপাদানেরও রদ-বদল ক'রে ভারতবাসীর সঙ্গে রফাই করতে হয় তবে বাকি ভারতবর্ষের মন থেকে বাঙ্গালী হিন্দুর

রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব দূর হ'লে আপোষ-নিষ্পত্তিতে বর্ত্তমান সুবিধার অনেকটাই বজায় থাকবে ব'লে ইংরেজের বিশ্বাস। বাঙ্গালী হিন্দুর 'একষ্ট্রিমিজ্‌ম্‌' বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষের 'সুইট' ও 'রিজিনেব্‌ল' হবার আশা আছে। সেইজন্য 'রিফর্মে'র শেষ কিস্তিতে বাঙ্গালী-হিন্দুকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হ'য়েছে বাঙ্গালী মুসলমানের ভোটের চাপে। বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। তার ফলেই বাঙ্গালার রাষ্ট্র-পরিষদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় আসবে বেশী, এবং তাতে বাঙ্গালী-হিন্দুর রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও অন্য প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবে 'রিফর্ম'-কর্ত্তারা এই ভরসাতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। বাঙ্গালী-হিন্দু যে ডেমক্রেসির বচন আওড়ায় তার পাটিগণিতের মারে তাকে কাবু ক'রে মজা দেখার লোভেও নয়। তাঁদের মনে এ আশঙ্কা ছিল যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে হিন্দু-মুসলমান মিশিয়ে দিলে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানির চেয়ে রাষ্ট্র ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের কাছে বাঙ্গলা দেশ বড় হয়ে উঠতে পারে। আর 'ওয়াইলি' হিন্দুকে বিশ্বাস কি! সেইজন্য গড়তে হয়েছে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-মণ্ডলী। যাতে মুসলমান যে পরিষদে আসবে সে বুঝবে মুসলমান ব'লেই সে সেখানে এসেছে। সে মুসলমানের প্রতিনিধি দেশের নয়। আর যারা তাকে পাঠাবে তারাও জানবে রাষ্ট্রব্যাপারে তারা বাঙ্গালী নয় তারা মুসলমান ; প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে এক নয়, যদিও তাদের ভাষা এক এবং রক্তও এক, আর দুঃখ-সুখের ভোগও এক। এখানেই শেষ নয়। নষ্টের গোড়া গোটা বাঙ্গালী-হিন্দু-সমাজ নয়, উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু। সুতরাং প্রয়োজন হয়েছে উচ্চ হিন্দু ও অনুচ্চ হিন্দুর মধ্যে প্রাচীর তোলা যাতে উচ্চবর্ণ বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গলা দেশে একঘ'রে হয়। মহাত্মার উপবাস দৈব সুযোগ ; ইংরেজের আর পাঁচটা সৌভাগ্যের মধ্যে একটা সৌভাগ্য।

(৩)

বৃটিশ যুগের প্রথম আমলে পশ্চিমের নূতন ভাব ও বিদ্যার দিকে বাঙ্গালী-হিন্দুর মত বাঙ্গালী-মুসলমান ঝুঁকে পড়ে নি। কতকটা রাজ্যাপহারী ইংরেজের উপর আক্রোশে, কতকটা সংস্কারান্ধ মৌলভি-মৌলানার বিরোধিতায়। ফলে আধুনিকতার যে নদীতে বাঙ্গালী-হিন্দু স্নান করেছে, বাঙ্গালী-মুসলমান তখন তার জলে নামে নি। প্রচলিত ধর্ম্ম ও সংস্কারকে বাঙ্গালী-হিন্দু যেমন যুক্তির বিচারে যাচাই করতে সাহস করেছে, বাঙ্গালী-মুসলমান তা পারে নি। মুসলমান রামমোহন কি মুসলমান বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা দেশে সম্ভব হয় নাই। এই আধুনিকতা-বিরোধী, ইংরেজী-শিক্ষা পরাম্মুখ সম্প্রদায়ে আর্থিক সুতরাং সামাজিক বিপ্লব ঘটলো যখন ইংরেজের আপিস-আদালতে ফার্সীর বদলে প্রচলন হলো ইংরেজী ভাষার। মুন্সী মৌলভির হাতের কাজ চ'লে গেল ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুর হাতে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটা বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ'ড়ে উঠলো—যাদের যে শিক্ষা আন্‌লো হাতে অর্থ, সেই শিক্ষায় করলো মনকে সজীব। মুসলমান হ'য়ে পড়লো দরিদ্র এবং মনে অচল। আধুনিক কালে যখন বাঙ্গালী-মুসলমানের চেতনা হলো, এবং নব-শিক্ষায় তারা শিক্ষা পেতে লাগলো তখন রাজ-দরবার ও রাজ-সরকারের দেশী লোকের জায়গা

হিন্দুর দখলে এবং ইংরেজী বিদ্যায় উপার্জ্জনের আর যে সব পথ খুলেছে সেখানে হিন্দুর ঠাসাঠাসি ভীড়। নব-ব্রতী মুসলমানের ওস্তাদ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাথা গলান কঠিন।

বাঙ্গালী-মুসলমান সমাজের এই অবস্থায় রিফর্মের শেষ চালের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি। নব-শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী-মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় এখনও অতি অল্প। যদি হিন্দুর সঙ্গে বিনা প্রতিযোগিতায় কেবল মুসলমানত্বের খাতিরে, শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে নয়—মুসলমান সমাজের নিরক্ষরত্বের পরিমাণে শিক্ষা-সাপেক্ষ সরকারি চাকরি ও সরকার-অনুগৃহীত অর্থাগমের অন্যান্য উপায় মুসলমানের হাতে আসে তবে এই অল্প-সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের অনেকেরই একটা হদিস হয়। বাঙ্গালী-মুসলমানের দারিদ্র্য কমে, শিক্ষিত মুসলমানের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের পথ হয়, দেশে বাঙ্গালী-মুসলমানের প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়ে। শুধু যোগ্যতার জোরে যে মুসলমান দেড়তলা উঠতে পারে না, সাম্প্রদায়িক লিফ্‌টে সে অনায়াসে তেতলা উঠে যায়। এ লোভ কম লোভ নয়। সুতরাং বাঙ্গলার রাষ্ট্র-সভায় যে ইংরেজেরা রয়েছেন প্রাপ্যের বহুগুণ সংখ্যায় রিফর্মের 'পলিসি' 'ইম্‌প্লিমেণ্ট' করতে তাদের আওতায় মুসলমান সভ্যদের যেই কিঞ্চিৎ আধিপত্য হয়েছে অমনি চড়া সুর উঠেছে মুসলমানের বিশেষ স্বার্থের। স্থানে এবং অস্থানে মুসলমান ধর্ম্মে ধার্ম্মিকের সংখ্যার অনুপাতে ভাগ-বাটোয়ারার দাবী চলেছে,—যা কখনও করুণ কখনও কমিক। এর যুক্তি এক সময় বাঙ্গালী-মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য—যাকে অ-মুসলমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলা অন্যায়, অন্য সময় বাঙ্গালী-মুসলমানের পৌরুষ—যা রাজার জাতিতেই কেবল দেখা যায়। কখনও মুসলমানের বৃটিশ-রাজভক্তির কাহিনী, কখনও আরবদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভাগকে আঁকড়ে থাকতে হবে প্রাণপণে, এবং সবখানে চাই তার প্রসার—মন্ত্রীগিরি থেকে পেয়াদাগিরি পর্য্যন্ত। এবং এই ভাগাভাগির মূল মালিক ইংরেজকে রাখতে হবে হাতে, কখনও চোখ রাঙিয়ে, কখনও চোখ নামিয়ে ; এবং সব চেয়ে বড় কথা তার স্বার্থে ঘা না দিয়ে। তবে খোদার মেহেরবানিতে এমন দিনও আসতে পারে যখন বাঙ্গলা দেশের চাকরি-বাকরি মুসলমানের হবে একচেটে, যেমন এককালে বাঙ্গালী-হিন্দুর ছিল। মোট কথা বাঙ্গালী-মুসলমানের চাকরি চাই—চাকরি, আরও চাকরি।

(৪)

উচ্চ-বর্ণের বাঙ্গালী-হিন্দু যে ক্ষোভে ও আশঙ্কায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি! যে ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙ্গালী-হিন্দুর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক এই চাকরি তাদের প্রাণস্য প্রাণঃ। সরকারি চাকরি, আধা-সরকারি চাকরি, সরকারকে যারা চালায় এবং সরকার যাদের জন্য চলে, সেই ইংরেজ-সওদাগরের চাকরি। এ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এই চাকরিতে, চাকরিতেই তা বেঁচে আছে, এবং চাকরির লোপে তার বিলোপের ভয়। আর এ চাকরিই যখন অন্ন তখন বাঙ্গালী হিন্দুর মন ও আনন্দ যে আধুনিক 'কালচারের' ফুল ফুটিয়েছে তার রসও আসছে সেখান থেকেই। সে 'কালচারে'র ভাল-মন্দ যা-ই থাকুক ভারতবর্ষে তা অদ্বিতীয়। এ সব চাকরির উদ্দেশ্য টাকা উপার্জ্জন হ'লেও তার

কতকগুলি বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রে সার্থক করার সুযোগ, সুতরাং আত্মতৃপ্তির মূল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির হেতু। এই চাকরির যা এখন বাঙ্গালী-হিন্দুর হাতে আছে তার অধিকাংশ অন্যের হাতে যাবার সম্ভাবনায় উদ্বেগ ও আশঙ্কা স্বাভাবিক। এবং এমন লোকের হাতে যদি যায় তুলনায় যাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা কম তাতে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

সুতরাং এর প্রতিকারের ডাকে ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দু-বাঙ্গালীর বড় রকম সাড়া পাওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি বন্ধ করতে হবে। সব অনিষ্টের মূল কারণ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন তুলতে হবে। সে জন্য বাঙ্গালী-হিন্দুর একজোট হওয়া চাই। জাতীয় কংগ্রেসের অন্য প্রদেশের লোকেরা, যাদের অধিকাংশ হিন্দু, তারা যখন বাঙ্গালী-হিন্দুর এ বিপদকে ভারতবর্ষের বিপদ মনে ক'রে সর্ব্বস্বপণ করছে না তখন প্রয়োজন হ'লে বাঙ্গালী-হিন্দুর কংগ্রেস থেকে স'রে দাঁড়াতে হবে, 'হিন্দু মহাসভার' নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। ভারতবর্ষের অন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিলে সঙ্ঘ গড়তে হবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' মোট কথা ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার মুসলমান যেমন হয়েছে কমুন্যাল হিন্দুস্থানের এবং বাঙ্গালী হিন্দুকে হ'তে হবে তেমনি কমুন্যাল,—কথায় না হোক মনে এবং কাজে। মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন যে দেশের হিতের জন্যই 'মোসলেম লিগে'র কর্ত্তাদেরও সেই বুলি। বাঙ্গালী-হিন্দুর এই নব-লব্ধ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এ সব বক্তৃতায় প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হয়, এবং বক্তার নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সব সময় উহ্য থেকে যায় বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় বেশী। বাঙ্গালী-হিন্দু যদি বাঙ্গালী-মুসলমানের কমুন্যালিজমের আঘাতে ও অনুকরণে তাদের মতই কমুন্যাল হয় তবে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি না ক'মে অবশ্য বেড়ে যাবে। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ঘাত-প্রতিঘাতে দু পক্ষের সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিই হবে। দলাদলি ক'রে দলাদলি কমে না, বেড়েই যায়। এমন অবস্থায় যদি কমুন্যাল ইলেক্‌টোরেটের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ডেমক্রেটিক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা হয় তাতে কিসের ভরসা যে মুসলমান নির্ব্বাচিত হবে এখনকার চেয়ে কম সংখ্যায়, বা যারা হবে তাদের কমুন্যাল মনোবৃত্তি হবে বর্ত্তমানের চেয়ে কম। এবং তা না হ'লে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও বিশেষ স্বার্থের দাবী কেন দূর হবে, আর হিন্দুর হিত বা দেশের হিত সিদ্ধ হবে কেমন করে! দেশের মন যদি থাকে কমুন্যাল পুরো ডেমক্রেটিক নির্ব্বাচনের ফলে ঘোর কমুন্যাল রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি কিছু অসম্ভব নয়। যারা আশা করেন মিশ্র নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতায় মুসলমানকে কুড়তে হবে হিন্দুর ভোট আর হিন্দুকে খুঁজতে হবে মুসলমানের ভোট, সুতরাং যারা ঘোর কমুন্যাল তারা বাদ পড়বে, যারা মধ্যপন্থী তারাই হবে নির্ব্বাচিত—তাদের নিরাশ হতে দেরী হবে না। রাগদ্বেষ যখন প্রবল থাকে তখন ও রকম ভোট ভাগাভাগি বেশী হয় না। তখন হিন্দুয়ানির ডাকে হিন্দু দেবে হিন্দুকে ভোট, মোসলেমের ডাকে মুসলমান দেবে মুসলমানকে ভোট। যারা উৎকট মুসলমান ও উৎকট হিন্দু তারাই যেতে পারবে প্রতিনিধি হ'য়ে, আপোষপন্থী কাফের ও অনার্য্য হবে একঘ'রে। এবং খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি মুসলমানের এই মিশ্র-নির্ব্বাচনের এমন পরিণতি হতে পারে

যে বাঙ্গালী-হিন্দুকে ছুটতে হবে ইংরেজের দরবারে—ডেমক্রেটিক কুত্তা বুলিয়ে নেবার আর্জি পেশ করতে।

(৫)

বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীক দল গড়ার স্পষ্টার্থ দু পক্ষের পাল্লা দিয়ে ইংরেজের আনুগত্য করা। আমরা হিন্দু কারও অহিত করতে চাই না, শুধু চাই নিজেদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে; আমরা মুসলমান কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না কেবল নিজেদের ন্যায় সঙ্গত দাবীর পুরণ চাই—এ বুলিতে সত্য উল্টে যায় না। সে সত্য হচ্ছে ধর্ম্ম-মতের তফাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে অবান্তর। যেখানে পরাধীন দেশে সেই ভেদকে করতে হয় স্বতন্ত্র অধিকারের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা সেখানে এই বিরুদ্ধ স্বার্থের 'ব্যালান্স' রক্ষার ভার যাবেই যাবে তৃতীয় পক্ষের হাতে। সে তৃতীয় পক্ষ নিরাসক্ত মধ্যস্থ নয়। নিজের দিকে পাল্লা ভারি করতে এমন কি মাপ সমান রাখতে তাকে খুসি করতে হবে। তার দাম আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী-হিন্দু যদি সে দাম দিতে রাজী থাকে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারে। সে দাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কথায় না হোক কাজে হতে হবে তার পরিপন্থী। এ-দেশে ইংরেজের যে শক্তি ও সুবিধা আছে তাকে বহাল রাখতে, এবং বর্ত্তমানে তার যেটুকু লাঘব হয়েছে তার পুরণে ইংরেজের পুরো সহায় হতে হবে। বাঙ্গালী-হিন্দুর বুদ্ধির উপরে ইংরেজের কিঞ্চিৎ আস্থা আছে। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ বিজয়ে তার এই সাহায্য ইংরেজ স্বীকার করলেও করতে পারে। এবং তার বিনিময়ে ছোট-বড় চাকরি ও আনুষঙ্গিক প্রভাব-প্রতিপত্তির আর্জি হয় ত মঞ্জুর হবে। বাঙ্গালী-হিন্দুর স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষায় হিন্দুর এক জোট হওয়ার যে ডাক সে এই পথে চলার ডাক। কিছু কাজ আরম্ভ হ'লেই তা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন বাঙ্গালী-হিন্দু দেখেছে ও ভারতবাসীদিগকে দেখিয়েছে। সে আদর্শের অনুসরণে মৃত্যুপণ তার নিকট—অতীতের ইতিহাস। সে আদর্শ ও ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রে খণ্ড খণ্ড স্বার্থের রক্ষায় বিদেশীর চিরপ্রভুত্বই কি সে বরণ করবে? গোয়ালন্দের পদ্মা কি হরিদ্বারের ঘাটে ফিরে যাবে, মহাতীর্থের পুণ্যলোভে? আমাদের যৌবনে স্বদেশীয় যুগে আমরা একটা গান গেয়েছি, যার ভাবার্থ—মার দিয়ে দেশকে ভুলাবে আমরা দেশের তেমন ছেলে নই। হাতের মারে আমরা দেশকে ভুলি নাই, ভাতের মারের ভয়ে ভুলি কিনা তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গালী-হিন্দু পাস না ফেল?

(৬)

তবে এ সাম্প্রদায়িক মহামারী থেকে দেশেকে বাঁচাবার কি উপায় নেই? আছে না আছে স্থির করতে এ রোগের নিদান জানা চাই। রোগ জানলেই যে তার ঔষধ আছে এমন নয়, কিন্তু রোগ-নির্ণয় না হ'লে চিকিৎসার চেষ্টাই চলে না—হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক

রোগের ব্যাসিলাই উৎপত্তির প্রধান বীজাণু-ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের চাকরির দ্বন্দ্ব, চাকরি এবং প্রতিপত্তি, চাকরির ফলে প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তির ফলে চাকরি দেশের অশিক্ষিত ও অচাকুরে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ, যাদের নামে এবং ভরসায় এই দ্বন্দ্ব চলে, তারা করে এতে লাঠিয়ালি বিনা পেট-ভাতায় নিজের খেয়ে। এই লাঠালাঠিতে তাদের নিজের হিত কিছুমাত্র নেই, অহিত আছে ষোল আনা, দেশের সকল উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে বা বিপথে চ'লে। ধর্ম্মের নামে অন্ধ উত্তেজনায় এই অজ্ঞানদের নিজের ভালমান্দ-বোধ লোপ হয়, আর সে উত্তেজনার সৃষ্টি করে শিক্ষিত মুসলমান ও শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের শ্রেণীর সাংসারিক স্বার্থ ও সাংসারিক ক্ষমতা হাসিল করার অভিসন্ধিতে।

কমুন্যাল রোগের এই নিদান। অন্য সব কারণ এই মূল থেকেই পুষ্টি পেয়ে রোগকে জটিল ক'রে তোলে। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা দেশের জনসাধারণকে—মুসলমান চাষী ও হিন্দু চাষীকে মুসলমান কারিকর ও হিন্দু কারিকরকে, মুসলমান মজুর ও হিন্দু মজুরকে—পলিটিকাল দল গড়তে শেখান পলিটিকাল আদর্শ ও উপায়ের ভিত্তিতে। কলমা পড়া ও গায়ত্রী জপার ভেদও সাম্য দলে টানার ফন্দি ও ফাঁকিতে তাদের সচেতন করা। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যেদিন নিজের স্বার্থ মোটামুটিও বুঝবে, যেদিন পলিটিক্সে দীন্-এর তত্ত্ব ছেড়ে দুনিয়ার তথ্যে চোখ যাবে—শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের চাকরি প্রতিপত্তির ঝগড়ার সেই দিন সমাপ্তি হবে। কারণ যে খুঁটির জোরে লড়াই সে আর খুঁটিগিরি করতে রাজী হবে না। কলমা-গায়ত্রীর চাকরি ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব দেশ তখন বরদাস্ত করবে না। চাকুরে হিন্দু-মুসলমানের কমুন্যাল বিষ ছড়ান বন্ধ হবে না—যতদিন না অচাকুরে জনসাধারণের নিজেদের পলিটিক্স সে বিষের থলি উপড়ে ফেলে। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান অন্যোন্যের যুদ্ধসজ্জার ভয়ে বা যুদ্ধান্তে নিজেরাই চাকরি প্রতিপত্তির একটা রফা নিষ্পত্তি ক'রে দেশের বড় কাজে হাত দেবে সে আশা দুরাশা। চাকরির কামনা চাকরিতে শান্ত হয় না, যত পাওয়া যায় লোভ ততই বাড়ে। 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' কমুন্যাল রোগের চিকিৎসা দেশের চাকরি-পন্থীদের হাত থেকে দেশের পলিটিক্সকে ছিনিয়ে নেওয়া।

এ কাজ কঠিন। এ পথ চড়াই উৎরাই-এর বিষম পথ, যার মোড়ে মোড়ে বিপদ। এ পথে প্রকাশ্য ও গোপন, মুসলমান ও হিন্দু শত্রুর অবধি থাকবে না—স্বার্থনাশের যাদের আশঙ্কা। যাদের মধ্যে কাজ এবং যাদের জন্য কাজ তারাই সন্দেহ করবে ও মারমুখ হবে। তাদের উত্তেজিত করার লোকের অভাব হবে না। কমুনিষ্ট ব'লে পুলিশ লেলিয়ে দেবার কমুন্যালিষ্ট জুটবে অনেক। এ কাজের উপায় মানুষের বুদ্ধিকে জাগান, অন্ধ সংস্কারকে উস্‌কান নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ সে মানুষের দলের অধিকাংশ যখন নিরক্ষর অজ্ঞান। এ কাজের যারা কর্ম্মী তাদের চেতন ও অবচেতন মনকে করতে হবে সকল রকম সাম্প্রদায়িক রাগদ্বেষের কলুষমুক্ত। এবং আচার ব্যবহারে যারা ভিন্ন তাদের সঙ্গে শত্রুতায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে তীব্র মাদকতা তাতে মাতাল হওয়ার আনন্দ এতে নেই। বহু শ্রমে ফল ফলবে অল্প, বহু ডাকে সাড়া দেবে অল্প লোক। আশা-ভঙ্গ হবে পদে পদে। তবুও এই পথই পথ, আর সব অন্ধগলি।

এ পথেও সিদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়। জাতির এমন দুর্দ্দিন আসে যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র

লোভ, অন্ধ বিদ্বেষকে দূর ক'রে তার শুভবুদ্ধি কিছুতেই জাগে না। ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার যদি এমন দুর্ভাগ্যই হয়, যদি জাতীয়তার কোনও মন্ত্রেই সাম্প্রদায়িক বিষ ধ্বংস না হয়—তবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পাল্টায়, তার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হয়তো অনিবার্য্য হবে। কিন্তু তাতে উৎসাহের কিছু নেই; সে আমাদের পরাজয়। এমন প্রাণী আছে পারিপার্শ্বিক যখন তাদের স্বাভাবিক জীবনলীলার প্রতিকূল হয় তখন উঁচু স্তরের প্রাণীর উপযোগী শরীরের যন্ত্রপাতি লোপ হ'য়ে তারা ধাপে ধাপে নেমে যায় আদিম ভ্রূণের পিণ্ডাকার অবস্থায়—শুভদিনের অপেক্ষায়। তবুও বেঁচে থাকে। সে বাঁচা জীবন্মৃত্যু, হিন্দু স্মৃতিকারেরা যাকে বলেছেন জীবন্ত শব। 'জীবিতা এব শবাস্তে তস্মাৎ পারশবা স্মৃতাঃ'। জাতির পারশবত্ব প্রাপ্তি জয়ধ্বনির কারণ নয়।

কমুন্যাল-সমস্যা মীমাংসার অন্য উপায় যে কল্পনা করা যায় না তা নয়। ভারতবর্ষের বাইশ কোটি হিন্দু আট কোটি মুসলমানকে দমিয়ে ইংরেজকে তাড়ালে, অথবা আট কোটি মুসলমান বাইশ কোটি হিন্দুকে দাবিয়ে ইংরেজকে খেদালে এ সমস্যার অবশ্য মীমাংসা হয়। হিন্দু-মহাসভার ভীষ্ম-দ্রোণেরা ও মোস্‌লেম লিগের সিংহ-ব্যাঘ্রেরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে যে শক্তিতে তা সম্ভব চাকরি ভাগাভাগির উৎসাহে তার সৃষ্টি হয় না। ভাতের চুল্লীর আগুনে ড্রেড্‌নট চলে না।

(৭)

উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী-হিন্দুর চাকরি ও প্রতিষ্ঠার উপর মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অভিযানের একটা সুফল ফলেছে। উচ্চহিন্দু যে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ক্ষুদ্র অংশ সে চেতনার সুরু হয়েছে। ভাব ও চিন্তার প্রচার অল্প লোকে করা যায়, তার সৃষ্টি করে আরও অল্প লোক, চাকরি ও প্রতিপত্তি প্রার্থী লোক অনেক হ'লে বিপদ—কিন্তু সংখ্যার চাপ যেখানে প্রয়োজন সেখানে দল বড় না হ'লে কাজ হয় না। বাঙ্গালী হিন্দুর এই সংখ্যা আছে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মধ্যে নয়, নীচু জাতি হিন্দুর পল্লীর ভিতরে। সুতরাং উচ্চ বর্ণের হিন্দু মুখে এনেছে যে উঁচু নীচু সব হিন্দু আমরা পরস্পরের ভাই। আমরা ভিন্ন নই, আমরা এক। এই নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর প্রাণ-শক্তি যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে, অর্থহীন ও আত্মঘাতী আচারের নাগপাশে যে তাদের হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম, জীবনকে পঙ্গু ক'রে মৃত্যুকে ঘনিয়ে আনার যতরকম ফন্দী দিনের পর দিন যে তারা আবিষ্কার ক'রে চলেছে—সে দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। এরা যে কত দুর্ব্বল, নিজের শক্তিতে কত আস্থাহীন, যেখানে এরা সংখ্যায় অল্প এবং যেখানে এরা সংখ্যার বেশী প্রতিবেশী দুর্দ্দান্ত মুসলমানের অত্যাচার যে এরা বিনা প্রতিকারে সহ্য করে, স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষায় হাত তুলতে ভরসা করে না—সে বার্ত্তাও আমাদের বিচলিত করতে আরম্ভ করেছে। এ সব ব্যাপার নূতন নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পর থেকে এদের আরম্ভ হয় নি। দু-চারটি সন্ন্যাসী গোছের প্রতিষ্ঠান ছাড়া উচ্চ-হিন্দুর ব্যাপক দৃষ্টি এতদিন এদিকে যায় নি। আজ যাচ্ছে নিষ্কাম প্রীতিতে নয়, নিজের গরজে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কোন আঘাতে চৈতন্য এলো সেটা মুখ্য নয়, আশার কথা যে ঘুম ভাঙ্গছে।

এর প্রতিকারের যে উপায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু ব্যবস্থা করছে তার নাম হয়েছে 'হিন্দু-সংগঠন'।

হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর নাড়ীর যোগ এমন দৃঢ় করতে হবে যে এক অঙ্গের আঘাতে সমস্ত শরীর ব্যথা পাবে এবং প্রতিবিধানে তৎপর হবে। অসহায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে ভরসা দিতে হবে, কথায় ও কাজে, যে তারা অসহায় নয়,—উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু, যাদের অর্থ আছে, বুদ্ধি আছে, বল আছে, তারা তাদের ভাই, আপদ বিপদে সহায়, দুঃখ-সুখের ভাগী। এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে এতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও উচ্চবর্ণের হিন্দুর আপদ বিপদকে নিজেদের আপদ বিপদ মনে করবে, সব কাজে তাদের অনুবর্ত্তী হবে, সংখ্যার প্রয়োজনে নিজেদের সংখ্যা দিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর অখণ্ড সংখ্যা বাড়াতে দ্বিধা করবে না।

যে 'সংগঠন' বাঙ্গালী-হিন্দুকে বড় ছোট অভেদে একগোষ্ঠি ক'রে গড়তে চায় তার প্রেরণা যে অবস্থার ফেরেই এসে থাকুক না কেন জাতির পক্ষে তা পরম মঙ্গলের। কিন্তু প্রথম উৎসাহের উত্তেজনার ফেনা প্রশমন হ'লেই দেখা যাবে যে, এ 'সংগঠনে'র যেসব পেটেণ্ট মাল-মশলার বিজ্ঞাপনে দেশের মনের দেয়াল ভর্ত্তি, গড়নের কাজ তা দিয়ে বেশী দূর এগোয় না। কারণ তাতে আর যা-ই থাকুক চূণ-সুর্কি নেই। ইট সাজান যায় কিন্তু তাদের জোড়া লাগান যায় না। যে আশ্চর্য্য ভ্রাতৃত্বে ভাই-এর স্পর্শ অশুচি, তার হাতের অন্ন অমেধ্য, তার সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ পাতিত্য আনে—সেই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব দিয়ে কোনও রকম ব্যবহারিক একত্ব-বন্ধন সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, মন্দিরের দ্বার মোচন, হাতের জল-চল—এ সব উপসর্গের চিকিৎসা, রোগকে বহাল রেখে। রোগ থাকতে উপসর্গ দমন করা যাবে কিনা সন্দেহ। আর যদি যায় তবে সে রোগ যে অন্য উপসর্গের আকারে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে তা নিঃসন্দেহ। হিন্দু-সমাজের সেই মূল রোগ হচ্ছে জাতিভেদের গণ্ডী। ওর অভেদ্য খোলার আবরণ সমস্ত সমাজে এক নাড়ীর যোগ স্থাপন অসম্ভব করেছে। 'হিন্দু-সংগঠন' যদি প্রকৃতই সে কাজ করতে চায় তবে ঐ গণ্ডী তুলতে হবে, ঐ খোলা ভাঙ্গতে হবে। জাতির খোপ খোপ যেমন আছে তেমনি থাকবে শুধু ভাই ব'লে ডাক শুনে সমস্ত হিন্দু হবে একমন একপ্রাণ—এ আশা নিজেকে বঞ্চনা করা, পরকে ফাঁকি দেওয়া। সামাজিক অসম্বন্ধের গভীর পরিখায় যে ভেদ সুস্পষ্ট নামের জোরে সে ভেদ অভেদ প্রমাণ হবে না, কলিতে নামের মাহাত্ম্য যতই প্রবল হোক। আর এ সব বর্জ্জন-মোচন আন্দোলনের মধ্যে যে মনুমেণ্ট-স্পর্শী দম্ভ রয়েছে কেবল শুনে শুনে গা সওয়া হয়েছে ব'লেই আমরা তাতে লজ্জা পাই নে। আমাদের স্পর্শ পেলে নিম্ন হিন্দু কৃতার্থ হবে এ রামচন্দ্রত্বের অভিনয় উচ্চবর্ণের হিন্দু করে কোন লজ্জায়। আমাদের দেবমন্দিরে ঢোকার অধিকারে চণ্ডাল হবে ধন্য দেবতার এ অপমান তারা করে কোন সাহসে যারা গর্ব্ব ক'রে বলে হিন্দুর 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

(৮)

এ প্রস্তাবে তর্ক উঠবে জানি—ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্রের তর্ক। এমন কোন প্রস্তাব আছে পণ্ডিত লোকে যাকে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য দুই-ই প্রমাণ করতে না পারে।

অতি বুদ্ধিমান লোকে বলে হিন্দু-সমাজে উঁচু জাত যে তার নীচু জাতের হাতে ভাত খায় না, তাদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ যে নিষেধ,—তার মধ্যে ঘৃণা অবজ্ঞার লেশ নেই। ওটা শুধু আচার, যেমন অনেক বিধবা মা ছেলের হাতের ছোঁয়া খান না। তফাত কেবল এই শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের মনোভাব ছেলের উপর মায়ের স্নেহ নয়, অন্তত শূদ্র তার কোন প্রমাণ পায় না। অন্য সমস্ত গুণ-

দোষ নিরপেক্ষ কেবল জন্মের ফলে একদল লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য দলের হীনত্ব জাতিভেদের ভিত্তি। মনু বলেছেন বটে যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত গুণ নেই সে হচ্ছে তেমনি ব্রাহ্মণ যেমন কাঠের হাতীও হাতী। কিন্তু সেই পুতুল ব্রাহ্মণেরও শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করলে জাত যায়, সে শূদ্রের যতই ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকুক না কেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ও অন্যের হীনত্বের ধারণা এক বস্তুর দুই পিঠ। একটি ছেড়ে অন্যটি থাকে না। জাত অল্প নীচু হ'লে তার উপর অবজ্ঞা, আর বেশী নীচু হ'লে তার উপর ঘৃণা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা যখন দু পক্ষের একান্ত অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন যে ঘৃণা করে তার সে মনোভাবে কোনও তীক্ষ্ণতা থাকে না, যে ঘৃণা পায় তারও অপমানবোধ থাকে না। ব্যাপারটা দু পক্ষের রোদ-বাতাসের মত স্বাভাবিক মনে হয়। দাসত্বের ইতিহাসে বার বার তা প্রমাণ হয়েছে। এটা ঘৃণার অভাব নয়, ঘৃণার চরম ও ভয়ঙ্কর পরিণতি। যাক এ মনস্তত্ত্বের তর্কে লাভ নেই। যাদের বাঁচিয়ে 'আচার' তারা একে অপমান ব'লে মনে করতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে যত বাড়বে এ অপমানবোধ তত বেশী হবে, এবং জাতের দেয়াল আঁকড়ে থাকলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হবে অনতিক্রমণীয়। এর লক্ষণ চার দিকে দেখা যাচ্ছে। 'হিন্দু-সংগঠনে' যারা উদ্যোগী একে উপেক্ষা করার তাদের উপায় নেই।

ইতিহাসের তর্ক কম নয়। এ জাতিভেদ ত হিন্দু-সমাজে হাজার হাজার বছর রয়েছে। আর হিন্দু-সভ্যতা আজও টিঁকে আছে। কোথায় অন্য সব প্রাচীন সভ্যতা! হিন্দু-সভ্যতা যে টিঁকে আছে, অর্থ তার যা-ই হোক, আর এক কালে যে সে সভ্যতা গৌরবের ছিল—সেটা জাতিভেদের ফল নয়, জাতিভেদ সত্ত্বেও—অন্যগুণে এবং পারিপার্শ্বিকের অনুকূলতায়। বাইরের আঘাত যেই প্রবল হয়েছে অমনি ঐ দুর্ব্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। শরীরে অনেক রোগের বীজ থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায়, শরীরের অন্য শক্তি যতদিন রোগের বীজ চেপে রাখতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক যতদিন বীজ থেকে রোগ প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী না করে। যখন তা ঘটে তখন জীবন-যাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, রোগ প্রতিষেধের বিশেষ উপায় করতে হয়। সহজ কথা অবস্থা বদলেছে, বাঁচতে হ'লে ব্যবস্থা বদলাতে হবে। সেইজন্য হিন্দুর 'স্মৃতি' বার বার বদল হয়েছে, এবং এক মুনির সঙ্গে অন্য মুনির মতের মিল নেই।

তর্কটা যখন পণ্ডিত লোকেই তোলে তখন দু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবান্তর নয়। হিন্দুর জাতিভেদের আজ যে চেহারা,—ভাতের হাঁড়ির শুচিতা, ও বিবাহে পাথরের বেড়া,—হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের দিনে তার এমন আকার ছিল না। আপস্তম্বের স্মৃতিতে দেখি পাকটা ছিল আর্য্যাশ্রিত শূদ্রের কাজ, কেবল নামটা দেওয়া হয়েছিল পাকযজ্ঞ। অনুলোম বিবাহ হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ পর্য্যন্ত চল্‌তি ছিল; স্মৃতিগ্রন্থের পাতায় নয়, সামাজিক ব্যবহারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক; হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ, অনেকের মতে সব চেয়ে গৌরবের যুগ যখন সে সভ্যতা সমস্ত এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বাণভট্টের বংশ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ। যার পরিচয়ে তিনি 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনা শ্লোকে বলেছেন যে, অনেক গুপ্ত রাজারা তাঁর পূর্ব্বপুরুষের পাদপল্লব অর্চ্চনা করেছেন। তাঁদের বাড়ীর পোষা শুকপক্ষীও ক্রমাগত

শুনে শুনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতো। সেই বাণভট্ট 'হর্ষ-চরিতে' বিনা দ্বিধায় লিখেছেন যে তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্মণী-পত্নীর পুত্র, কিন্তু তাঁর আর তুটি ভাই আছে যারা তাঁর পিতার শূদ্রা-স্ত্রীর সন্তান; তাদের নামও তিনি দিয়েছেন। সেদিনকার উচ্চ ব্রাহ্মণ-সমাজে যদি এমন বিবাহে বিন্দুমাত্রও দোষস্পর্শ থাকতো, বাণভট্ট সে কাহিনী কখনই লিখতেন না!

কিন্তু 'বায়লজি' কি এ প্রস্তাবের বিরোধী নয়? হিন্দু-সমাজে এই যে উঁচু-জাতি নীচু-জাতির ভেদ, এ কি কতকগুলি বিশেষ শ্রেষ্ঠ গুণকে রক্ত-মিশ্রণে লোপের আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে চিরকালের জন্য রক্ষা করার ব্যবস্থা নয়? এ ভেদ তুলে দিয়ে একাকার করলে কি বহুকালের এই গুণের পুঁজি তছরুপ হবে না? বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী-শূদ্রের দিকে তাকিয়ে, ও শিক্ষা সমান পেলেও তাদের বুদ্ধির তারতম্যে, যাঁরা জাতির তফাত দেখতে ও ধরতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় অসামান্য লোক! বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণের ফর্শা চামড়া, কটা চামড়া, কাক-কৃষ্ণ চামড়া; উঁচু নাক, খাঁদা নাক; লম্বা মাথা, গোল মাথা সব দেখেও তাদের রক্তের বিশুদ্ধতায় যাঁরা বিশ্বাস হারান না, তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতের দৃঢ়তাও অসাধারণ! মানুষে মানুষে ভেদ আছে, বুদ্ধির, শক্তির, নানা পটুতার—যা জন্মগত; কোনও শিক্ষার বলে সে ভেদ লোপ করা যায় না। এর চেয়ে স্পষ্ট সত্য আর কি আছে! কিন্তু যারা প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দুর জাতিভেদ মানুষে মানুষে এই স্বাভাবিক প্রভেদের রেখা ধ'রে নিজের গণ্ডী এঁকেছে তারা 'বায়লজির' নাম নেন বৃথা। 'বায়লজি' কেবল প্রমাণ করবে যে এই কল্পনার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের, সুতরাং বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। জাতি-ভেদ তুলে দিলে হিন্দু-সমাজ একাকার হবে না। অন্য আর সব সমাজের মত নানা স্বাভাবিক ভেদ বজায় থকেবেই। যেমন শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অশিক্ষিত পরিবারের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটবে কদাচিৎ। এবং শিক্ষিত হবার সামর্থ্যই প্রমাণ তুই পরিবারে জন্মগত গুণের অমিশ্রেয় প্রভেদ কিছু বর্ত্তমান নেই।

প্রাচীন হিন্দু আচার্য্যেরা জাতিভেদের গুহাহিত এই 'বায়লজি'র তত্ত্ব অবশ্য অবগত ছিলেন না। মনুর 'ভাষ্যে' মেধাতিথি প্রশ্ন তুলেছেন ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতির এই যে ভেদ—এ কেমন ভেদ? এ কি গোজাতি ও অশ্বজাতির যে দৃষ্ট ভেদ, তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায়, সেই রকম ভেদ? অবশ্য নয়; কারণ দেখে কেউ বলতে পারবে না কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র। সুতরাং এ ভেদ অদৃষ্ট শাস্ত্রীয় ভেদ, লৌকিক জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ কালের সনাতনপন্থীরা মীমাংসকদের লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের তফাত মানেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যায় সুবিধা পেলেই তাঁরা রাজী। প্রাচীন ঋষিদের অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তাঁদের অগাধ ভক্তি, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদের উপর তাঁদের অসীম অবজ্ঞা। কিন্তু ও বিজ্ঞানের কোনও কিছু তাদের সনাতন মতের সমর্থক মনে হ'লেই তৎক্ষণাৎ তা লুফে নেন। কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান তাঁদের সংস্কারগুলিকে, বিনা বিচারে ও বিশ্লেষণে। যদি ঋষি-বাক্য পাওয়া যায় ভালই। আর যদি জড়বাদী ম্লেচ্ছ বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া যায় সোভি আচ্ছা।

যাঁরা বলেন জাতিভেদ হিন্দু-ধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ, ওকে না মানলে ধর্ম্ম হানি হয়, এবং ঐহিকের সুবিধার জন্য পারত্রিক ক্ষতি মূর্খতা—তাঁদের সঙ্গে কোনও তর্কই নেই। বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু বাঁচুক কি মরুক সেটা বড় কথা নয়, জাতিভেদের শুচিতা রক্ষা তার চেয়ে অনেক বড়

কথা। তাঁরা সে শুচিতা সযত্নে রক্ষা করুন। তাঁদের অশূদ্রস্পৃষ্ট স্বর্গের দরজা কেউ অবরোধ করবে না।

(৯)

এতকালের অভ্যস্ত প্রথা বর্জ্জন করতে বহু-তর্ক ও বহু আন্দোলনের ফলেও সমস্ত বাঙ্গালী-হিন্দু একমত হবে সে আশা কেউ করে না। এবং এখানে ওখানে দুচার জন ন্যায় ও ধর্ম্ম-বোধে জাতি বর্জ্জন করলে তারা একঘরে হওয়া ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের উপরে তার অন্য ফল আর কিছু ফলবে না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে এ সংস্কার আনার পথ ওকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ করা। যারা মনে করে এবং আন্দোলন আলোচনার ফলে মনে করবে ও ভেদের লোপ জাতির জীবন ও পুষ্টির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন তাদের দল বেঁধে ওকে বর্জ্জন করতে হবে। হিন্দু থেকে ও হিন্দু-সমাজের মধ্যে থেকে জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রথম থেকেই সে দল ছোট হবে না, এবং তাকে একঘরে করার চেষ্টা হবে অর্থহীন। দলাদলি অবশ্যই আরম্ভে থাকবে কিন্তু মনে হয় বেশী দিন নয়। ও সংস্কারের মধ্যে সত্যের ও মনুষ্যত্বের যে ভিত্তি এবং প্রয়োজনের যে তাগিদ আছে তাতে অল্পদিনের মধ্যে বিরোধীরাই হবে একঘরে। এবং ফল দেখে চোখের ঠুলি একবার খুললে স্বাভাবিককেই মনে হবে স্বাভাবিক।

এ কাজ অবশ্য আরম্ভ করতে হবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর। জাতের গণ্ডী তারা না তুললে শুধু তাঁদের উপদেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নিজেদের সব অদ্ভুত ভেদ তুলে দেবে এ মনে করা মূঢ়তা। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনুকরণেই বাঙ্গালী নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে জাতির বিভাগ হচ্ছে আদিম cell-এর মত। এক হচ্ছে দুই, দুই হচ্ছে চার। এবং বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে বহু শ্রেণীর হিন্দু চলেছে লোপের মুখে। উপদেশ বৃথা। নিজেরা জাত তুলে দিয়ে জাত যে তোলা যায় তা দেখাতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়।'

জাতিভেদের উচ্ছেদে বাঙ্গালী-হিন্দু যে কেবল নিজেদের যথার্থ এক মনে ক'রে গাঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবে তা নয়। ঐ সংস্কারের চেষ্টায় ও ফলে তার মধ্যে যে শক্তি আজ রুদ্ধ আছে তা প্রকাশের পথ পাবে। এবং তাতে বাঙ্গালী-হিন্দুর হবে নবজন্ম, নবশক্তি ও নবদৃষ্টি নিয়ে। বাঙ্গালী-হিন্দু আধুনিক ভারতবর্ষকে ভাব ও আদর্শ কম দান করে নি। তার এ চেষ্টা সফল হ'লে ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর উপর তার ফল ফলতে দেরী হবে না।

(১০)

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ যুদ্ধ ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হবে, এবং ভরসা করেন তার ফলে মানুষের মধ্যে আসবে এক নবযুগ—'নিউ অর্ডার'। জাতির সঙ্গে জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের অত্যাচারী অত্যাচারিতের সম্পর্ক আর থাকবে না। পৃথিবীর মানুষ হবে

একগোষ্ঠি, সকলের দরদে হবে সকলে দরদী। এমন যদি ঘটে তবে কথাই নেই। কোথায় থাকবে বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, আর কোথায় থাকবে বাঙ্গালী-হিন্দুর জাতিভেদ ও দুর্ব্বলতা। মহাযুদ্ধের মহাম্যাজিকে ও সব ছোটখাট ব্যাপার কোথায় তলিয়ে যাবে লক্ষ্যই হবে না। বিনা চেষ্টায় আপনাআপনি হয়ে যাবে তাদের মীমাংসা।

মানুষের বাইরের ও মনের সভ্যতাকে ধাপে ধাপে টেনে তুলতে হয় প্রাণান্ত পরিশ্রমে। কখনও এক ধাপ উঠে আবার নীচে গড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমের শেষ নেই, আশা-ভঙ্গেরও অবধি নেই। যুগ-যুগান্তব্যাপী এই সংগ্রাম জয় হ'য়ে যাবে একটা মাত্র বিরাট হত্যাকাণ্ডে—কার না আকাঙ্ক্ষা যায় বিশ্বাস করতে! 'মিরাকেলে' বিশ্বাসের তাই ত মূল।

কুরুক্ষেত্রের ফলে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল। দাম্ভিক দুর্য্যোধনের রাজ্যহানি ও মৃত্যু, এবং মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের জয় ও রাজ্যলাভ এ ছাড়া সে ধর্ম্মরাজ্যের স্বরূপ কি ছিল বেদব্যাস কিছু বলেন নি।



ছোট ভাবী

শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আলোহীন শ্বাসরোধকর সাত দিনের বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিলের ফসলের মাথার উপর দুই তিন হাত জল বাতাসে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। বাড়ীর পাশের খালে যেখানে চ'রোলঙ্কার ক্ষেত ছিল, সেখানে এক তালের উপর জল দুরন্ত স্রোতে বিল ভাসাইতেছে। আটটি কুমড়া আর জলে ডোবা চারি সের চ'রোলঙ্কা লইয়া স্বামী হাটে গিয়াছে। ঘরে চাউল নাই। সন্ধ্যার কত পরে হয়ত চারি সের চাউল আর এক পোয়া তৈল লইয়া অন্ধকারে কাশিতে কাশিতে স্বামী ঘরে ফিরিবে।

গেল বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল জলে সকল ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেল। রাত্রে খাইয়া-দাইয়া ঘর-সংসার সারিয়া তাহারা শুইল, আর সকাল বেলায় উঠিয়া দেখিল—জল, নিষ্ঠুর জল, খালের মুখ দিয়া প্রবল স্রোতে বিলে পড়িয়া সমস্ত ফসল ডুবাইয়া, ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাদের আজ আর কিছুই নাই। আউড়ির ধান ফুরাইয়া গিয়াছে; মাটীতে পোঁতা পঁচিশটি টাকা, গায়ের গহনা, দুই বিঘা জমি, সবই গিয়াছে। জল, অসময়ের অশান্ত নিষ্ঠুর জল, ফসলের মাথার উপর তিন হাত উঁচু হইয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া, দুই বৎসরের এমন কি সারা-জীবনের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করিয়া তাহাদের জীবন-ধারায় এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন আনিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শুকনা দিনের পার হইতে সবুজ ধানের মাথা নোয়াইয়া, পালা-দেওয়া কাটা আউশ ধানের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে লাগে। তাহার মন কেমন করিতে থাকে।

ও-বাড়ীর ছোট ভাবী এমনি করিয়া ভাবিয়া চলে।

আহাম্মদের ছেলে রহমান খালের জলে নৌকা ভাসাইয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে। রহমান! রহমান! কত দিন, কত বৎসর আগে এক রহমান ছিল সেই ছিলুমপুরে। তাহার ঘরে কত লোক, কত গরু, কত গোলাভরা ধান, কত মনভরা খুশী। জল নাই সে দেশে, ধান মরে না সেখানে। আউশ ধান সেখানে এখনও কত পালায় সাজান আছে, ছয়টি গরু এখনও সেখানে ধান মাড়িতেছে, আর ছেলেমেয়েরা হয়ত ল্যাম্পো জ্বালাইয়া দুধ দিয়া ভাত খাইতেছে।

রহমান! দরজার ফাঁক হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিত রহমান। অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি ডাকিয়া ঘরের কোণে ফিস্ ফিস্ করিয়া মধুর মত কথা কহিত রহমান। বছির সাজিয়া 'ও আমার কালিজা ফাটেরে গুণা' বলিয়া গুণোযাত্রায় গাহিয়া তাহার বুকে ব্যথা দিত রহমান!

রহমান! সেই রহমান! যাহাকে লইয়া সে স্বপ্ন দেখিত, সংসার পাতিত, ছেলেমেয়ে হইবে ভাবিত, ছেলের নাম মজনু আর মেয়ের নাম লাইলি রাখিত, যাহাকে লইয়া সুখে আনন্দে, হাসি গানে, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, দালান-দেওয়া বাড়ী, লোকজন, আর মজনু লাইলিকে কোলে

করিয়া বাস করিবে ভাবিয়াছিল, সেই কত বছরের আগের টেরিকাটা মনভোলান কালো চেহারার প্রথম স্বামী তাহার রহমান।

বাহিরের খালে জলস্রোত বহিয়া চলে, বিলের উপর অসীম জলরাশি নাচিয়া বেড়ায়; আর তাহারই দিকে তাকাইয়া ছোট ভাবী রুদ্ধ বেদনায় অসহায় বোধ করিতে থাকে।

*　　*　　*

চ'রোলঙ্কার ক্ষেতে আর লঙ্কা নাই, মাচার কুমড়া ফুরাইয়া গিয়াছে। হাট হইতে ধান কিনিয়া চাউল বানাইয়া তাহারা বিক্রয় করে, আর তাহার লাভ দৈনিক তিন চারি আনা, তাহা দিয়াই সংসার চালাইয়া লয়।

সেদিন দুপুর বেলায় ছোট ভাবী কাঁদিতে কাঁদিতে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া স্বামীকে কহিল যে, এত সহ্য হয় না, ও বাড়ীর দানেজ ঘাটে ছিল, সে ইঙ্গিতে তাহাকে কি অপমান করিয়াছে। সব সয়, কিন্তু এমন অপমান সহ্য করা অসম্ভব।

স্বামী ক্ষেপিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল যে, দানেজশালার মাথা সেদিন মাটীতে না মিশাইয়া তাহার আর কোন কাজ নাই।

ছোট ভাবী প্রমাদ গণিল। সে স্বামীকে জানে, রাগিলে সে বাঘের মত সাংঘাতিক। নরম স্বরে কহিল যে, দোষ কাহারও নহে, দোষ তাহাদের কপালের। ভাবী আরও অনেক কথা কহিল।

স্বামী বুঝিল, ঠাণ্ডা হইয়া দুর্ভাগ্যের কথাই মনে করিল। তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বার বার মনে করিল, ছোট ভাবীর কাপড় ছিঁড়িয়াছে, একখানার দাম আঠারো আনা, আর দিনে আয় হয় তিন চারি আনা। আস্তে আস্তে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। বাল্যকালে সে দুধভাত ছাড়া খায় নাই। বাড়ীতে তাহার কত লোক। পাঁচ দিনের কলেরায় তাহাদের সব গেল। অবশিষ্ট রহিল সে। সেই অবধি কত বিপদের মধ্য দিয়া একা একা সে এই গ্রামে বাস করিতেছে। বাপ, মা, দাদা, আর দাদীর শ্রাদ্ধে, তারপর দুইবার বিবাহ করিতেই তো তাহার দশ বিঘা জমি চলিয়া গেল, গোলাপালা গেল, সব গেল। যাহাও ছিল তাহাও আজ দুই বৎসরের প্রবল বন্যায় শেষ করিয়া দিয়াছে। নতুবা দানেজ, ওই পাঁচ বিঘা জমিওয়ালা দানেজ—আজ কোন্ সাহসে তাহার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতে পারে। কপালে এতও ছিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—সেদিন হাটে সে এক অপূর্ব্ব বিচারের খবর শুনিয়াছে। তাহার নাম শালিশী বোর্ড (Debt Settlement Board) বন্ধকী জমি ছাড়াইতে আর টাকার দরকার হয় না, সে যত বৎসরের দেনাই হউক না কেন। আবার নাকি উলটা টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তাহা হইলে সে তাহার জমিগুলি ছাড়াইবার চেষ্টা দেখিবে। হয়ত নজীম বিশ্বাস, বাবর মুন্সী আর এনাৎ ফকীরের নিকট হইতে সে একটি মোটা টাকা ফেরৎ পাইবে। জমি ফেরত পাইবে। তাহার বাবার জমি, দাদার জমি তাহার বংশের নিজস্ব জমি, দশ বিঘা জমি সে ফেরত লইবে, সে টাকা পাইবে।

যাহারা তাহার বাপ পিতামহের ন্যায্য সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাদের সে শিক্ষা দিবে, আর দেখাইবে—সেও বড়লোক হইতে পারে। সে দেখিল—আগামী সন সে বড়লোক হইয়াছে। ছোট ভাবীকে সে ডাকিয়া কহিল—'শুনেছ? ও, শুনেছ?'

ছোট ভাবী কাপড় ছাড়িয়া পান খাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামী তাহার দিকে তাকাইয়া মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে কহিল, 'সামনের বছর, বুঝলে, আমরা বড় লোক হব।'

ছোট ভাবী অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। স্বামী উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'ঠিক বুঝলে, ঠিক আমরা বড়লোক হব, শালীশ বোড, শালীশ বোডে যাবো।'

ছোট ভাবী তবুও বুঝিতে পারে না—কোন্ কারণে, না খাইতে পাওয়া দারিদ্র্যের কোন্ অবকাশে এই অশান্ত আশা তাহার স্বামীকে উন্মত্ত করিয়াছে।

স্বামী উত্তেজিত স্বরে শালীশ বোর্ডের অপূর্ব্ব বিচারের কাহিনী বিবৃত করিয়া পরম বিশ্বাসের সহিত কহিল, 'দেখো, আমার কথা কেমন সত্যি হয়। ওই ওখানে একটা গোলা বাঁধবো, বুঝলে?' সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট ভাবী আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীর মুখের দিকে হাসিমুখে তাকাইয়া রহিল।

* * *

অনেক রাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরিল হাট হইতে। আধপোয়া তামাক, একটি পোনামাছ, একখানি মসজিদপেড়ে কাপড় লইয়া স্বামী ঘরে ফিরিয়াছে। ছোট ভাবী বেসাতি নামাইয়া হাসিয়া কহিল, 'ভাল তো, বড় ভাল কাপড় হয়েছে।'

স্বামী কহিল, 'তোমার জন্যেই তো আনলাম!' সে 'হে হে' করিয়া হাসিতে লাগিল।

সানন্দে ছোট ভাবী কহিল, 'আজ তোমাকে ঝালবাঁটা দিয়ে চচ্চড়ি রেঁধে খাইয়ে দেবো।' স্বামী পরম আনন্দে হাসিতেই লাগিল।

* * *

ছোট ভাবী নূতন কাপড় পরিয়া শুইয়াছিল। অর্দ্ধেক রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অদূরে বিলের ঢেউয়ে, খালের স্রোতে চাঁদের আলো পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে।

ওই ওখানে আগামী সনেই স্বামী গোলা বাঁধিবে, বাড়ির ঘর বদল করিয়া চৌরী ঘর বাঁধিবে, সারা বাড়ি ধান পল বিছাইয়া থাকিবে। পালা দেওয়া ধানের, গাদা দেওয়া পলের গন্ধ, গলায় ঘন্টি দেওয়া বলদের পায়ের শব্দ আর গরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অদূরে স্বামী শুইয়া ছিল। তাহার গোঁপদাড়ি, তাহার বুকের ছাতি, হাতের মাংসপেশী আর নিশ্বাসের শব্দ ছোট ভাবীর মন ভোলাইল। তাহার স্বামীর মত স্বামী আর কাহারও নাই। সে নূতন কাপড় দেয়, সামনের সন ওই ওখানে গোলা বাঁধিবে। তাহার স্বামী খুব ভাল।

চাঁদের আলোয় একছিলিম তামাক সাজিয়া ছোট ভাবী স্বামীর গায়ে ঠেলা দিল। স্বামী ওঁ ওঁ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ভাবী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আবার ঠেলিল। স্বামী চাহিয়া দেখিয়া কলিকা ও হুঁকা লইয়া 'এঃ' বলিয়া উঠিয়া বসিল। ভাবী বারান্দার পাশের দিকে বসিয়া কহিল, 'কেমন চাঁদ উঠেছে!'

স্বামীর নাকে নূতন কাপড়ের সঙ্গে ভাবীর গায়ের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। নূতন কাপড়পরা ভাবীর দিকে তাকাইয়া সে দাঁত বাহির করিয়া 'হ্যা হ্যা' করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট ভাবী স্বামীর বুকের ছাতি, হাতের পেশী, মুখের দাড়ি দেখিতে দেখিতে ধারাল হাসিতে চোখ টানিয়া তাকাইয়া রহিল।

তাহার স্বামী খুব ভাল। সে নূতন কাপড় দেয়, আগামী সন ওই ওখানে গোলা বাঁধিবে।

হাতের কাচের চুড়ি বাজাইয়া, রূপার নাকছাবি ঘুরাইয়া, নূতন কাপড়ের পাড় উড়াইয়া এই কয়দিন ছোট ভাবী প্রাণ ভরিয়া কাজ করিয়াছে। রান্নাঘরের সমস্ত ছোট হাড়ি, মেটে কড়াই, বড়ঘরের জলের কলসী, পানের পাত্র আর ছেঁড়া বিছানাগুলি সবই সাজাইয়া গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। তিনটা শিকার জো তুলিয়াছে আর সেই সঙ্গে ধান ভানিয়া স্বামীকে হাটে পাঠাইয়া নিত্যকারের খোরাক জোগাড় করিয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন স্বামী হাট হইতে ফিরিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পা ধোওয়ার জল ও সাজা তামাক লইয়া ভাবী কত সাধাসাধি করিল, স্বামী কথা কহিল না। ভাবীর মন আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

ভাত খাইতে গিয়া স্বামীর মুখে কিছুই ভাল লাগিল না। ভাবীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, 'কারো বউ হতে গেলে এমন ব্যাগারে চলে না বুঝলে?'

ইহার পর ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল। ভাবী রাগিল, স্বামী রাগিল, কথা কাটাকাটি হইল এবং ভাতের থালা উঠানে পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। স্বামী দ্রুত উঠানে নামিয়া হাত ধুইতে লাগিল, ভাবী দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ওপাশের বারান্দায় গিয়া খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে কাপড় কিনিয়া দিয়া তাহার দাম সময়মত শোধ করিতে না পারে এবং পনরদিন পরে যদি সেই পাওনাদার তাহাকে হাটে ফেলিয়া চাউলসুদ্ধ ধামা কাড়িয়া লইয়া অপমান করে তবে তাহার জন্য দায়ী হইবে কি স্ত্রী? সমস্ত দিন খাটিয়া, ধান ভানিয়া, উদয়াস্ত অবিশ্রান্ত আহারের চেষ্টা করিয়া, যে স্ত্রীর গা ব্যথা ছাড়ায় না, হাট হইতে বহিয়া আনা অপমানের কৈফিয়ৎ দিবে কি সে? নিকা হওয়ার সময় এমন কড়ার সে করে নাই; জীবনে তাহার অনেক সহিয়াছে। আর অসম্ভব।

ওই বারান্দার এই মুড়ায় ল্যাম্পের আলোয় বসিয়া স্বামী ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া হুঁকা টানিতেছে, একহাত লম্বা দাড়ী বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আধো আলো অন্ধকারে স্বামীকে তাহার এক গুহাবাসী লোমশ পশুর মত বোধ হইতে লাগিল।

স্বামী গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'যত ইয়ের কিছু না করে, এই, বুঝলে। ভাত খেয়ে আসার দরকার।'

ভাবী উঠিয়া গিয়া বারান্দার শেষ প্রান্তের খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিল।

খালের উপর দিয়া একে একে তিনখানা নৌকা চলিয়া গেল। কোন্ দেশের কোন্ ঘাটের নাইয়া ঘরে ফিরিয়া যায় উহারা। ঘাটে ওই নাইয়া ছেলেটির বাবা মা অথবা ছোট ভাইটি হয়ত আলো ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহার নিজেরও বাবা আছে, মা আছে। হয়ত তাহারা এতক্ষণে তাহারই গল্প করিতেছে। ভাইটি হয়ত 'বুজীকে কবে আন্‌বে বাবা' বলিয়া বাবার নিকট আব্দার করিতেছে। তাহার কাণে বাজিতে লাগিল—সেই যেদিন সে এখানে চলিয়া আসিল তাহার আগের দিন, সেই টুর-টুরের আমতলায় বসিয়া ভাই তাহার গলা জড়াইয়া কহিয়াছিল—'ভাই বলে আমায় ডাক ত'। সে ডাকিলে ভাই কহিয়াছিল—'আবার আসিস্ বুজী, আবার আসিস্।'

স্বামী ঝন্ ঝন্ করিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া কহিতে লাগিল—'বেশ, এ কিন্তু ভাল হ'লো না। আমি যার জন্যে যত করি সে তত ইয়ে করে। বুঝলে? ভাল হ'লো না কিন্তু—'

ভালুকের মত স্বামী তাহাকে এমনি করিয়া অকারণ কত দিন কত রাত্রি ধরিয়া পীড়ন করিয়া যাইবে! ভাবীর কান্না পাইতে লাগিল।

ঘরের আলো নিবাইয়া স্বামী শুইয়া পড়িল। ভাবীর মনে কষ্ট হইতে লাগিল। একবার কেহ খাইতে দিল না, হাত ধরিয়া কেহ শুইতে লইয়া গেল না, গায়ে হাত বুলাইয়া কেহ সান্ত্বনার একটি কথাও কহিল না।

ছিলুমপুরের রহমানের 'ও আমার কলিজা ফাটেরে গুণা'র সুর খাল ডিঙ্গাইয়া জলে ভরা বিল পার হইয়া তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। দরজার ফাঁক হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চট্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া মধুর মত কথায় সে কহিল—'চল্, আমরা চলে যাই, আয়।' দাদীর গল্পেবলা মরুভূমির বালু উড়াইয়া বালুবাগানের আঙ্গুরক্ষেতের মাচা দোলাইয়া লাইলী মজনু ডাকিয়া উঠিল—'মা—মাগো-ও…'



তাজমহল

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

শুনি ইতিহাসে,
কতশত কবিদের ভাষে,—
তব প্রেমবারিধারে স্নাত যাত্রীদল
পেয়েছে অমল
উদার প্রীতির স্নিগ্ধ শীতল পরশ
শোকতপ্ত হৃদিমাঝে ; কি যে সে হরষ
আজো, ওগো গুণী,
বুঝি নাই ভাল করে'। এখনো অঋণী
হে সম্রাট, হ'তে যে পারি নি আমি তব কাছে।
আজো বাকী আছে
ঢেলে দিতে মোর হৃদয়ের
ভক্তি-শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারে মন্দিরের।

তবু ওগো কবি
আঁখি আগে ভাসে তব ছবি
সীমাহীন অনন্তের শ্বেত শুভ্র চিত্রপটে ;
ত্রস্ত চিত্ততটে
উর্ম্মিরাজি ফেনিল বিরাট
ভেঙে পড়ে তব প্রেম-সাগরের ; হে সম্রাট,
পুলকিত চিতে
শুধু যেন শুনি চারি ভিতে
ধ্বনিতেছে অহরহ তোমার বেদনাবাণী ;
যেন কানাকানি
করে সর্ব্বলোকে ; সর্ব্বদেশে
তব প্রেম বিশ্বসুরে বিশ্বসাথে মেশে।

যমুনা-পুলিনে
কোন দূর অতীতের দিনে
বেজেছিল প্রেমবাঁশী ; উচ্ছ্বসিত করি' হৃদি
কোন গোপনিধি
এনেছিল গোকুলের মাঝে
প্রেমবন্যা ক্ষীরধারা,—আজিও হৃদয়ে রাজে
লুপ্ত বৃন্দাবন ;
নিখিলের মন
আজো দেখি পল্লবিত সে বাঁশীর ডাকে,
এখনও আঁকে
মনোমাঝে সেই প্রেমছবি ;—
অমর করিছে তা'রে যুগে যুগে কতশত কবি।

সেই নদীতীরে
মানসী প্রতিমা ঘিরে'
যে ছবি তুলিলে ধীরে,
যে মৌন মর্ম্মর ভাষা তা'রে করে মর্ম্মরিত,
মর্ম্মে যে ধ্বনিত
তা'র সুর ; অন্তরে স্বনিত
তাহা মূক সঙ্গীতের তালে—
আঁখি অন্তরালে
স্বপনের জালে
বাঁধা সে যে—বল কবি তবে,
বাহিরের সীমা মাঝে দেখিয়া তা'রে কি হ'বে ?
তা'র চেয়ে যবে,
মনে হ'বে সৌন্দর্য্যকমল
বিশ্বপটে ম্লান ছিন্নদল,
জাগিবে মানস মাঝে সে তাজমহল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

ডাঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডি-টি-এম্

অন্ধকারে মানুষ কখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারে না। অন্ধকারের অসুবিধা দূর করবার জন্যে লোকে আলো জ্বালতে চায়। কিন্তু একটি আলো জ্বাললে অসুবিধা দূর হয় না। তখন চারিদিক থেকে আরো কত আলো জ্বালা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার না ঘোচে। সেইজন্যে অন্ধকার হ'লেই আমরা দেখতে পাই একটির পর একটি ক'রে চতুর্দিক থেকে কত আলোই জ্বলে। যখন একবার সুরু হ'য়ে যায় তখন পরে পরে দ্রুতগতিতে অনেক আলো জ্বলে উঠতে থাকে, দেখতে দেখতে অসংখ্য হ'য়ে যায়।

পৃথিবীতে এতকাল আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারেই ছিলুম। এখন আমাদের জ্ঞানের আলো জ্বলতে সুরু হয়েছে। অতি দ্রুতগতিতে একটির পর একটি করে আলো জ্বলে উঠছে। জ্ঞানের বাতি জ্বালতে জ্বালতে আমরা অনেকটা এগিয়েছি, সেইজন্যে এখনকার কালকে আমরা বলি আলোর যুগ বা বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসে এখনকার মত একসঙ্গে এতগুলো আলো ইতিপূর্ব্বে জ্বলেনি। সকল দিক থেকেই আমরা নতুন নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান, জ্ঞানসম্পদে কোনোটিই কম নয়। অগ্রগতিতে যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর অনেক উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে শক্তিমান করেছে, সম্পদ্‌বান করেছে। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞান একদিকে আমাদের যেমন ইষ্টও করে, অন্যদিকে তেমনি আবার অনিষ্টও করে। একদিকে আমাদের নানা প্রকারের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের স্বার্থপরতা এবং লালসাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের জোরে আমরা এখন আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকি না। বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা নিয়েই এখন আমাদের লড়াই চলে। এখনকার দিনে অন্তত দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করাই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তি সঞ্চয় করা। সকল রকম বিজ্ঞানেরই এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য দেখা যায়, কেবল একটি বিজ্ঞান আছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, এ ছাড়া তার আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নেই। সে হলো চিকিৎসা-বিজ্ঞান। এর একমাত্র লক্ষ্য, কিসে মানুষের অমঙ্গল দূর হয়, কিসে মানুষকে সুস্থ করা যায় এবং সুস্থ রাখা যায়, কিসে তারা দীর্ঘজীবী হয়। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে তারই কিছু ইতিহাস আপনাদের শোনাব। প্রত্যেক বিজ্ঞানেই এক একজন মহা মহা রথী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই হন উন্নতির অগ্রদূত। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মন্দিরে তাঁরাই হন চিরস্মরণীয়। এর মধ্যে যে কে বড়ো আর কে ছোটো সে কথা আমি বলতে পারবো না। যিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছেন তাঁকেই আপনারা অধিক মর্য্যাদা দেবেন, না যিনি ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার ক'রেছেন তাঁকেই অধিক মর্য্যাদা দেবেন, সে বিচার অবশ্য আপনারাই করবেন। কিন্তু একটা কথা কেবল এইখানে বলতে চাই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাঁরা উন্নতি করেছেন, তাঁরা সকলেই মহা মহা পণ্ডিত কিংবা বড় বড় প্রফেসর ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সামান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা

ও আবিষ্কার একত্রিত ক'রেই আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যিনি গরুর বসন্তের বীজের টীকা দিয়ে মানুষের বসন্ত নিবারণ করবার উপায় প্রথম জানতে পারেন তিনি ছিলেন বিলাতের এক পল্লীগ্রামের একজন নিরক্ষর চাষা, নাম বেঞ্জামিন জেষ্টি।

তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে তাঁর একটা ছবি নেবার জন্যে অনেক বেগ পেতে হয়েছিলো, স্থিরভাবে তাঁকে বসানোই গেল না। ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করেছিলো পেরু প্রদেশের এক বর্ব্বর জাতি, সেখানকার গভর্ণর Count of Cinchona তাই জেনে এই ঔষধ প্রচার করলেন, সেইজন্যে ঔষধেরও নাম হলো সিনকোনা। ডোভার্স পাউডার নামে যে চমৎকার ঔষধ এখনো আমরা ব্যবহার করি সেটি আবিষ্কার করেছিলো একটি জলদস্যু, তার নাম টমাস ডোভার। খোসের পোকা আবিষ্কার করেছিলো কর্সিকা দ্বীপের এক তরকারীওয়ালি। জল চিকিৎসার আবিষ্কার করেছিলো অষ্ট্রিয়ার একজন নিরক্ষর চাষার ছেলে, তার নাম প্রিস্‌নিজ। মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের লেন্স প্রথম আবিষ্কার করে জ্যানসেন নামে একজন চশমাওয়ালা। তখন সেটা ছিলো একটা খেলার জিনিষ, তাতে এইটুকু মশাকে এত বড় পাখীর মতো দেখাত। কিন্তু তাই থেকে সৃষ্টি হলো মাইক্রোস্কোপ। অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিছু পার্থক্য আছে। এই বিজ্ঞানের তথ্যগুলি আবিষ্কারের জন্যে মানুষকে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। অনেকে বিষাক্ত জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজের হাতে নিজের মৃত্যু বরণ ক'রে নিয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে সত্য আবিষ্কারের কৌতূহল মাত্র, এ ক্ষেত্রে সেখানে জীবন বাঁচাবার ঐকান্তিক চেষ্টা। মানুষ নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে কী না চেষ্টা করে, অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করবার জন্যে কত কাণ্ডই না করতে পারে? আগেকার কালে রোগ সারাবার জন্যে মানুষ লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছেঁকা দিয়েছে, ছুরি দিয়ে দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, জোঁক দিয়ে রক্তপান করিয়েছে; কত রকমের যন্ত্রণাদায়ক আঘাত সহ্য করেছে, কত রকমের কটু দ্রব্য অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করেছে। এমনি ক'রে কতকাল পর্য্যন্ত আমাদের অন্ধকারে মাথা কুটে মরতে হয়েছে, কতকাল আমাদের নিতান্ত অসহায় জন্তুর মত রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছে। বহুকাল পর্য্যন্ত রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল না, এটা ছিল এক রকম ব্যক্তিগত বিদ্যা—সম্পত্তি। এ বিদ্যা ছিল অত্যন্ত গোপনীয়, কারো কাছে প্রকাশ করবার নয়। এর কারণ আর কিছুই নয়, জ্ঞানের আলো তখনো প্রজ্বলিত হয়নি। সকলেই তখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের আন্দাজের ওপর নির্ভর ক'রে কাজ করতো। যার আন্দাজের জোর বেশী তারই তত কদর বেশী। তখন রোগের কারণও কেউ জানতো না, আর কোনো রোগকে দমন করবার নিশ্চিন্ত উপায় কি তাও কেউ জানতো না। সমস্তই নির্ভর করতো ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর। মানুষের জীবনে এই অন্ধকারের যুগ কত সহস্র বছর ধ'রে ছিল। প্রকৃত যেটা জ্ঞান সেটা গোপনীয় বস্তু নয়, সকলেই সেটা জানবে, সেটা প্রয়োগ ক'রে সকলেই সমান রকমের ফল পাবে, এবং সকলেই সেটার কার্য্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে পারবে।

একেই বলে বিজ্ঞান। চিকিৎসাবিদ্যাও যখন এই সত্য পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হল তখন সেটা বিজ্ঞানে পরিণত হল। বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বয়স খুব বেশী নয়, এখনও তিন শত বৎসর সম্পূর্ণ হয়নি। কবে যে এর প্রথম আলোটি জ্বলে উঠল সে কথা বলতে গেলে আগেই সুরু করতে

হয় মাইক্রোস্কোপের কথা। লিউভেন হোয়েক নামে একজন ডাচ্ পূর্ব্বোক্ত জ্যানসেনের লেন্স দিয়ে মাইক্রোস্কোপ নামে এক রকম যন্ত্রের সৃষ্টি করলেন যাতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ দুই শত গুণ বড় করে দেখা যায়, সুতরাং যে সব জিনিষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই মানুষের কাছে অদৃশ্য, তা এ যন্ত্রের সাহায্যে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যেতে লাগল। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে আমাদের বীর্য্যের মধ্যেও একরকম জীবন্ত পোকা আছে, আমাদের মুখের থুথুর মধ্যেও নানা রকমের জীবন্ত পোকা আছে আর জলের মধ্যেও অনেক রকমের পোকা আছে। ১৬৭৪ সালে রয়েল সোসাইটিতে তিনি এই সব জিনিষ চাক্ষুষ দেখালেন। বর্তমান রোগ-বিজ্ঞানের এইখানেই হল প্রথম সুত্রপাত। কিন্তু মানুষের শরীরের রোগের সঙ্গে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে সে কথা তখন কিছু ধারণা করাই যায়নি। এর অনেক কাল পরে ১৮৩৯ শালে এই মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে স্লিডেন আর সোয়ান (Schleiden and Chwaun) দুই বন্ধুতে আবিষ্কার করেন যে উদ্ভিদই হোক্ কিম্বা প্রাণীই হোক্, জৈব পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবকোষের দ্বারা গঠিত। ইট দিয়ে গেঁথে গেঁথে যেমন দেয়াল তৈরী হয়, জীবকোষ দিয়ে গেঁথে গেঁথে তেমনি গাছ-পালা কীট-পতঙ্গ এবং মানুষের দেহ তৈরী হয়। স্লিডেন ছিলেন বটানির ছাত্র আর সোয়ান ছিলেন ফিজিওলজির ছাত্র, সেইজন্যেই ওঁদের এই আবিষ্কারের সুবর্ণ সুযোগ হয়েছিল। এর দশ বছর পরেই বিরচাও (Virchow) আবিষ্কার করলেন যে শুধু তাই নয়, মানুষের শরীরে যে সব রোগ জন্মায় তাও প্রকৃত পক্ষে শরীরস্থ জীব-কোষেরই বিকৃতি। মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে আমাদের শরীর এক একটা রাজ্য বিশেষ, আর জীবকোষগুলো সেখানকার প্রজা, তাদের নিয়েই এই রাজ্যের গঠন হয়েছে। রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখনই জন্মায় রোগ। থাইসিস রোগ হলেও তাই হয়, ফুসফুসের কোষ সমূহের বিকৃতি ঘটে, আর সামান্য একটা ফোড়া হলেও তাই হয়, তখন স্থানীয় কোষগুলোর বিকৃতি ঘটে। রোগ সমূহের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিদান এই প্রথম আবিষ্কৃত হল। কিন্তু এই বিদ্রোহ আসে কোথা থেকে? কে এই বিদ্রোহ ঘটায়? এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব দিলেন পাস্তুর (Pasteur)। তিনি ছিলেন একজন ফরাসী রাসায়নিক, গুটিপোকার রোগ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দেখলেন অসুস্থ গুটিপোকার মধ্যে বীজাণু থাকে সুস্থ পোকার মধ্যে তা থাকে না। তারপর তিনি দেখলেন, মুরগীর রোগের মধ্যেও বীজাণু থাকে। অসুস্থ মুরগীর বীজাণু যদি সুস্থ মুরগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তখনই তার শরীরে রোগ জন্মায়। এই সকল বীজাণু মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করা যায়। তখন তিনি বললেন রোগ মাত্রই বীজাণুর দ্বারা আসে, রোগের বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়ানো আছে, যখন তারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই রোগ হয়। এই প্রথম ব্যাক্‌টিরিওলজির প্রতিষ্ঠা হল, আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই প্রথম আলো জ্বলে উঠল। এর পরেই দ্রুতগতিতে একটির পর একটি আলো জ্বলে উঠতে লাগল। এলেন তখন রবার্ট কক। এঁর স্ত্রী জন্মদিনে এঁকে একটি মাইক্রোস্কোপ উপহার দিয়েছিলেন। বীজাণুর দ্বারা রোগ জন্মায় এই কথা তখন নতুন শোনা যাচ্ছে, প্র্যাকটিস ছেড়ে তিনি এই নিয়েই পরীক্ষা করতে লাগলেন। অ্যানথ্রাক্স নামে একরকম রোগ আছে, এর বীজাণু তিনি দেখতে পেলেন। এই বীজাণু নিয়ে ইঁদুরের গায়ে প্রবেশ করিয়ে দিলে ইঁদুর মরে যায়, তার শরীরে তখন

অংসখ্য বীজাণু দেখা যায়, তাও তিনি দেখলেন। কিন্তু রোগীর শরীরে বীজাণু এত কম কেন, আর ইঁদুরের শরীরেই বা অত বেশী হয় কেন? মনে মনে ভাবলেন, এরাও তো জীবন্ত বস্তু, সুবিধা পেলেই এরা বংশ বৃদ্ধি করে। সুতরাং জীবদেহের মত সুবিধা যদি বাইরেও করে দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয় এরা বাইরেও বংশ বৃদ্ধি করবে। এই ধারণা থেকে তিনি ইনকিউবেটরের সৃষ্টি করলেন যার মধ্যে শরীরের মত উত্তাপ সর্বক্ষণই থাকবে, আর মাংসের ব্রথ তৈরী করে তাতে অ্যানথ্রাক্স বীজাণু রেখে সেটা ঐ ইনকিউবেটরের মধ্যে রক্ষা করলেন। দেখতে দেখতে বীজাণুর সংখ্যা বেড়ে উঠল। এর নাম হল বীজাণুর কালচার। তারপর তিনি উপর্য্যুপরি আরো অনেক আবিষ্কার করলেন। ঘা ফোড়া যে ষ্ট্রেপটোকক্কাস এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাস বীজাণুর দ্বারা জন্মায় একথা তিনিই প্রথম বলেন। যক্ষ্মারোগ যে টিউবারকল ব্যাসিলির দ্বারা হয় এও তাঁরি আবিষ্কার। ককের আবিষ্কারের পর দ্রুতগতিতে আরও অনেকে অনেক রোগের বীজাণু আবিষ্কার করতে লাগলেন। ১৮৭০ সাল থেকে আরম্ভ করে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ রোগের বীজাণুই আবিষ্কার হয়ে গেল। তখন আর প্রমাণ হতে বাকি রইল না যে সংক্রামক রোগ মাত্রই বীজাণুর দ্বারা জন্মায়। এদিকে বিলাতের লর্ড লিষ্টার পাস্তুরের আবিষ্কারের পর ১৮৬৭ সালে অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। আগে কোন অপারেশন করলে সেটা বিষাক্ত হয়ে উঠত, অধিকাংশ রোগীই অপারেশনের পর আর বাঁচত না। পাস্তুরের কথায় লিষ্টার ভাবলেন যে যদি হাওয়াতে বীজাণু থাকে, তবে সেইগুলিই ত কাটা ঘায়ে প্রবেশ করে তাকে বিষাক্ত করে। কয়েক প্রকার ওষুধে এবং আগুনে বীজাণু মরে যায়। সেই সকল ওষুধ ব্যবহার করে এবং অপারেশন সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র মাত্রই উত্তমরূপে আগুনে পুড়িয়ে এবং সিদ্ধ করে নিয়ে তিনি দেখলেন যে তাতে আর কোন কাটা ঘা বিষাক্ত হয় না। এই থেকেই অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির প্রতিষ্ঠা হলো। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক মহামূল্য আবিষ্কার। কিন্তু সার্জারি সম্পর্কে আরো একটা মহামূল্য আবিষ্কারের কথা এখনো বলা হয় নি, সেটা অ্যানিস্থিসিয়ার কথা, অর্থাৎ মানুষকে অসাড় এবং অজ্ঞান করে অস্ত্র প্রয়োগ করবার উপায়। জীবন্ত মানুষের গায়ে ছুরি চালালে তার কত অসহ্য যন্ত্রণা হয়? লোকে বলে, মরে যাই সেও ভালো, তবু গায়ের মাংস কাটতে দিতে পারবো না। বাস্তবিক এইজন্যেই সেকালে কোন বড় রকমের অপারেশন করা যেত না; কত রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া হয়েছে।

অপারেশনের সময় রোগী অজ্ঞান হ'য়ে থাকবে, গায়ে ছুরি বসালেও টের পাবে না, এমন একটা উপায় সকলেই খুঁজছিল। জিনিষটা আবিষ্কার হলো আমেরিকাতে। ডাক্তার ওয়েলস্ বললেন যে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস শুঁকলে কোনো যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। তিনি এইটে সকলের সামনে প্রমাণ করতে গেলেন, কিন্তু বিফল হ'য়ে মনের দুঃখে নিজের হাতের রক্তশিরা কেটে দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু তিনি ভুল কথা বলেন নি, ঠিকই বলেছিলেন। তারপর তাঁর বন্ধু মর্টন দেখলেন যে জ্যাকসন নামে একজন রাসায়নিক ক্লোরিন গ্যাস শুঁকে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছিল, ইথার শোঁকবামাত্র সে যন্ত্রণা সেরে গিয়ে লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। মর্টন ছিলেন একজন ডেন্টিষ্ট, তিনি ইথার শুঁকিয়ে লোকের দাঁত তুলতে লাগলেন, এবং সকলকে এর আশ্চর্য্য শক্তি দেখালেন। তখন থেকে ইথার আর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার সুরু হলো।

বীজাণুতত্ত্বের আবিষ্কার হলো, সার্জারির চরম উন্নতি হলো, এরপর এলো ঔষধ আবিষ্কারের যুগ। রোগের কারণ যখন জানা গেছে তখন আর তার উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কারের দেরী হবে কেন? দেহ মাত্রই এক একটা মেসিন। মেসিনের কলকব্জাগুলো সমস্তই যখন জানা গেল, কেমন ক'রে সেগুলো বিগড়ে যায় তাও যখন বোঝা গেল, তখন তো তাকে মেরামত করবার উপায় খুঁজে বের করা খুবই সহজ। সে উপায় আবিষ্কৃত হ'তে আর বিলম্ব হলো না। রাসায়নিক বিজ্ঞান এবং জৈব রসায়নের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই নতুন রকম ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। জীবদেহে সেগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে, তারপর সফল হ'লেই সেগুলো সকলে জানছে। এ যুগের একটা নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আগেই বলি, সেটা হচ্ছে ইনজেকশনের দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ। এখনো আশী বছরও হয়নি, এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে মুখ দিয়ে ওষুধ খাওয়ানো হতো, মালিশ ক'রে এবং ধোঁয়া দিয়েও ওষুধ প্রয়োগ করা হতো; কিন্তু ছুঁচ ফুটিয়ে পিচকারীর দ্বারা যে চিকিৎসা করা যায় একথা কেউ জানতো না। প্রথম আবিষ্কার হলো মর্ফিয়ার ইনজেকশন। আফিম থেকে মর্ফিয়ার আবিষ্কার অনেক দিন আগেই হয়েছে সারটুনার (Serturner) নামক এক ব্যক্তির দ্বারা। এই ঔষধে যন্ত্রণা কমানো যায় এবং ঘুম পাড়ানো যায়। ঘুমের দেবতার নাম ছিল মর্ফিয়াস, তাই থেকে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মর্ফিন। কিন্তু ওষুধটা বড় তেতো, রোগীদের খেতে দিলে প্রায়ই বমি করে ফেলে। ফ্রান্সিস রিন্দ (Francis Rynd) নামে এক ব্যক্তি তখন উপায় বের করলেন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। তিনি বললেন ওষুধ খেতে না পারলেও এই যন্ত্রের দ্বারা চামড়া ফুঁড়ে গায়ের মধ্যে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এবং তাতে আরো তাড়াতাড়ি কাজ হয়। এর উপকারিতা দেখে তখন অন্যান্য ওষুধও এ উপায়ে প্রয়োগ করা সুরু হলো। এখন অনেক রোগের চিকিৎসাই ইনজেকশনের দ্বারা করা হয়।

রোগের চিকিৎসার জন্যে এখন অনেক আশ্চর্য্য রকমের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি সদ্য ফলপ্রদ এবং মন্ত্রের মত কাজ করে। এখন আর আন্দাজের অবকাশ নেই, রোগটি জেনে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাটি প্রয়োগ করলে তা নিশ্চয় আরোগ্য হবে, একথা বলতে আর দ্বিধা হয় না। কয়েকটি মাত্র রোগের উল্লেখ করি। সিফিলিস এবং গণোরিয়া রোগ দুটি অত্যন্ত জঘন্য, পূর্ব্বে কিছুতেই আরোগ্য করা যেত না। কাউকে একবার ঐ রোগে ধরলে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। সকলেই জানেন, সিফিলিসের অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার নাম স্যালভারসন। গণোরিয়া রোগেরও একটি চমৎকার ঔষধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ম্যালেরিয়াতে কুইনিন ছাড়াও আর দুইটি অপূর্ব্ব ঔষধ পাওয়া গেছে, সুতরাং কুইনিনই আমাদের এখন একমাত্র সম্বল নয়। কলেরাতে রজার্স সাহেবের সেলাইন ইনজেকশন দিলে বহু রোগী মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পায়। এমিবিক আমাশাতে এমিটিন সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। টায়ফয়েড এবং ব্যাসিলারি আমাশার জন্য ডিহেরেল যে ব্যাকটিরিওফাজ চিকিৎসার আবিষ্কার করেছেন সর্ব্বত্র ফলপ্রদ না হলেও তা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য ফল দেয়। কালাজ্বরের যে অব্যর্থ ওষুধ ডাঃ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছেন, সেকথা আপনারা সকলেই জানেন। কুষ্ঠ রোগেরও এখন উত্তম চিকিৎসা বেরিয়েছে। ষ্ট্রেপটোকক্কাস বীজাণুকে নাশ করবার উপায় আমরা জানতুম না। সম্প্রতি তারও অব্যর্থ ওষুধ বেরিয়েছে, সালফানিল

অ্যামাইড। ঐ বীজাণু থেকে সকল প্রকার রোগই এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়। নিউমোনিয়ারও এখন এক চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে তার নাম 693, প্রথম অবস্থায় খাওয়াতে পারলে শীঘ্র সেরে যায়। ডায়েবিটিস রোগ কখনো আরোগ্য হ'ত না, অনেকে তাতে অকালে মারা যেত, এখন ইনসুলিন প্রয়োগ করলে মৃত্যুমুখ থেকেও রক্ষা করা যায়। এ্যানিমিয়া বা রক্তহীনতায় লক্ষ লোক মারা যেত, এখন তার চিকিৎসা বেরিয়েছে লিভার একষ্ট্রাক্ট। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে হয়েছে গ্লুকোজ ইনজেকশন, আরো কত রকমের নতুন ওষুধ বেরিয়েছে তার সংখ্যা নেই। যক্ষ্মা রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না, এখন গোল্ড ইনজেকশন আর নিউ-মোথোরাক্স প্রভৃতির দ্বারা অনেক রোগী প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। ক্যানসার রোগের কোন চিকিৎসাই নেই; তবু মাদাম কুরীর রেডিয়ামের সাহায্যে অনেক প্রথমাবস্থার ক্যানসার এখন আরোগ্য হয়। রণ্টজেন কর্তৃক এক্সরে আবিষ্কারের ফলে এখন আভ্যন্তরিক রোগ নির্ণয়ে কত সুবিধা হয়েছে, অনেক রকমের টিউমারও এর দ্বারা আরোগ্য হচ্ছে।

এ ছাড়া বীজাণুর থেকে প্রস্তুত সিরাম ভ্যাক্সিন প্রভৃতির উপকারিতাও কম নয়, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি বহু প্রকারের রোগ তাতে আরোগ্য হয়, এবং তার দ্বারা অনেক রকম রোগ আগের থেকে নিবারণ করাও যায়। খাদ্যের ভিটামিন আবিষ্কারও যুগান্তকারী, তার দ্বারা অনেক রকম রোগের এখন চিকিৎসা হচ্ছে। এই সমস্ত কথা শুনে আপনারা মনে মনে কি ভাবছেন তা জানি। ভাবছেন যে এতোই যদি আবিষ্কার হলো, তবু লোকে রোগে ভুগে মরে কেন? সে কথার জবাব আমি দিতে পারব না। বিজ্ঞানের উন্নতি হ'লেও ঠিক জায়গায়, ঠিক সময়ে, ঠিক ভাবে তার উপায়গুলি প্রয়োগ করা চাই। জ্ঞান আলাদা কথা, আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগ আলাদা কথা। এ ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নতি এখনো অনেক বাকি আছে। এমনও একদিন আসতে পারে যেদিন এখনকার মত রোগে ভুগে কেউ আর মরবে না। ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস দুই রোগী হইয়াছিল, যদু ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারি উপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যদু ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অস্‌লারের বিখ্যাত বইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতে করিয়া সে অস্‌লারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

প্রথম দুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, দুই সপ্তাহের মধ্যে সেই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর দোকানে বাকী পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিস দেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত।

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনের ডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরার রোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সব লইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের। সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চল, পাঁচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

—চলেন বাবু আপনি। যদুবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যদু ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধা নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়ে এসেছে যদুবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিক্‌বে?

যদু ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এই অঞ্চলে বহু রোগী ও বহুপ্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, ওতে ভয় পাবার কারণ নেই বোধ হয়। স্যালাইন দিন আপনি—

বিপিনের জিদ্‌ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জলে গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যেই মারা না যায়—

—আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাশ করা ডাক্তার ভয় খাইত, বিপিন তাহা অনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল। যদু বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—

—কত সি, সি দেবেন বিপিনবাবু?

—সি, সি ফি, সি কি মশাই এতে? বাংলা নুন গোলা জল, তার আবার সি, সি। দেখুন আমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না।

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরণের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যদু ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়।

—হয় নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইন্‌জেক্‌সন করিল, যদু ডাক্তারের বারণ শুনিল না। যদু বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, আপনার সাহস নেই যদুবাবু, সব সময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তে হয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী, আমার যা ভাল মনে হচ্ছে, তা করে যাবো।

যদু ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দুবার ইন্‌জেক্‌সন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না। তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না। আরও আধ ঘণ্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মন আহ্লাদে

নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানের গোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথা বলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো! আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল, বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকে টেনে বার করলেন মশাই।

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরে চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটি দড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামশুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তার লোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজেও খাতির পাইবে, নতুবা লোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে। সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনের সামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মত সাহস কোন ডাক্তারের দেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা? ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটা চারেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল, আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রুগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরী আছে তো?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে দশটা নারকেলের গাছ বাড়ীতে। বাবু সহর বাজার হ'লি এই গাছ কডার ফল বিক্রী করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই। কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা তাও খদ্দের নেই।

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়ে সবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট না লওয়া যায়?

বিপিন বলিল, তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাট বার। ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে। লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এ পথে নামাইয়াছে, যদি সে কোন গরীব রোগীর প্রাণ দান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচড় দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমত বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট হাট, সবশুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরা ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া পাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকানে হারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈল আর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ী যাবে না?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাবো, কালকের তাগাদার ফর্দ্দ তৈরী করবো, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম।

—কে করলে সুখ্যাত?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সব কথা বলছিল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌ কখনো ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেল অন্য ধরণের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরীব বলে এক পয়সা নেন নি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীল! মানুষ না দেবতা! গরীব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এল।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া দুধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায় দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ী ফিরিল।

দত্ত মশায় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোষের উপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়ীতে আমার জামাই মেয়ে এসেছে অনেক দিন পরে। আজ একটু খাওয়া দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দুখানা লুচি না হয় অমনি গরীবের বাড়ী—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই?

—বাড়ির মধ্যে গিয়েচেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা, সন্দে আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলে তো চলে না। এখন তাগাদা পত্তরের সময়, নিজে না দেখ্‌লে কাজ হয় না। পরশু যাবো ভাবচি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মশায়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয় শুধু রামায়ণ মহাভারতের কথা বলেন। আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর খেয়াল হইল তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলে বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাতা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকে চাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। মানীদের বাড়ী, সেও এই রকম জামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল। সেদিন আড়ালে ছিল মানী—খাইয়া উঠিয়া জানালার ধার দিয়া যাইবার সময় তাহার সহিত দেখা হইত—কারণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত মানী—তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিত। সে প্রায় তিন বৎসর আগেকার কথা।

আজ কোথায় সে আর কোথায় মানী!

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখা সাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। সে কোথায় আছে? ইহারা কে? ওই যে শ্যামা মেয়েটি আধ ঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না।

অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোন দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি একমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেন না, তবে কেন তাঁহাকে লুচি দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্ব্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুণই হউক বা যে জন্যই হউক, তাঁহার খাওয়া দাওয়া একটু সৌখীন ধরণের। তাঁহার জমিতে সাধারণতঃ মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতে পারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেন সোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ী হইতে। বারমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়া খান না। বাড়ীর আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোটা চালের ব্যবস্থা। তবে অতিথি-সজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছাল করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্তমহাশয় একটু বেশি সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলে বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাত সাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতে যাইতে দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল। মানী দাঁড়াইয়া আছে? কেহ নাই। রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এই জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাই ভস্ম সে ভাবিতেছে! এটা কি মানীদের বাড়ি যে মানী দাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জট পাকান অন্ধকার কিন্তু ক্রমশঃ স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশে হাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোকমুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহার দৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে আজ কোথায় ?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ির এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ির তিন বৎসর পূর্ব্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্য এত মন কেমন করে কেন ?

বিপিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয় ? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে। এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিসটা।

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা ? তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল ?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত, অতি প্রিয় মুখ !

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে, তুই আমায় বাঁচা, আমায় ডাক্তারি শেখাবি নে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে ?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে, এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দুমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ির আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছে সে, বাড়ির কোন মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহার সামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল ? তবে হাঁ, শান্তি তো আর ঘরের বউ নয়, বাড়ীর মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি ? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবাপরায়ণা ও শান্ত। চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

যদি আজ শান্তির বদলে এখানে মানী থাকিত ?

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন ?

পরবর্ত্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমত রোগীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুলে প্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যদু ডাক্তারের পশার একেবারে মাটি হইয়া গেল, নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পশার হবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগীর রোগ আদ্ধেক সেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ি যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ এখনও পুরাদমে চলিবে আরও অন্ততঃ এক মাস। এই সময়ে একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসা দরকার।

ক্রমশ



আমরা কবি

শ্রীসুনীলকান্তি সেন

আমরা প্রাচীন কবি
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।
ফুলে আর চাঁদে, চাঁদে আর ফুলে যে রস আছে
নিশীথে সে রস হরণ করি
মনের গোপন ভাঁড়ার ভরি।
কোকিল, বকুল, প্রিয়ারে ঘেরিয়া যে সব ভাব
বেঁধেছে দানা,
নানান্ খানা,
তারি দুএকটা বাছিয়া বাছিয়া ডুবায়ে রসে,
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।

রসিকেরা মিলি কানাকানি করে অবাক মানি'
ফুলে আর চাঁদে, চাঁদে আর ফুলে
এত রস আছে ছিলনা না জানা,
কিবা বিচিত্র ভাবের দানা,
বাহবা কবি!
রসোত্তীর্ণ কবিতা তোমার আরও তো আছে?
ফুল যদি তার গন্ধ ছড়ানো বন্ধ করে,
শশী যদি আজ মসিমাখা হয়ে ঘুরিয়া মরে,
অন্ধ ব্যোমে,
আমার রসের ভাঁড়ার তথাপি হবেনা খালি।
ফুল ও চাঁদের কবিতায় তবু দিওনা গালি,
আমরা প্রাচীন কবি
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।

আমরা নবীন কবি,
উন্মাদ মোরা, প্রমত্ত মোরা, আমরা "রোলার" কবি,
আমরা বর্ষা, আমরা প্লাবন, আমরা উল্কা, আমরা শ্রাবণ,
আমরা ভীষণ বিদ্রোহী আর "রোলার" কবি।

বাধা আর কাদা দলিয়া মথিয়া আমরা ছুটি ;
কোথা ছুটিতেছি তাই কি জানি ?
নিষেধ-শাসন লঙ্ঘন করি ছুটাই ঘোড়া ।
জীবনে মোদের অনেক ব্যথা,
হৃদয়ে মোদের রয়েছে অনেক গোপন ক্ষত
সন্ধান তার রাখ কি কিছু ?
তাহারি ব্যথায় কবিতা লিখি
তরুণ আমরা নবীন কবি ;
ফুল হ'তে আর চাঁদ হ'তে শুধু রস চুরি করা
ব্যবসা নহে,
আমরা "রোলার" কবি ।



প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

শ্রীইন্দ্রসোম বর্মন

জঁা ক্রিস্তফে রোম্যা রোলাঁ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন :

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

সভ্যতা যে পরিমাণে উন্নত হইলে ধনসাম্যহীন সংসার অর্থাৎ সমাজ বিষময় বলিয়া ঠেকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই শ্লোকটিও সংসারবিষজর্জর একাকী মনের বেদনাকে বহন করিতেছে। শ্লোকস্থ 'সজ্জন'-শব্দটিতে বোধ করি ভালোমানুষ বোঝায় না (কারণ ভাল লোকই যদি পাওয়া গেল, তবে আর সংসার বিষবৎ লাগিবে কেন?); উহার সহজ অর্থ 'সহৃদয়' বা একই ভাবের ভাবুক। মানুষ যখন মনের স্ফূর্তি হারায়, সমাজের গতানুগতিকতায় তাহার মননশক্তিতে যখন ভাঁটা পড়ে, তখনই সে বৈচিত্র্যের সংঘাত এড়াইয়া মনের মানুষ খুঁজিতে ব্যস্ত হয়। তাহার কাব্যও তখন সুখদুঃখবিচিত্র কর্মের উপলবন্ধুর রামগিরি হইতে অবিরল আনন্দের কৈবল্যভূমি অলকায় মেঘদূত প্রেরণে সার্থকতা লাভ করে। এমন অবস্থায় তাহার কাব্যতত্ত্বও একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক কারণের পুনরাবর্তনে সকল দেশে, সকল যুগেই এইরূপ ঘটিয়াছে, অনুমান করি।

কাহার, তাহা মনে পড়িতেছে না, কিন্তু এরূপ একটি মতবাদ আছে যে, আদিতে কাব্য ছিল না, সঙ্গীতও ছিল না, কেবল মন্ত্রই ছিল;—"ন কাব্যং ন চ সঙ্গীতং, কেবলা মন্ত্রশক্তিঃ"। এই মন্ত্রের মধ্যেই সঙ্গীত ও কাব্যের বীজ সুপ্ত ছিল, পরে তাহারা অনুকূল অবস্থায় মন্ত্রশরীর বিদীর্ণ করিয়া আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাব্য এবং সঙ্গীতের শৈশবে মন্ত্রের প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নয়; কিন্তু পরযুগের রসিকচিত্তে তাহারা আপন আপন মূল্যেই বিকাইয়াছে। আদিম সমাজে মন্ত্রের কাজ ছিল কর্মপ্রবর্তনায় নিজের অথবা অপরের, ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিগত ভাবে,— অহৈতুক শিল্পরসানুভবে নয়। মানুষকে কতকগুলি কাজ স্বয়ংপ্রণোদন ব্যতিরেকেই করিতে হয়; সম্মুখে বাঘ দেখিলে পলায়ন সে যান্ত্রিকভাবেই করে, যুক্তির জন্য বিলম্ব করে না, কিন্তু শস্যের বপন এবং আহরণ করিতে গেলে, অথবা জীবন বিপন্ন করিয়া গোষ্ঠীকে বাঁচাইতে গেলে তাহাকে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহার জন্য একটি বিশেষ মানসিক শক্তির প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে মন্ত্রই তাহাকে প্রেরণা দিত; মন্ত্রের সাহায্যেই সে আপনার ব্যক্তিত্বকে সমগ্র গোষ্ঠীচেতনার উন্মাদনায় ভরিয়া তুলিত; তাই তাহার নিজের অসুবিধা, নিজের বিপদ কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাহার কাছে খুব বড় বলিয়া ঠেকিত না। প্রাচীন যুগের শিল্প এই জন্যই মন্ত্রস্বভাব; শিল্পকৈবল্য সেকালে অভাবনীয়। প্রাচীন বৈদিক সূক্তে কাব্য এবং সঙ্গীতের এই মন্ত্রমূর্তিই আমরা দেখিতে পাই। ঋগ্‌বেদের ৭ম মণ্ডলে, ১০৩তম সূক্তে দেখি, মণ্ডূক দেবতা এবং বশিষ্ঠ ঋষি; সূক্তটি আর কিছুই নয়; পর্জন্যের প্রিয় জীব ভেকের নিকটে কৃষি-জীবী ঋষি ধন প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বর্ষার পরিপূর্ণ অনূপ-ভূমির তীরে তীরে কোলাহল-

মুখর, বিচিত্রবর্ণ, বিচিত্রকণ্ঠ, চঞ্চল মণ্ডুকদলের যে সংক্ষিপ্ত ছবিটি ফুটিয়াছে, তাহা এমনই একটি সরল মহিমায় মণ্ডিত যে তাহাকে কাব্য না বলিয়া উপায় নাই। ১০ম মণ্ডলের ৫৮তম সূক্তে মৃত ভ্রাতা সুবন্ধুর আত্মাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে আকাংক্ষা অজানিত সুদূর প্রদেশে অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের রাজ্যে, সুদূর সমুদ্রে, চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলে, অথবা দূরস্থিত পর্বতমালার উপরেও আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহার কাব্যমাধুর্য আধুনিক মনকেও আকৃষ্ট করে। কীট্‌সের Life of Sensations আধুনিক শিল্পের মূল উপজীব্য; তাহাতে যেখানে ভাবনা আছে সেখানেও কর্ম্মমুখীনতা নাই; কিন্তু উপরিউক্ত মন্ত্রগুলি কেবল কতকগুলি নিষ্ক্রিয় অনুভূতি অথবা ভাবনারই প্রকাশ নয়; তাহাদের মধ্যে একটি উন্মাদনাও আছে যাহা আদিমযুগের মানুষকে ইষ্ট-সাধনে প্রেরণা দিত।

সুতরাং কাব্য যখন মন্ত্রশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দ বিচরণ সুরু করিল, তখন নিশ্চয়ই বহু মনীষী এই নবীন শিশুটির বিস্ময়কর গতিবিধি এবং তাহার উদ্দেশ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়াছিলেন। ফ্রয়েড্ তাঁহার 'টোটেম্ এবং ট্যাবু' পুস্তকে বলিয়াছেন যে, আপনার ইচ্ছার উপরে বহিশ্চেষ্টানিরপেক্ষ একটি শক্তির আরোপ করা আদিম মানুষের স্বভাব; তাহার ঐ স্বভাবের জন্যই মন্ত্র এবং তদানুষঙ্গিক যাহা কিছুর উদ্ভব। কবিতা যে ঠিক সর্বার্থসাধক মন্ত্র নয় এ কথা প্রাচীনেরা বুঝিতেন, কিন্তু কী যে তাহার উদ্দেশ্য ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া নানা জনে নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক মতটি এই যে, কাব্য সেই প্রিয়া স্ত্রীর মত, যিনি মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আত্মারও কল্যাণ সাধন করেন।

আসল কথা হইতেছে, যে প্রাচীন সমাজে গরু হারাইলে তাহাকে খুঁজিয়া দিতে বজ্রপাণি ইন্দ্রের ডাক পড়িত, যে যুগে বর্ষাপ্লাবিত জলাভূমির চারিদিকে বহুবর্ণ, বিচিত্রকণ্ঠ, কোলাহলরত ভেকদলের নিকট বিস্মিতচক্ষু, ভক্তিবিহ্বল ঋষি ধন-প্রার্থনা করিতেন, সেই মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসপ্রবণ যুগের ও সমাজের পরিবর্তন হইলেও, শিল্প-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। যে সম্প্রদায় বৈদিকযুগে গীত রচনা করিতেন, তাঁহারাই পরযুগে বিশুদ্ধতর ছন্দে শব্দশিল্প রচনা করিয়া চলিলেন। ক্রমশঃ বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হইল, ছন্দ এবং অন্যান্য আঙ্গিক উন্নত হইল, এবং শিল্পের প্রয়োজনও ভিন্ন হইয়া পড়িল। এইভাবে সভ্যতার প্রসারে সাহিত্য এবং শিল্পের মন্ত্রযুগ যখন দূরে পড়িয়া রহিল, তখনই দেখিতে পাই ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা কাব্য বিশ্লেষণে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকগণ বলিতেছেন, কাব্যের আত্মা হইতেছে অলংকার; নির্ভূষণ বাক্য কাব্য নয়। বক্রোক্তিবাদিগণ আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সরল, সহজ বাক্য লৌকিক, তাহা কাব্য নহে। বাক্য আপনা আপনি না বাঁকিলে কাব্য হয় না। বক্র উক্তিই কাব্যকে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করে। সুতরাং এবংবিধ স্বভাবোক্তি:

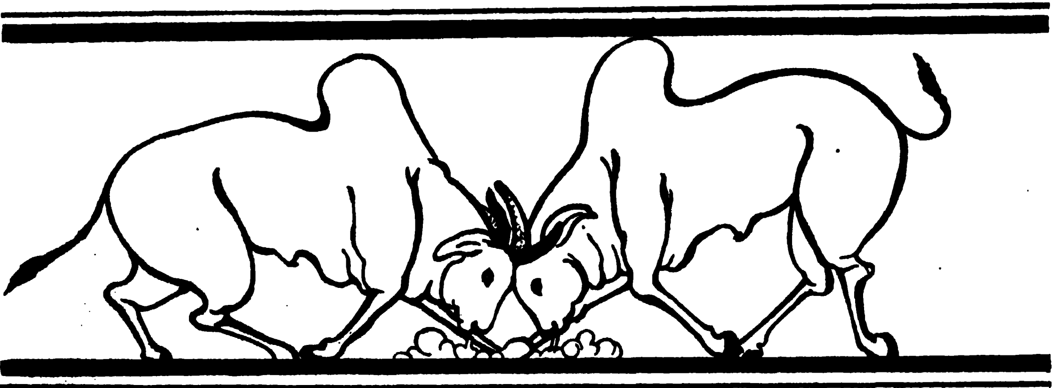
এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥ *

—তাঁহাদের মতে কাব্যই নহে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বর্তমানে যাহা লিখিতেছেন তাহা তাঁহাদের চোখে

* 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পড়িলে, তাঁহারা আনন্দবিগলিতাশ্রু হইয়া নৃত্য করিতেন সন্দেহ নাই। কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে যাঁহাদের কীর্তিকে কোনও পরবর্তী ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদ্ এখনও ম্লান করিতে পারেন নাই তাঁহারাই রসবাদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রসই হইতেছে কাব্যের প্রাণবস্তু। তাঁহাদের মতে কাব্য হইতেছে সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য, বিভাবানুভাবসমুদিত, বাসনানুরাগসুকুমার, স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার, রসনীয়রূপ।

সুতরাং দেখিতেছি, কাব্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল ব্যষ্টির ভাল লাগা, মন্দ লাগার উপর, যদিও তাহা সহৃদয় ব্যক্তির অপেক্ষা রাখে। আর্য্যজাতি যাযাবরত্ব ছাড়িয়া এখন স্থবির আত্মমুখীনতায় শান্ত হইয়াছে। সমাজচক্র শাস্ত্রসংহিতার দৈবনির্দেশে, পরাজিত দাসজাতির রক্তনিষেকে মসৃণ ভাবে চলিতেছে; নিরুদ্দেশ্য মননশক্তি এখন হয় অদ্ভুত, আত্মপীড়ক তপশ্চর্যায় অথবা সমাজনিরপেক্ষ কল্পনাসৃষ্টিতে চরিতার্থ হইতেছে। নিষ্কর্মার কাছে সংসার বিষবৃক্ষ; সুতরাং তাহার দুইটি অমৃতফল বা আফিঙ্‌ ফল অবশ্যতঃই লোভনীয়।



অপূর্ব্ব দম্পতি

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সকাল বেলা একটা কাক কেবলই আমার মুখের উপরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল, যেখানে যাই, উড়িয়া গিয়া সামনে বসে এবং ডাকিতে থাকে—ক—ক—ক অ—অ—অ। স্বরটা অলস শিথিল ও কিছু উদাস।

'দূর—দূর লক্ষ্মীছাড়াটা—'

শাশুড়ী বলিলেন—'গাল দিয়ো না, হয়ত ভাল খবর আছে—'

'সত্যি মা? তবে যে বলে কাকের ডাক ভাল না?'

'ডাক শুনলেই ভাল মন্দ বোঝা যায়—কেমন মিষ্টি ডাকছে—শোন না!'

'তা যদি হয়—বুঝলি রে? মিষ্টি খেতে দেব'—কাককে বলিলাম।

তুপুর বেলা একটা চিঠি পাইলাম, অপ্রত্যাশিত খবর যা আশা করি নাই,—জেঠিমা লিখিয়াছেন, সত্য চিঠি দিয়াছে, পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ না অযোধ্যা কোথায় আছে, এক বড়লোকের নজরে পড়িয়াছে এবং তাঁহারই কাছে চাকরী পাইয়াছে। কাকের উপর শ্রদ্ধা বাড়িল।

সত্য আমার পিসতুত ভাই—আমার চেয়ে অনেক বড়। মাতুল গৃহে দাদার যে অবস্থা ছিল সে না বলাই ভাল। মামারা অবশ্য ভালই বাসিতেন, কিন্তু জেঠিমা ও মা তু'চক্ষে দাদাকে দেখিতে পারেন নাই। তিন মাইল পথ হাঁটিয়া স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিক পাস করিল, বড় সাধ কলেজে পড়িবে, জেঠিমার এক তাড়ায় সব গেল বন্ধ হইয়া। একটা বছর বাড়িতে বেকার বসিয়া থাকিয়া এবং মামীদের গঞ্জনা সহিয়া সহিয়া শেষে একদিন দাদা নিখোঁজ হইয়া গেল। সে আজ চারি বছরের কথা।

দাদা বড় সুন্দর ছিল দেখিতে, স্বভাবটা ছিল চাপা ও রাগী। আমি দাদার সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম,—এবং আমি ছাড়া দাদাকে ভালবাসিতে, তুঃখ বুঝিতে আর কেউ ছিল না। দাদা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে বাপের বাড়ি আর যাই না বড়—গেলে সুখ পাই না—দাদার কথা তুলিলেই সকলের মুখ বেজার হয়।

সেই দাদার খবর মিলিল—এবং ভাল খবর।

বাপের বাড়ি গিয়া দেখি—দাদার কথা সকলেরই মুখে, দাদা চিঠিপত্র দেয়—মানুষ হইয়াছে—নিশ্চয়ই টাকা-পয়সাও করিয়াছে,—সুতরাং এখন দাদার আদর বাড়িলে আশ্চর্য্যের কি আছে?

আরও বছর তুই পর। তুপুরের ডাকে জেঠিমার চিঠি আসিল—দাদা বিবাহ করিয়াছে সেই বড়লোকের মেয়েকে, বধূর যৌতুক বাবদ তু'শো টাকা পাঠাইয়াছে সকলকে যথাযোগ্য উপহার দিতে।—আমার ভাগ্যে ননদ-পুঁটুলি ত একটা পড়িয়াছেই। জেঠিমা অনেক কিছু লিখিয়াছেন—

আমাদের দেশের নিয়ম-কানুন তারা কিছু জানে না—তাদের প্রথাও আমরা জানি না—তবে বধূর যাহা করণীয় অবশ্য করিবে বই কি।

খবরটা শুনিয়া যেমন আনন্দ তেমনি কৌতূহল হইল—দাদা পশ্চিম দেশে বিয়ে করিল কেন? দেশে কি বউ মিলিল না? সেই হাঁসুলি ও রূপার ভারি ভারি অদ্ভুত গহনা পরা—কপালে টিকুলী, পেটো পাড়িয়া খোপা বাঁধা, রঙে ছোপানো কাপড় কোঁচা দিয়া পরা বউ— দাদার সঙ্গে মানাইয়াছে কেমন? বউদির চেহারাটা কল্পনায় দেখিয়াই অত্যন্ত হাসি পাইল।

তবু বউদিকে দেখিতে সাধ হইল—যে-ই হোক বউদি তো বটে।—দাদার অপূর্ব্ব বিবাহের খবর পাইয়া দেশসুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে বউ দেখিতে এবং সস্ত্রীক আসিবার জন্য নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণের চিঠি চলিতেছে।

মাস দুই পর দাদার চিঠি পাইলাম—আমাকে লিখিয়াছে,—দাদার শ্বশুর বলিয়াছেন বউকে একবার আত্মীয়-স্বজনদের দেখাইয়া আনা কর্ত্তব্য। তাই দাদা সস্ত্রীক বাড়ি আসিতেছে—অতি অবশ্য আমি যেন যাই। আমি না গেলে দাদা বাড়িতে কোনই সুখ পাইবে না,—তা ছাড়া নূতন বউদিটিও আমার কথা দাদার কাছে শুনিয়া শুনিয়া আমায় দেখিবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব। চিঠি পড়িয়া বড় আনন্দ হইল,—ভাবনাও হইল—আহা—আমার হিন্দুস্থানী বউদিটি প্রথম দর্শনে ননদকে না জানি কি অপূর্ব্ব ভাষায় সম্ভাষণ করিবে—আমিই বা কি বলিয়া সেই নথ ও মল-ধারিণীকে অভিনন্দন জানাইব? আমাদের খাস পাঁড়াগাঁয়ের লোকেরাই বা কিরূপে বিদেশী বউটিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে।—আমার অমন দাদার কপালে কি শেষে একটা জংলী বউ জুটিল।

উগ্র কৌতূহল লইয়া পিত্রালয়ে চলিলাম।

বাড়িতে ঢুকিয়াই শুনিলাম আগের দিন দাদারা পৌঁছিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—'কোন ঘরে?'

জেঠিমা বলিলেন—'দক্ষিণের ঘরে—'

দাদা আগে বৈঠকখানায় থাকিত। যা হোক ভাল ঘরটা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

'বউ কই জেঠিমা?'

'ঘরেই আছে—মাগো, কি বউ বিয়ে করলে সত্য—দেশে কি পাত্রী মিলতো না? অমন সোনার ছেলে—'

ততক্ষণ আমি দক্ষিণের ঘরে পৌঁছিয়াছি—ঘরে পা দিয়াই বউ দেখিতে পাইলাম,—একদিকে একটা পুরাণো টেবিলের দুপাশে দুখানা চেয়ার ও টুল। ও পাশের টুলের উপরে বউ বসিয়া,—সোনালী জরিপাড় সবুজ রেশমের সাড়ী পরা—ঘন লাল রংয়ের একটি হাত-কাটা জামা, জামার গলায় ও হাতে সরু রূপালী জরি বসান। দুই হাতের আঙ্গুলে চার পাঁচটি আংটি—গলায় তিন চারিটি খাট লম্বা নানা গড়নের হার—সোনার তৈরি। কানে বড় বড় সোনার ঝুমকা। হাতে সোনার চওড়া কঙ্কণ, বাহুতে চওড়া তাবিজ—পাথর দেওয়া এবং মোটা ঝাঁপা দেওয়া। কপালে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ—মোটা মোটা দুইটি চুলের বেণী দু'পাশ দিয়া সামনের দিকে কাপড়ের উপর ঝুলিতেছে,

আগায় লাল ফিতার ফাঁস বাঁধা। একটি পা একটা জলচৌকিতে, আর একটি পা লাল ভেলভেটের চটি জুতার উপরে।

আমার কল্পনা লজ্জায় মুখ লুকাইল—গায়ের রংটি বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল—যেমন টানা কালো চোখ—তেমনি টানা ভুরু—তেমনি পরিপূর্ণ গঠন সর্ব্বাঙ্গের। আংটিগুলি আঙ্গুলে উঠিয়া যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী ধরণের নয়—বাঙ্গালীর কোমল চেহারাও নয়,—দেখিলেই বোঝা যায় বাঙ্গালী নয়—কিন্তু এমন আশ্চর্য্য তেজোদ্দীপ্ত সুন্দরী আমি আর দেখি নাই।

ঘরের একদিকে বিছানা—মোটা রঙ্গীন ফুলকাটা কভারে ঢাকা। অপর কোণে ষ্টোভ এবং কিছু হিন্দুস্থানী বাসনপত্র। চীনেমাটির চায়ের সেটও রহিয়াছে। ঘরখানার জীর্ণ সাজসরঞ্জাম বদল হইয়া এক সম্ভ্রান্ত বিলাসিতার ছাপ পড়িয়াছে সর্ব্বত্র।

বউয়ের সামনে এক পেয়ালা দুধ—পিছনে দাঁড়াইয়া একটি হিন্দুস্থানী মহিলা শাসন করিতেছে, বউয়ের মুখের ভাব প্রসন্ন নয়—সম্ভব বকুনি খাইয়া; আপন মনে আঙ্গুল হইতে একটা আংটি খুলিতেছে, আবার পরিতেছে,—কখনও টেবিলে গড়াইয়া দিয়া খেলা করিতেছে।

দাদা বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল—একটা জামা গায়ে দিয়া টেবিলের কাছে আসিতে আসিতে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অবাক হইয়া বলিল—'আরে তুই? কখন এলি? আয়—আয়—'

বউ একবার চোখ তুলিয়া আমাকে দেখিল—কৌতূহলও নাই—বিরক্তিও নাই—নির্ব্বিকার ভাবে।

একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম—তখনি মনে হইল—বউ তো আমায় চেনে না। দাদা বলিল—'আয়, চা খাবি আয়—ওঃ কতকাল পরে দেখা।'—নিজের চেয়ারটা আমাকে সরাইয়া দিয়া দাদা আর একটা চেয়ারের উপর হইতে ছোট দুটা বাক্স মাটিতে নামাইয়া সেইটা টানিয়া লইয়া বসিল। বউকে বলিল—'এই অশোকা—'

অমনি বউয়ের মুখে ফুটিল হাসি—উঠিলও না—কথাও বলিল না—শুধু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

হিন্দুস্থানী মেয়েটি আমাদের চা দিল—মোহনভোগ, পাঁপড়ভাজা ও লাড্ডু দিল। আমি বলিলাম—'বউয়ের নাম কি দাদা?'

'সরস্বতী।'

বউ আবার হাসিল। বউ দেখিতে দেখিতে আমি চায়ের পেয়ালা ভুলিয়া গিয়াছি।

'বউকে চা দিলে না যে?'

'শরীর ভাল নেই,—তাই দুধ দিয়েছে—তা খাচ্ছে না।'

শরীর খারাপের কোনই লক্ষণ নাই,—তবু বলিলাম—'কি হয়েছে?'

'রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি—বার বার জেগে উঠছিল—যে গরম—তায় নতুন জায়গা—'

ওরে বাবা,—এক রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে বউ মানুষের অসুখ করে—এমন কথা এই গৃহস্থ-

ঘরে জন্মেও কেহ শোনে নাই। বউয়ের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল দুধে তাহার রুচি নাই—এই জন্যই ঝি শাসন করিতেছিল।

দাদা আমার দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেছিল—পশ্চিমে থাকিয়া দাদার স্বাস্থ্যও যেমন ভাল, চেহারাও অনেক বেশি সুন্দর হইয়াছে—চিক্কণ মিহি জামা-কাপড়—দামী জুতা পায়ে। হাতের আঙ্গুলে একটি হীরার আংটি।

ও দিকে বউ নিঃশব্দে চট করিয়া নিজের দুধের পেয়ালাটি দাদার সামনে সরাইয়া রাখিয়া দাদার চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়াই নিজের মুখে ধরিল—সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করিয়া হাসি। হাসির সেই মিষ্ট মধুর সুর ঘর ভরিয়া বাজিতে লাগিল,—অবিশ্রান্ত হাসি,—থামে না।—

এতক্ষণ মহিমময়ী দেবীর মত যে চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল—তাহার মধ্যে তবে মানুষের দুষ্টামি-বুদ্ধিও আছে! এমনি করিয়া প্রথম দর্শনেই সরস্বতী অর্থাৎ আমার বউদি আমার হৃদয় কাড়িয়া লইল।

সরস্বতীর বাবা বড় ব্যবসায়ী—নামকরা লোক। পশ্চিমে নানা জায়গায় অনাথের মত ঘুরিয়া দাদা তাঁহার কাছে চাকরীপ্রার্থী হইল, চাকরী মিলিল—হিসাব রাখিবার,—অর্থাৎ মুহুরীগিরি। তারপর দাদার চেহারা ও অবস্থা দেখিয়া মায়া হইল—পরিচয় লইয়া নিজের পরিবারভুক্ত করিল—অল্প দিনেই দাদা বুদ্ধি ও বিশ্বাসের পরিচয়ও দিয়াছিল, একবছর পরে কারবারের অংশীদার হইয়া গেল। এক কথায় দাদা প্রথম হইতেই শ্বশুরের সুনজরে পড়িয়াছিল।

এর মধ্যে বিধাতা করিলেন কৌতুক। সরস্বতী বাঙ্গালীকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

চোখের দেখা শুধু—দাদার অন্দরে গতিবিধি ছিল না, বাদশাজাদী যেমন কালাপাহাড়কে বাতায়ন হইতে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়া বরণ করিয়াছিল—তেমনই আর কি! তবে সরস্বতীরা তত পর্দ্দানশীন নয়—বাপের সঙ্গে দেশ-বিদেশ বেড়ায়, তখন দাদাও অনেকবার সঙ্গী হইয়াছে। শ্বশুর উদারমনা লোক, তাঁর সন্তানের মধ্যে এক সরস্বতী, খুসী মনেই বাঙ্গালীর হাতে কন্যাদান করিলেন।

স্বামীকে যে ভালবাসে, স্বামীর দেশকেও সে ভালবাসিবে নিশ্চয়। আগ্রহ করিয়াই সরস্বতী আসিয়াছে এখানে। আনন্দরূপিণী ধনীর দুলালী পরদেশী মেয়েটি নিজের আভিজাত্যগর্ব্বে আলাদা হইয়া থাকে না—সকলের সঙ্গে মিশিতে চায়—কিন্তু না বোঝে সে কারো কথা—না কেউ বোঝে তার কথা।

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে—পল্লীর অতি সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের কাজকর্ম্ম চালচলন সবই তার কাছে অপূর্ব্ব অভিনব। যা দেখে, অবাক হইয়া যায়। কিছুই বোঝে না, শুধু হাসে। মা কি জেঠিমা যখন কাহাকেও গালাগালি করেন সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—তাহার হাসি দেখিয়া তাঁহারা সংযত হইয়া যান। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া মাছ তরকারী কাটা—বহু রকম রন্ধন-প্রণালী দেখে আর হাসে। বাঙ্গালীর খাদ্য তারা খায় না,—লখিয়া রাঁধে,—মোটা পরেটা, আতপ চাল, অড়হর বা ছোলার ডাল—নানা রকম মিঠাই লাড্ডু।—

লখিয়া সরস্বতীর ঝি—সর্ব্বদা সরস্বতীকে আগলাইয়া রাখে। বিবাহ-ব্যাপারে সেই ছিল সরস্বতীর প্রধান সহায়।

হায় রে!—দেশে আসিয়া সরস্বতীর কি দশা হইল। এ রকম আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব বিবাহ তো কেহ দেখে নাই,—গ্রামে বিপুল আলোড়ন উঠিল। দিনরাত্রি বাড়িতে বিষম ভিড়—বউ দেখিতে আসার বিরাম নাই।

কয়েক দিন পরে অপরিচয়ের প্রথম কুণ্ঠাটা ভাঙিলে আরম্ভ হইল সমালোচনা—সরস্বতীকে মেয়েরা সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে—বেচারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল,—'এই তাবিজ জোড়া ষোল ভরির কম না—ওমা পশ্চিমের গয়না ত আমাদেরই মতন কতকটা—কত রঙের পাথর,—আচ্ছা এগুলো কাঁচ না পাথর?'—সরস্বতীর গলা হাত আঙ্গুল নাড়াচাড়া করিয়া অসঙ্কোচে এই রকম আলোচনা করা আমার ভাল লাগিত না,—যখন তখন যে সে ইচ্ছামত গায়ে হাত দিতেছে—সরস্বতী আদৌ পছন্দ করে না—সেটা তার কুঞ্চিত ভ্রূ দেখিয়াই বুঝিতে পারি,—লখিয়াও চটিয়া যায়।

বলিলাম—'ও রকম ওকে বিরক্ত কর কেন?'

—'ইস্!—তোর তো বড্ড দরদ!—নতুন বউ এলে এমনি করেই লোকে দেখে।'

কেহ বা হাসিয়া সরস্বতীর গায়েই ঢলিয়া পড়ে। যেখানে লখিয়া রাঁধে—সেখানেই বা কি ভিড়—কি সমালোচনা! কয়েক দিনের মধ্যেই সরস্বতী বিব্রত হইয়া উঠিল,—আর ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না—তাহাতেই কি নিস্তার আছে? অতঃপর তাহার ঘরেই আড্ডা বসিতে লাগিল। কৌতূহল আর ফুরায় না,—সমালোচনাও থামে না,—ভাষা না বুঝিলেও ভাব বুঝিতে দেরী হয় না,—দিনে দিনে সরস্বতী কেমন ম্লান হইয়া উঠিল। অমন সুন্দর শোভন কাপড় পরিবার রীতি তার—তারই বা কত ব্যাখ্যানা!—কেহ কেহ কাপড় পরা শিখাইয়া দিতে আসে।

এক এক সময় আমি ঘরে খিল আঁটিয়া দিয়া বসি—তখন সরস্বতী খুব খুসী হয়। আমি ও ও দাদা গল্প করি, বালিকার মত সরস্বতী একবার আমার দিকে, একবার দাদার দিকে চায়,—দাদা বুঝাইয়া দেয়, তখন হাসে—প্রত্যেকটা কথা বোঝানো চাই—একটু দেরি হইলে অমনি ঠোঁট ফুলায়।

দাদার সঙ্গে তার ব্যবহারে কোন লজ্জা নাই—ভাণও নাই,—এক থালায়ই দু জন খাইতে আরম্ভ করিল,—কিম্বা পান লইয়া কাড়াকাড়ি করে,—হয়ত দাদা তার কপালের চুল সরাইয়া দিল—কিম্বা কাণের ঝুমকা ঠিক করিয়া দেয়। সেও হয়ত দাদার কোন কথায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া দাদারই পিঠে মুখ লুকায়;—দাদার হাঁটুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাদের গল্প শোনে।

আমার মত ভক্ত ইহাদের আর কেহ ছিল না। সরস্বতী আমাকে আন্তরিক ভালবাসে সেটা বুঝিয়াছি।

ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিতে থাকিতে সরস্বতী ক্রমে হাঁপাইয়া উঠিল। এক এক সময় দেখি ঘন কোঁকড়া চুলগুলি বালিশে মেলিয়া দিয়া সে শ্রান্ত অলস ভাবে শুইয়া আছে—এই পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে কোথাও তাকে খাপ খায় না, কিছুতেই মিশিতে পারে না—এ কি কম শাস্তি?

বলিলাম—'দাদা, তুমি ওকে নিয়ে যাও—'

দাদা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—'কেউ না বললে—'

'আচ্ছা আমি বলাচ্ছি—'

কেহই রাজী হইল না। দাদার উপর সকলেরই মায়াটা হঠাৎ বড় বেশি হইয়া গিয়াছে। 'সেকি কথা—এতকাল পরে এলো, একটু আদরযত্ন পেয়ে উঠছিনে—একদিন পিঠে করলাম না, ছাতুর দেশে কি বা ছাই খায়—বাড়ীর বড় ছেলে ওরই তো সব—এখুনি যেতে দিচ্ছি আর কি!'

দাদার মন ভাল—সব ভুলিয়া গেছে। সকলকেই দামী দামী জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়াছে, কত টাকা খরচ করে—যে যখন যা চায় অমনি দেয়। তারই বউ—এমন বউ—তার উপর মা জেঠিমার আন্তরিক স্নেহ কই? মেয়ে-মহলের অত্যাচারে তাঁরাও তো বেশ যোগ দেন দেখি।

একদিন ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া সরস্বতী দাঁড়াইয়া আছে, পাড়ার মেয়েরা সরস্বতীকে নিজেদের বাড়ী বেড়াইতে লইয়া যাইতে আসিল—জেঠিমা বলিলেন—'বেশ তো নিয়ে যাও না।'

এটা অন্যায়—নূতন বউ কোথাও যায় না, নিজেদের বউয়ের বেলা ত এত উদার দেখি না।

মেয়েরা অমনি সরস্বতীকে ঘিরিয়া ধরিল, সরস্বতী আমার দিকে চাহিল—আমি হিন্দী বাংলায় মিশাইয়া অনেক চেষ্টায় বুঝাইয়া দিলাম—'এরা তোমায় এদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইছে।'

সরস্বতী মাথা নাড়িল।

প্রশ্নবৃষ্টি সুরু হইয়া গেল—'কেন? কেন? কেন যাবে না? আমরা কি পর? যেতেই হবে—ছাড়ছিনে—'

সরস্বতী আবার আমার দিকে চাহিল, আবার বুঝাইলাম, 'এরা ছাড়বে না।'

সরস্বতী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল, সে কথা বলিলে সকলে হাসে, কাজেই আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলে না।

এবার সকলে রীতিমত টানাটানি লাগাইল। কেহ পিছনে, কেহ সামনে, কেহ হাত, কেহ কাঁধ ধরিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল, সরস্বতীর গায়ে জোরও আছে—অনায়াসে সকলের হাত ছাড়াইয়া ঘরের ভিতর পিছাইয়া গেল।

তখন কি ঠাট্টা বিদ্রূপ, পরাজয়ের লজ্জায় কি তীক্ষ্ণ সমালোচনা! 'অত ভারি গয়না নেই, কোঁচা ঝুলিয়ে কাপড় পরি নে,—তা বলে আমরা মানুষ নই? ওমা কি অহঙ্কার, কি দেমাক! হলেই বা বড়মানুষ—পশ্চিমে ভূত—তার আবার এত? গরবে বাঁচেন না।'

লখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছে। ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া স্থির প্রতিমার মত সরস্বতী মেয়েদের মুখের ভঙ্গী ও হাত মুখ নাড়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে বুঝিবে এমন কেহ নাই সংসারে—সে যেন একা।

মানায় না—একটু মানায় না।—বাংলার নিতান্ত পল্লীগ্রামের এই অশিক্ষিতা সাধারণ জ্ঞান-বোধহীনা নারীদলের মধ্যে সরস্বতীকে একেবারেই মানায় না।

সরস্বতীর পক্ষ লইয়া আমি কিছু বলিলে বিষম ঝগড়া বাধিত, তবু দুই চারি কথা বলিলাম—উত্তরে শুনিলাম হাজারখানেক।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে গিয়া দেখি—দাদা বিছানায় বসিয়া,—সরস্বতী দাদার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া অবসন্ন ভাবে পড়িয়া আছে,—দাদার মুখ বিষণ্ণ।

পরের দিন জরুরী চিঠি আসিল—কারবারে কাজে অবিলম্বে দাদাকে যাইতে হইবে।

বাঁচা গেল।—এই মুহূর্ত্তে এই ব্যবস্থা ছাড়া সরস্বতীর আর কি উপায় ছিল? দাদা তো নিজ হইতে যাইতে পারিত না—সংসারে যতই লাঞ্ছনা থাক—প্রতিবাদ বা আঘাত করিতে সে কোন দিনই জানে না।

অনেক হা হুতাশ 'আহা' 'উহু'র মধ্যে দাদারা যাত্রা করিল—বিদায়-মুহূর্ত্তে রাজবধূর মত সরস্বতী সাজিয়া বাহির হইল—আমার হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'বহিন—দিদি—'

আর কি বলিতে চাহিয়াছিল—হয়ত ভাষায় কুলাইল না কিম্বা আবেগে গলা ধরিয়া বলিতে বাধিল।—লখিয়াকে দেখিলাম বড় প্রফুল্ল,—সে মনের মত করিয়া সরস্বতীকে সাজাইয়া দিয়াছে। যে সাঁচ্চার কাজ করা নীল রংয়ের বেনারসী সরস্বতী পরিয়াছে—খুব কম বড়লোকেই তা কিনিতে পারে,—বাক্সে যে গহনাগুলি ছিল তাও গায়ে উঠিয়াছে,—একখানা চিক্কণ ফিকে গোলাপী রেশমী ওড়না মাথায় দেওয়া—খোঁপার গহনা স্পষ্ট দেখা যায়।

নূতন বাড়িতে যে নূতন অপরূপ ভাব ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তা পিছনে ফেলিয়া সরস্বতী চলিয়া গেল।

ইহার পরে বছর তিনেক কাটিয়াছে,—সরস্বতীর একটি মেয়ে হইয়াছে। সে আমাকে ভোলে নাই—দাদার চিঠিতে সেটা জানিতে পারি।

দাদার শ্বশুর কলিকাতায় একটা বাড়ি করিয়াছেন,—জামাই বাঙ্গালী—সুতরাং বাংলা দেশে একটা বাড়ি থাকা ভাল। তাছাড়া ব্যবসার কাজের জন্যও কলিকাতায় মাঝে মাঝে আসিতে হয়,—সবচেয়ে জরুরী দরকার—সরস্বতী সিনেমায় বাংলা ছবি দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং বাংলা দেশের উপর টানটাও কম নয়।

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ-চিঠি পাইলাম—দাদা সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছে—আমাকে যাইতে হইবে—সরস্বতী আমায় দেখিতে ভয়ানক ব্যগ্র।

কলিকাতায় তাহাদের নূতন বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। ভিতরে গিয়া দেখি লখিয়ার কোলে একটি শিশু,—মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম দাদার মেয়ে। তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছি—পিছন হইতে কে কানের কাছে মিষ্টি সুরে বলিল—'ভাইঝি বড় না বউদি বড়?—'

ফিরিয়া দেখি সরস্বতী।—ভিজে চুলের এক গোছা পিছনে এক গোছা সামনে—গা ভরা তেমনি গহনা, লাল রংয়ের সাড়ী পরা—পরিবার ধরণটি হিন্দুস্থানী,—অর্দ্ধেক বাঙ্গালী অর্দ্ধেক হিন্দুস্থানী মেয়েটি যেন দুই দেশের মিলনের ছবি!—কি সুন্দর বাংলা বলিতে শিখিয়াছে!—প্রথম দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম অপরিচয়ের মৃদু আলোকে, আজ দেখিলাম আমার চিরপরিচিত কল্যাণময়ীকে বিদেশী ভাষার বাধার ঊর্দ্ধে—আমার অন্তরের অতি কাছে।

বলিলাম—'তোমার চেয়ে আমার ভাইঝি বেশী সুন্দর—'

'বেশ—বেশ—ভাই সুন্দর—বহিন সুন্দর—তাদের বাড়ীর মেয়ে কেন না সুন্দর হবে? আমাকে কে দেখে? কে জিজ্ঞেসা করে?'—বলিয়া ঠোঁট দুটি ফুলাইল।

বাঃ—বাঃ—বাঙ্গালী কথার কায়দা ও শিখিয়া ফেলিয়াছে। খুবই ভাল লাগিল—তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিলাম।

কথা বলিতে বলিতে ভিতরে আসিলাম—সরস্বতী বলিল—'রোজ পথ চেয়ে থাকি—খবর দাওনি কেন? ইষ্টিশানে গাড়ী নিয়ে যেতাম—'

আমার অপেক্ষায় রোজই সে ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া খাবার তৈয়ারি করিতে বসে—সেই কথা বার বার তাহার নিজস্ব বাংলায় আমাকে বুঝাইয়া দিল।

অবিলম্বে টেবিলে চা দেওয়া হইল।—মোটা খাস্তা পরেটা, আলুর ছক্কা, পেস্তা দেওয়া মোহন-ভোগ—মতিচুর—সবই সরস্বতীর হাতের তৈয়ারি।

বাংলার মিহি সরু চাল—তাও পুরাণো,—মাছের ঝোল, সুক্তো—দুর্ব্বল বাঙ্গালীযোগ্য পথ্য। খাদ্য বলিতে হয় পশ্চিমদেশবাসীর।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সরস্বতী সুন্দর বাংলা বল্‌তে শিখেছে ত? কে শেখালে?'

দাদা সগর্ব্বে বলিল—'আমি, আমার মত মাষ্টার কোথা পাবে তোর বউদি?'

সরস্বতী হাসিল। আমি বলিলাম—'লিখতে পারে না?'

সরস্বতী বলিল—'পারি।'

'তবে নিজের হাতে চিঠি লেখনি কেন?'

দাদা বলিল—'ওরে বাপ্‌রে!—তোর বৌদির গরব কত! বলে—তোমার চেয়ে যখন ভাল লেখা হবে—তখন চিঠি লিখ্‌বো—'

'তা হয়েছে নাকি?'

'উঁহু—' দাদা উঠিয়া গিয়া একখান খাতা লইয়া আসিল—পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে খাতা ভরিয়া স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ লেখা।

সরস্বতী বলিল—'খুব বেশী দেরি নাই, না দিদি?'

'না—মোটেই না। দাদা, তুমি হেরে গেলে—দশ বছর তুমি লেখাপড়া করেছ—ওর তো মোটে তিন বছর—পাঁচ বছর না হতেই তোমার চেয়ে ঢের ভাল লিখ্‌তে পারবে বউদি—'

'সেটা ত ভাল কথা নয়। শেষে কি গুরুকে ছাড়িয়ে যাবে?'

সরস্বতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দাদা বলিল—'তোর বউদি দেশে যেতে চায়।'

'সত্যি বউদি?'

'হেঁ দিদি,—কিছু জানি নাই—বুঝি নাই—কারো ভাল লাগতো না—এবার আমাকে ভাল লাগবে—না দিদি? লাগবে না?'

সরস্বতীর কথা কিছু হিন্দী মিশানো বাংলা,—কি মিষ্ট শুনিতে!

যে বিদেশিনী রূপে ধনে মানে প্রেমে আমার অভাগ্য দাদার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিয়াছে—স্বামী সন্তান সুখ সৌভাগ্য তার অপর্য্যাপ্ত—তবু নিজের দেশ ও কথা ভুলিয়া স্বামীর দেশ ও কথা নিজের করিয়া লইতে চায়। হৃদয়ে বুঝি লুকানো একটা ব্যথা আছে—তাই সে অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা শিখিয়াছে—বাংলা দেশের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিতে—। কিন্তু সেদিনের সেই মনোরমা বালিকাটিকে যারা ব্যথাই দিয়াছিল—আজ বাঙ্গালিনী সাজিয়া সরস্বতী কি তাহাদের জয় করিতে পারিবে?

কতকগুলি অনাদৃত, পুরাতন পুস্তকপুঞ্জের উদ্দেশে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

পুরাণো সিঁদুরের দাগলাগা একটা আল্‌মারির নিভৃত কোণে
তোমরা ছিলে!
কত জন এল, গেল—
তোমাদের দিকে চেয়ে
কা'রো বা মনে এল সম্ভ্রম
কা'রো বা অজ্ঞানের উপেক্ষা!
তোমরা ছিলে তোমাদের নিরালা কোণে
তোমাদের জীর্ণ পাতা, জীর্ণ মলাটে
সোনার জলে লেখা নাম—
বন্ধ আল্‌মারির কোণের ধুলো, গুঁড়ো গুঁড়ো কাঠ,
আর অদ্ভুত সব শুঁড়ওয়ালা বইএর পোকার
অনলস কাজের মধ্যে
একে আর একজনের গায়ে হেলান দিয়ে
কাটিয়ে দিলে অনেক বছর।

বাইরের মাঠে ফুটেছে আকন্দ, রজনীগন্ধা,
আর সিঁজুকাঁটার ফুল।
কাঁটা-তার-লাগানো আম্‌ড়া গাছের পাতার মধ্যে
ধরেছে আমেরই মত ঝিরি ঝিরি মুকুল
তারপরে ধরেছে কসি কসি ফল—

পাশের বেলীফুলের বাগান থেকে
অতর্কিত গন্ধের উচ্ছ্বাস
মন করেছে চঞ্চল,
সারি সারি নারিকেলকুঞ্জের
হিলিমিলি পাতার মধ্যে লেগেছে দক্ষিণার উৎসব—
ডোবার ধারের ফালি পথ ধ'রে
হেঁটে গিয়েছে কত লোক—
কত বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত হ'য়ে এসেছে পার—
তোমাদের পাশের জানালা খোলা হ'য়েছে কতবার।
তোমাদের নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যের পাশেই
কত তরুণীর মিলন-নিঃশ্বাস ঘরের বাতাসকে
করেছে আকুল;
আবার ঘনিয়ে এসেছে কত অশ্রুকরুণ বিরহ রাতি
কত উৎসব, কত পূজা-পার্ব্বণ, কত ধূমধাম—
কত রোগ, কত শোক আর কত মৃত্যু—
পোকায়-কাটা-পাতা আর সোনার জলে লেখা নামের মধ্যে
তোমরা ছিলে তোমাদের বচন আর বচনাতীতকে নিয়ে
কতজনের বিস্ময়স্তিমিত চোখের পাতার স্পন্দন
আজ এল আমার মনে—
পুরাণো একটা আল্‌মারির নিভৃত কোণে
তোমরা ছিলে।

* * তোমরা চেনো আমাকে
আর আমি চিনি তোমাদের :
মাঝের দীর্ঘ ব্যবধান পার হ'য়ে
আজ এলে তোমরা আমার কাছে
অনেকদিনের পুরাণো জীর্ণ পত্রের মধ্যে
আমি খুঁজে পাই আমার শৈশব, আমার কৈশোর—
খুঁজে পাই সেই দুর্লভ আগ্রহ, আর আকুল স্বপ্নের ভুবন !
সামান্য কতকগুলি অক্ষরের মধ্যে
মানব মহামনের স্পন্দন এসে লাগ্‌ত সেদিন
নির্জ্জন গৃহকোণে—
কেরোসিনের আলোর সম্মুখে
তোমাদের ক'রেছিলাম আবিষ্কার !
ঘনবর্ষার রিমিঝিমি ছন্দে,
বাদ্‌লা পোকার পাখার বর্ষণে,
আর হাস্নোহানার ঝোপ থেকে ভেসে আস্‌ত যে সৌগন্ধ,
তা'রই মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলন
সে কি ভুল্‌বার !

*

সেদিনের সেই যবনিকা তুলে
একে একে চ'লে এলে তোমরা
আমার এই স্তিমিতশিখ জীবনের প্রদীপ-আলোকে,
যখন ধূলোর ধূলোটে বাজে বৈরাগ্যের সুর,
যখন চুপ ক'রে চেয়ে থাকতেই ভালো লাগে,
একবৃত্ত চক্রগতি জীবনের ভারি গুমোট
যখন মনকে করেছে স্মৃতির শ্লোমন্থ-মন্থর—
সেদিন থেকে এই রকমের দিনগুলিতে এলে চ'লে।
আজ তোমাদের মলাটের ধূলো ঝেড়েই আমার সুখ—
পোকার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাব ভেবেই আনন্দ।
আর এই ভেয়ে আনন্দ,
পাতাগুলো খুলব যখন,
তখন সেদিনের সেই যবনিকা তুলে দিও তোমরা
—সেখান থেকে ভেসে আস্‌বে নিভৃত রজনীগন্ধার গন্ধ
আর শ্যামায়িত বনশ্রেণীর সুদূর সঙ্কেত
আর, হয়ত সেই জীবনের কোনো একটা দিনের
স্বর্ণহরিৎ অপরাহ্ণের স্বপ্ন !



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

কলিকাতায় কিছুদিন আগে 'বোমা-সপ্তাহ' উদযাপিত হইয়া গেল। কোথায় ইউরোপে যুদ্ধ, তাহার বোমা ছিটকাইয়া আসিয়া কলিকাতায় পড়িবে বলিয়া পোষ্ট অফিসে ঠেলাঠেলি ভিড়, যে যাহার টাকাকড়ি দেশের বাড়িতে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে, বোমার ঘায়ে না উড়িয়া যায়। ইহার পরও যে বলিবে, এ জাতের বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি নাই, সে নিজেই মূর্খ।

বুদ্ধি নাই তো আমাদের আছে কি? দূরদৃষ্টি আমাদের চিরকালই প্রখর ও প্রসিদ্ধ। এত দূরপ্রসারী যে, সে টেলিস্কোপের দৃষ্টিতে নিকটের বস্তুর ছায়াও পড়ে না; পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া সে দৃষ্টি পরকালের চিলেকোঠায় গিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে। এই দূরদৃষ্টিই আর্যসন্তানের বিশেষত্ব।

*

একমাত্র দুঃখের কথা, সেই পরকালের চিন্তাও শান্তিতে করিবার যো নাই। বেয়াড়া বৃষ্টি মাথায় পড়িয়া গোল বাধায়, তাহাকে ঠেকাইতে বটপত্রের খোঁজ করিতে হয়। মাঝে মাঝে সেই বটপত্র দমকা হাওয়ায় নড়িয়া উঠে, হঠাৎ ভয় হয় বুঝি উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি।

*

টাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বাড়ি পাঠাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু উপায় নাই। চাকুরিটি কলিকাতায়। প্রাণ গেলে পুনর্জন্ম হয়; না হইলে তো বাঁচিয়াই গেলাম। চাকুরি একবার গেলে হওয়া শক্ত।

অগত্যা যে প্রকারে হউক টিকিয়া থাকিতেই হইবে। ভরসার মধ্যে নিজের বাড়িতে থাকি না, বোমা যদিই পড়ে, ভাড়াটে বাড়ির উপর দিয়া যাইবে। এখন শুধু একটু মজবুত দেখিয়া বাড়ি দেখা দরকার। ভাগনেকে বলিলাম, খোঁজ করত, টাওয়ার হাউসের একতলায় ঘর খালি আছে কি না। সেখানে ঘর পাইলে তবু একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি, উপরে ছ'তলা প্রমাণ ইমারত না ভাঙিয়া বোমা আসিয়া নীচে পৌঁছিতে পারিবে না।

সে খবর আনিল, ঘর নাই।

*

কি করি, ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠিল। একটা বড় পাগড়ি বাঁধিলে হয়। পাগড়ির মধ্যে গোটাকতক স্প্রিং বসাইয়া লইলে তো আরও ভাল।

প্রলয়ের দেবতা শিব কিন্তু বুদ্ধিমান ছিলেন। পরকে মারিয়া বেড়াইতেন, আত্মরক্ষার ফিকিরও জানিতেন। মাথায় একরাশ জটা আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গার ধারা, হাজার বোমা পড়ুক, তাঁহার ভয় ছিল না। জটায় বোমা আটকাইয়া যাইত, আঘাতের অভাবে ফাটিত না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইত। বিউবনিক প্লেগের বীজাণু পড়িয়াও সুবিধা করিতে পারিত না। জাহ্নবীর পবিত্র বারি ঘোরতর বীজাণুধ্বংসী, একাধারে গোবর কার্বলিক পটাশ পার্‌মাঙ্গানেট অমৃত ও লাইজলের বিচিত্র সমন্বয়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, শিব অমর ন'ন। সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃতটা অন্য দেবতারাই সাবাড় করিয়াছিলেন, শিবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। অথচ তাঁহাকেই সারাক্ষণ প্রলয় ভূমিকম্প ও রোগবীজাণু প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া কারবার করিতে হয়। অ্যান্টিসেপ্‌টিকের বন্দোবস্ত সঙ্গে না রাখিয়া তাঁহার রক্ষা আছে!

*

বিপদ আমাদের। না আছে জটা, না আছে টাক, আমরা মাথা বাঁচাই কি দিয়া? মাথায় স্যাণ্ড-ব্যাগ লইয়া তো আর বেড়ানো যায় না। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া জটাই একপ্রস্থ বানাইয়া ফেলিব কি না ভাবিতেছিলাম। বানানো অবশ্য সোজা কথা নয়, গোড়ায় কেশরঞ্জনের সার ঢালিলেও প্রমাণ সাইজের একটা জটা খাড়া করিতে কমপক্ষে দুই বছর লাগে। ততদিনে কেলেঙ্কারি যা হওয়ার হইয়া যাইবে, জটা যখন সারা হইবে, তখন মাথাটা থাকিবে কি না তাহাই ঘোর সন্দেহ।

*

তবুও ভবিষ্যতে আশা রাখিতে হয়। ইতিমধ্যে একটু সুবিধাও হইয়া গেল। যুদ্ধ বাধিয়া ন'টাকা দরের লোহা ছ'চল্লিশ টাকায় উঠিয়াছে, এবং লোহাই কাঁচি ও ক্লিপের র-মেটিরিয়াল, এই বলিয়া হেয়ার কাটার সেলুনে চুলকাটার দর তিন আনা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা হইল। অগত্যা এই যুদ্ধটা শেষ হইলে পরেই চুল কাটিব মনে করিয়াছিলাম। দেড় মাস না কাটিয়া ঘাড়ের গোড়ার চুল সওয়া ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে, এবং জটা একটা বানানো সম্ভব হইলেও হইতে পারে, এই কথাটা মনে উদিত হইয়াছে, এমন সময় তিনকড়িদা আসিয়া দেখা দিলেন। হাতের খবরের কাগজখানা আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, ওহে, বোমা কি সত্যই পড়িবে? তোমার কি মনে হয়?

একই প্রশ্ন দিনে লক্ষবার করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে শুনিলে তাহার মাধুর্য আর কানে লাগে না। অনভ্যস্ত চুলের ভারে মাথার মধ্যেও সারাক্ষণ কুট্‌কুট্‌ করিতেছিল। অকারণে চটিয়া কহিলাম, পড়িবে যখন, টেরই পাইবেন।

তিনকড়িদা নাছোড়বান্দা। কহিলেন, আহা সে তো পাইবই। কিন্তু তোমার কি মনে হয়, বল না শুনি।

কহিলাম, আমার মনে হয়, বোমা কিছু পড়াই দরকার। জঞ্জাল কমিত।

তিনকড়িদা বিস্মিত হইলেন মনে হইল। কহিলেন, জঞ্জাল বলিতেছ কাহাকে ?

আমি কহিলাম, জঞ্জাল সকলেই। এরা ওরা এবং আরও অনেকে। আপনি। আমিও।

শেষ পর্যন্ত তিনকড়িদা শুনিলেনও না। হঠাৎ উঠিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম তিনি চটিয়াছেন।

*

কিন্তু চটিলে আমি কি করিব ? আমার নিজের মত চাহিতে তাঁহাকে আমি তো বলি নাই। তিনিই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তর যেখানে হজম করিতে পারিবেন না, সেখানে প্রশ্ন করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

তিনকড়ি দা চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। বাহিরের কুটকুটুনি কিছুটা প্রশমিত হইলে অভ্যন্তরটাও একটু শীতল হইয়া আসিল। তখন মনে হইল, কড়া কথাটা না বলিলেও হইত।

*

অথচ কম দুঃখে কথাটা বলি নাই। দেবাংশে-জাত আর্য সন্তানদের কারিকুরি যতই দেখিতেছি, ততই মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। পুলকে নয়, ধিক্কারে ও বিবমিষায়। মনে হইতেছে, কি হইবে এই জাতের বাঁচিয়া ?

এই ক'দিন আগের একটা ঘটনা বলি। বঙ্গদেশেরই কোন শহরে একটি শিক্ষায়তনে ছাত্রদের মধ্যে 'বিক্ষোভ' চলিতেছিল। তাহাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন নবাগত ব্যক্তি তাহাদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন ও অপমান করিতেছেন; ইহাকে অপমান করিয়া উহার নামে কুৎসা ও কুরুচিপূর্ণ উক্তি করিয়া, পরস্পরের নামে মিথ্যা কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে দলাদলি মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছেন। অভিযোগটা সত্য, এবং তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত দেখিলাম। অথচ ইহাও দেখিলাম, তাহারা দিনের পর দিন 'বিক্ষোভ প্রকাশ'ই করিতেছে, স্থানে অস্থানে গিয়া নাকে কাঁদিতেছে, কিন্তু যাহা করিলে প্রতিকারের উপায় হইতে পারে, তাহার কিছুই করিতেছে না। মারামারি করুক এমন কথা আমি বলি না, অশিষ্ট হইতেও উপদেশ দিই না; কিন্তু শিষ্টভাবেই যে প্রতিকার অনায়াসে করা যায় তাহাও না করিয়া পদাহত মানুষ যখন নেড়িকুত্তার মত খালি কেঁউ কেঁউই করে এবং সেই পদাঘাতের দাগ সজল চক্ষে লোককে দেখাইয়া বেড়ায়, তখন আমার ধৈর্য থাকে না। তখন মনে হয়, শিষ্টতার ছদ্মবেশে এই হীনতা, কাপুরুষতার তুলনায় অশিষ্ট হওয়াও শতগুণে ভাল, তাহাতে অন্তত পৌরুষের পরিচয় মেলে।

আমার দুর্ভাগ্য, আমাকে ইহাদের অনেকে চেনে। যথারীতি আমাকেও আসিয়া ধরিল, 'আপনি কি বলেন ?' উপদেশ চাহিতে তাহারা আসে নাই, আসিয়াছে 'বাণী' চাহিতে। আমি যাহা বলিব তাহা করিবে না, সশ্রদ্ধচিত্তে শুনিয়া যাইবে, এবং অন্য কোথাও যখন আবার নাকে কাঁদিতে বসিবে, তখন আমার বাণীটাও সঙ্গে সঙ্গে 'কোট ফ্রম্ মেমরি' করিবে। তাহার জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করা ছাড়া ইহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

আমি ক'দিন ধরিয়াই দেখিতেছিলাম। কহিলাম, কি আর বলিব ভাই, যা পার তোমরা, তাই কর।

তাহারা ঘন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। আঙুলে একটা করিয়া ত্রিপত্র দুর্বা থাকিলেই দৃশ্যটা সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। কহিল, কি করিব বলুন?

আমি কহিলাম, সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ মাঠে গিয়া জমা হও। গলায় যথাসাধ্য ট্রেমোলো দিয়া বল, 'ভাই সব, এই অপমানে আমাদের তথা সমস্ত ছাত্রসমাজের আত্মসম্মানে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। এবং আমাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণটা জগৎকে দেখাইতে সভাস্থ সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, এক মিনিট সময় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া থাকুন।' পরদিন রিজলিউশনের কপি ও সভার বিবরণ 'আনন্দবাজারে' পাঠাইয়া দিও, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের নাম দিও। তারপর সেই কাগজ লইয়া গিয়া সদর্পে যে যাহার পিসীমাকে দেখাইয়া বলিও, 'পিসীমা, এই দেখ আমার নাম কাগজে ছাপিয়েছে।'

ইহাই তোমরা করিতে জান; ইহার বাহিরে কিছু করিতে পারিবেও না, সে চেষ্টাও করিবে না জানি।

তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিল, এবং দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। রসিকতটা তাহারা উপভোগ করিল, কিন্তু কথার চাবুকটা ইহাদের লাগিল না। দাঁত বাহির করার পরিবর্তে যদি তাহারা ক্ষেপিয়া আমাকে মারিতে আসিত, আমি অনেক বেশি আনন্দ পাইতাম। স্বীকার করিতাম, তাহারা বেটা-ছেলে, তাহাদের গায়ে রক্ত আছে, তাহাদের অপমান-বোধ আছে।

*

এইখানেই শেষ নয়। পরদিন ইহাদের 'ক্ষোভ' আরও একটু বাড়িল; সমস্ত ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়াই খোলাখুলি অপমানের কথা উচ্চারিত হইল।

আমাকে একটি ছেলে আসিয়া কহিল, আচ্ছা, ইহাতে কি কিছু ফল হইবে মনে করেন?

আমি কহিলাম, লাথিটা যদি পিঠ ছাড়াইয়া বুক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তবে হয়তো হইবে।

সে অতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিসের লাথি?

আমি লজ্জা পাইয়া কহিলাম, আমারই ভুল হইয়াছে ভাই, আর বলিব না।

*

ইহাদের লাথি মারিয়া আবার তাহার 'Short Notes on 'লাথি' ও লাথি Made Easy' লিখিয়া দিতে হয়। না হইলে ইহারা বোঝে না। অথচ ইহারা ছাত্র—দেশের যুবশক্তি, জাতির ভবিষ্যৎ। ইহারা সভা সমিতি আন্দোলন করে, স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন বানায়, আরও কত কি করে। ভবিষ্যৎ। কিন্তু 'বর্তমান' ইহারা নয়।

এই ছেলেগুলা ছাত্র বলিয়াই লজ্জাটা আমার বেশি বাজে। যে দেশের ছাত্র এই, তাহার সংসারী লোকেরা কি হইতে পারে? বিলাতি ফ্যাশন আমরা শিখিয়াছি, এবং শিখিয়া মরিয়াছি। অতি বড় বান্ধবের মৃত্যুতে আমরা 'এক মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া' শোক উদ্‌যাপন করি; লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জরিত হইলে সভা ডাকিয়া 'তীব্র প্রতিবাদ' করি; বাসে কণ্ডাক্টরের হাতে গলাধাক্কা খাইয়া সংবাদপত্রে চিঠি লিখিয়া কাঁদুনি জানাই; অপহৃতা ধর্ষিতা মাতা ভগিনী ও পত্নীর অপমানের প্রতিকার করিতে আমরা আদালতে যাই। যে লাঞ্ছনায় যে অপমানে মানুষ উন্মত্ত হইয়া নরহত্যা করে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করি সভা ডাকিয়া, রিজলিউশন করিয়া। ক্বচিৎ কোন মূর্খ এই জড়তাকে ভাঙিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে বক্তৃতা দিতে ডাকি, সময় বুঝিয়া হাততালি দিয়া তাহাকে আনন্দিত করি, তারপর নিশ্চিন্ত মনে তাহার কথা ভুলিয়া যাই, শুধু বলি, 'লোকটা বলে ভাল।' ইহা 'ভব্যতা' নয়, 'সভ্যতা' নয়। ভব্যতার নামে ইহা হীনতা ও দুর্বলতার পোষণ। ইহাকে 'সভ্যতা' বলিয়া আমরা গর্ব করি। ক্লীবের ব্রহ্মচর্য্য-গর্বের মতই সে গর্ব অর্থহীন।

*

এই কথাটাই মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বোমা পড়িয়া যদি এই কৃমিকুলের কিছু ধ্বংসই হইয়া যায়, কি ক্ষতি? মানুষ বলিয়া ইহারা বাঁচে না, বাঁচিতে চায় না। শুধু অন্নই যদি ধ্বংস করিবে, ইহারা মরুক, সেই অন্নে শক্তিমানের দেহ পুষ্ট হউক, পৃথিবীর সমৃদ্ধি বাড়িবে।

*

তিনকড়িদা জন্মশাসনের বিরোধী। তিনি বলেন, ইউরোপের দেশগুলা তাহাদের 'ম্যান-পাওয়ার' লইয়া গর্ব অনুভব করে, লোক-সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করে। তাহারা জানে লোক অর্থই শক্তি। আর আমাদের দেশ বলে, লোক কমাও। ইহার কোন অর্থ হয়?

হয় না, আমিও মানি। কিন্তু 'ম্যান-পাওয়ার' কথাটা আমার হজম হয় না। তিনকড়িদা ইউরোপের দোহাই দেন, সেখানে একটা পুরুষ-ছেলে অর্থ একটা ভাবী সৈনিক। যে দেশের একটা পুরুষ-ছেলে বলিতে বুঝায় একটা ভাবী কাপুরুষ, সে দেশের লোকের জন্মিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার কোন্ সত্যকার অধিকার আছে?

'ম্যান-পাওয়ার' কথাটা শ্রুতিমধুর। কিন্তু সেই 'ম্যান' কোথায়? সব তো দেখি ক্লীবের রাজ্য। পুরুষত্ব তো দেহ-সংস্থানের ব্যাপার নয়। পুরুষত্বের স্থান মেরুদণ্ডে, মনে। সে আপদ আছে, এমন প্রমাণের অত্যন্ত অভাব।

*

কিংবা হয়তো আমারই ভুল। পুরুষত্ব দেশে আছে। বরং গত ক'বছরে বাড়িয়াছে মনে হয়। যে দেশে এত নারীহরণ ও নারীনিগ্রহের ঘটা, সে দেশে পুরুষ নাই, একথা অবিশ্বাস্য। এবং ইহার চেয়েও বড়, অকাট্য ও অলঙ্ঘ্য প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।

পঞ্জিকা পড়েন, পঞ্জিকা? পি. এম্. বাকৃচি, গুপ্তপ্রেস? আমি পড়ি। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন অতি সুপাঠ্য জিনিস, ভারি সুন্দর সুন্দর তথ্য ও ছবি থাকে।

মাঝখানে বছর কয়েক দেশে ছিলাম না। পঞ্জিকাও পড়িতে পাই নাই। সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া দেখিতেছি, দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পঞ্জিকারও।

*

১৩৩৬ ও ১৩৪৬ সালের পঞ্জিকা পাশাপাশি মিলাইয়া দেখুন। দশ বছর আগে পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের পাতা ভরা থাকিত বিশেষপ্রকার 'ফকিরি দ্রব্যগুণের' বিজ্ঞাপনে। এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে জন্মশাসনের বিজ্ঞাপন। ইহাতেই প্রমাণ হয়, দেশে লোকেদের পুরুষত্ব বাড়িয়াছে। এখনকার বিজ্ঞাপন, সেই দশ বছর আগেকার বিজ্ঞাপনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

স্বয়ং পঞ্জিকা এই বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করিতেছে। ইহার পরেও যাহারা দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্যে ও জাতির নবজাগ্রত পৌরুষে সংশয় প্রকাশ করিবে, তাহারা পঞ্জিকা মানে না, তাহারা হিন্দু নহে। তাঁহাদের সহিত আমি কথা বলি না।

*

অতএব আর সেই ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বৃথা কথা না বলিয়া পরম পবিত্র পঞ্জিকার চরণেই প্রার্থনা জানাই : হে পঞ্জিকা, যুগ যুগ ধরিয়া তুমি আমাদিগকে জীবনযাত্রার পথের ও ছুটির নির্দেশ দিয়াছ, আজও আমাদের বাঁচাও, তোমার শুভদিনের নির্ঘণ্টে বোমাপতনের পক্ষে প্রশস্ত দিনের নির্দেশ দাও। এই হতভাগ্য নির্বীর্য জাতির মাথায় বোমা পড়ুক, বজ্রপাত হোক, ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্ন্যুৎপাত ভাঙিয়া আসুক। অনেকে মরে মরুক ক্ষতি নাই ; কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের আঘাতে বাকি মানুষগুলা মজ্জাগত আলস্য ও ক্লীবত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু জীবনের সাড়া দেখাক, এই জড়ত্বের কলঙ্ক ঘুচুক। "নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে" বাস করিয়া করিয়া আমরা বলহীন চেতনাহীন পশুতে পরিণত হইয়াছি। যে বিপদে জাতির মেরুদণ্ড গড়িয়া দেশে আবার মানুষের সৃষ্টি হইবে, সে আমাদের শত্রু নয়, পরম মিত্র ; কাপুরুষত্বের এই অতল পঙ্ক হইতে আমাদের উদ্ধার করিতে সে ছাড়া আর কেহ পারিবে না।

*

তাই আজ, হে রুদ্র, নাচ তোমার ভৈরব তাণ্ডব, পাঠাও তোমার মৃত্যুর দূতকে—সেই মৃত্যুর প্রহারে জীর্ণ কঙ্কালের ধ্বংস হইয়া নবজীবনের, নবযৌবনের সূচনা হোক।

আর তাহা যদি না পার, হে প্রলয়ের দেবতা, এই জাতিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দাও। যে অপরিসীম গ্লানি ও হীনতা এই জাতির দেহে ও জীবনে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধান বিদেশীরা এখনও হয়তো পায় নাই। পাইলে আর আমাদের বোমার ভয় করিতে হইবে না। এই ক্লীবদের মারিতে তাহারা তখন বোমার অপচয় ও অপমান করিবে না ; এরোপ্লেনে চড়িয়া দলে দলে আসিয়া শুধু ইহাকে লক্ষ্য করিয়া থুথু ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, নিষ্ঠীবনের প্লাবনেই আমরা ডুবিয়া মরিব। সেই লজ্জা হইতে আমাদের বাঁচাও। তোমার আহ্বানে হিমালয় আগ্নেয়গিরি হইয়া অগ্নির প্লাবনে ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দিক ; আমাদের কাপুরুষতার অবসান যদি নাই হয়, এই কাপুরুষ-জীবনের অবসান হোক।

নির্জ্জন গৃহকোণে

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

সকাল হয়েছে বটে, রবিরশ্মি কিন্তু এখনও মলিনার ঘরে প্রবেশ করে নি। নদীবক্ষে, বালুকাস্তূপে, পথে প্রান্তরে সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত। বাগানের গাছের দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে জানলার সার্সীতে, মলিনার ঘরে তাই আলো নেই।

মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন মধ্যগগনে, তখন এই ঘরে ক্ষণকাল বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে অজস্র আলো, মেঝের ধূলিকণাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাচীরের ওপর থেকে টবের গাছগুলির ছায়া ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু কতক্ষণ, ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী, সূর্য্য সরে যায়, দেয়ালে মেঘের ছায়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। লাল, নীল, ধূসর কত বিচিত্র ছায়া।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে আকাশ আর মেঘ যখন পাথরের মত কঠিন, আলোর ঔজ্জ্বল্য রূঢ় রুক্ষ হয়ে ওঠে, এ হোল সে দিনের প্রাকৃতিক ইতিহাস।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে আকাশ নেমে আসে নীচে—আরও নীচে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সূর্য্যাস্তের কোনও রূপ নেই, বৈচিত্র্য নেই, গতি নেই, মেঘভারাক্রান্ত আকাশে সবই সমান। অন্ধকার বেড়ে চলে। দেয়ালের ছবি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে। সার্সী সারাদিন বন্ধ—বাইরের জোলো হাওয়া ঘরে না আসে, দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন প্রদোষান্ধকার সারাদিনকে গ্রাস করেছে।

উজ্জ্বল আর ম্লান—আকাশ নদী বা দিনের এই প্রাকৃতিক ইতিহাসই মলিনার জীবনের সব-চেয়ে বড় কথা, মলিনার অস্তিত্ব যেন আবহাওয়ার সংবাদে দাঁড়িয়েছে। টেম্পারেচার-চার্ট জীবনের একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্য।

স্বল্পপরিসর ঘরের এক প্রান্তে মলিনার রোগশয্যা বিছানো, সেখান থেকে জানলা ও দরজা লক্ষ্য করা সহজ। বিছানার ওপর সাদা চীনেমাটির বুদ্ধমূর্ত্তি পড়ে রয়েছে, অসুখের সূচনায় শৈলপতি একদিন এটা কিনে এনেছিল। প্রথম প্রথম বাগান থেকে দুচার রকম ফুল তুলে এনে শৈলপতি মলিনার মাথার দিকের টিপয়ে সাজিয়ে রাখত, ইদানীং আর সময় হয় না, মাস খানেক আগেকার ফুল ফুলদানিতে শুকিয়ে আছে। সেই টিপয়ের ওপরই এখন জমেছে ওষুধের ছোট বড় নানা রকম শিশি, থার্ম্মোমিটার আর টাইমপীস। মলিনা দিনে অন্ততঃ পনের ষোল বার টেম্পারেচার দেখে, তবু তো একটা কাজ, জ্বর বাড়লে বা কমলেও সে খুসী, সেও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টাইমপীসটা শৈলপতি সম্প্রতি কিনেছে, সাধারণ টাইমপীস নয়, নতুনত্ব আছে, পিয়ানোর সুরে ঘড়িটা বাজে। আর আছে একটা হাত আরশী, মুখ দেখে দেখে নিজের মুখের সরল, বক্র, কুঞ্চিত রেখাগুলি মলিনার মুখস্থ হয়ে গেছে।

নাম তার মলিনা হলেও বর্ণ তার একদা উজ্জ্বল ছিল, সে হিসাবে তার নাম হওয়া উচিত ছিল সুবর্ণা, কিন্তু ইদানীং অসুখের জন্য মলিনার চেহারা শুধু ম্লান নয়, পাণ্ডুর বিশীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এখানকার বড় ডাক্তার শশিশেখরবাবু, অন্য কোথাও প্র্যাকৃটিস করলে হয়তো আরও নাম হোত, কিন্তু এদেশ তাঁর ভাল লাগে তাই এখানেই সারাজীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে তিনি মলিনাকে দেখে যান, তার উপস্থিতিতে মলিনা পরম প্রশান্তি অনুভব করে, শুধু মর্ফিয়াতেই এই শান্তি সম্ভব। সহসা সে ফিরে পায় জীবনের চাঞ্চল্য, মলিনার অন্তর আনন্দে পক্ষ প্রসারিত করে চেতনাময় যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

গতানুগতিকভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসেন, তারপর গম্ভীরভাবে হাত দেখে নাড়ীর গতি অনুভব ক'রে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন, রাতে ঘুম হয়েছিল? তারপর : সেই ব্যথাটা একটু কম ছিল ত ? এর পর মলিনার উত্তরের ওপর নির্ভর ডাক্তারবাবুর দুটি বাঁধা কথা 'বেশ' কিংবা 'হুঁ'। প্রতিদিন একই কথার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু সর্ব্বদাই নূতন শক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মলিনা।

এ সময়টায় শৈলপতি নিয়মিতভাবে ঘরে উপস্থিত থাকে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগ্রেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার অন্তরালে নিজের বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রের সন্ধান করে, কখনও আবার মলিনার বিছানার কাছে এসে অসংলগ্ন দুটো একটা কথা কিংবা রসরহস্য করে হেসে ওঠে, কখনও বা ছোটখাট জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। শৈলপতির এ একটা কাজ। মলিনা কিন্তু ঠিক এ সময়ে তার উপস্থিতিতে আনন্দিত হোত না, মাথার কাছে যেন গুঞ্জনরত মক্ষিকার ভীতিজনক উপস্থিতি। এই অতি-ব্যস্ততার ভান তাকে আহত করে।

মেয়েদের মতো ক্ষিপ্রতায় শৈলপতি নিজের হাতে সব গুছিয়ে তবে বেরোত, সব কাজ সে এমন সহজভাবে করতো যে মলিনা সময় সময় বিস্মিত হয়ে পড়তো, শৈলপতির কোনো কাজেই ও লাগছে না, এর জন্য মনে মনে মলিনার অনুশোচনার আর সীমা নেই। দশ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যেও শৈলপতির আবির্ভাব মলিনার কাছে প্রথম দিনের মতো নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে, শৈলপতির আশঙ্কাকরুণ স্নিগ্ধ স্পর্শে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে মলিনা আনন্দময় উদ্দেশ্যহীনতায়। সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গতার পরও শৈলপতির গতিচঞ্চল সুঠাম দেহভঙ্গিমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মলিনা, সারা দেহমনে সুস্থতা ফিরে পাবার জন্যে তার কত অধীর আগ্রহ।

মৃত সন্তানের মুখে দুগ্ধভারানত স্তন দিয়ে মলিনা একদিন হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করেছিল, আজও মাঝে মাঝে সেই বেদনা ওকে বিহ্বল করে তোলে, তার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সব আজ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

বুকের ব্যথা একটু কম পড়লেই মলিনা মনে করে এইবার সে সেরে উঠবে, আর কষ্ট পাবে না, কিন্তু কতক্ষণ। অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে নির্জ্জন গৃহের এই নিরালা কোণে শুয়ে মলিনা বুকের চারপাশে রুগ্ন আঙুলগুলি সঞ্চালিত করে একটু শান্ত হতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার ব্যথায় যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় বিভীষিকায় ছিন্ন হয়ে যায় মলিনার অন্তর—সারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। মলিনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নড়বার শক্তি নেই।

ক্রমশঃ রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মতো মলিনার বেদনার প্রকোপ কমে আসে, মলিনা ভাবে, একাকী এই ঘরের নির্জ্জন কোণে এইবার হয়ত সে মরে যাবে, দেয়ালে জ্বলবে প্রখর সূর্য্যালোক, নদীতে বইবে উচ্ছল জোয়ার। যদি সে মরতে পারতো, অন্ততঃ সে এই যন্ত্রণা-বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেত। আর কতদিন!

ব্যথা ক্রমশঃ কমে যায়, নিষ্প্রাণ শক্তিহীন দেহ নিয়ে মলিনা চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে, একটা নার্স থাকলে হয়ত ভালো হোত, আজ শৈলপতি এলে বলবে।

সন্ধ্যার পর শৈলপতি ফিরল, উচ্ছ্বসিত উৎসাহে সারা বাড়ি সচকিত করে তোলে—চীৎকার করে ওঠে—কেমন আছো গো রাণী! আজ ফার্ষ্টক্লাস আঙুর পেয়েছি।

মলিনার জীবনে যেন সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হ'ল, সব ভুলে গেল মলিনা, যন্ত্রণার কথা, রোগের কথা, নার্সের কথা। শৈলপতি মলিনার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর মলিনা ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে—কত কষ্টই না তোমায় দিচ্ছি!

—কষ্ট কি রাণী! তুমি সেরে উঠলেই আমার সুখ। তুমি চুপ করে শোও, কলেজের একজন বন্ধু এসেছেন, একটু চা-টা করে দিই।

স্তিমিত হয়ে আসে মলিনা। পাশের ঘরের কলহাস্য, কথার ভগ্নাংশ মলিনার কানে ভেসে আসে, কত অবান্তর অসংলগ্ন কথা, ম্যালেরিয়া থেকে মহাযুদ্ধ, কি উত্তেজনা! কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্য্যায় যার দিন কাটে তার জীবনে উত্তেজনার উৎসাহ কোথায়, কোথায় পাবে সে অফুরান আয়ু, চেতনাময় যৌবন!

সেদিন সকালে যখন শশিশেখরবাবু এলেন, শৈলপতি তখন কোথায় যেন বেরিয়েছে, সেই অবসরে মলিনা ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, সেরে ত উঠলাম না; মুক্তি কবে হবে বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বল্লেন—আমি ত ভগবান নই, কি করে বলি বল?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মলিনা বল্লে—মানে আর কতো দেরী?

স্নিগ্ধ সংযত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্লেন—মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে, যে কোনো মুহূর্ত্তে তা ঘটতে পারে, কিন্তু অত ব্যস্ত হলে কি চলে মা?

মলিনা আর কথা কয় না।

তারপর কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত, বারান্দায় যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। শশিশেখরবাবু আবার কথা সুরু করেন, তোমার কিন্তু নার্স রাখার আপত্তিটা ছাড়তে হবে, আমি কদিন ধরেই বলছি এ ভাবে একা একা থাকা ঠিক নয়।

বিস্মিত হোল মলিনা—বললে,—আমার রাজী হওয়া মানে?

—শৈলবাবু বলছিলেন কি না। তারপর মলিনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা তোমার কি আপত্তি নেই মা?

—আপত্তি মানে, হ্যাঁ আপত্তি—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? যদি দরকার বিবেচনা করেন, তাহলে রাখতেই হবে।

বেশ তাহলে আমি আজই ব্যবস্থা করছি, ভাল লোক আছে, আমার জানা লোক।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন, মলিনা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শৈলপতি নার্স সম্বন্ধে এ কথা বলেছে কেন? ওর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে ও চটে যায়, কিন্তু মলিনাকে সে সত্যি ভালবাসে, মলিনার অসুখের ব্যাপারে ওর দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।

সেদিনই এক পাত্‌লা রঙীন চাদর কিনে আনলে শৈলপতি, মলিনা গায়ে ঢাকা দিয়ে বললে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক যেন বিয়ের দিনের মত।

কি-ই বা বলবে মলিনা, তবু কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বললে, ডাক্তারবাবু বলছিলেন একজন নার্স রাখা দরকার, আজই পাঠিয়ে দেবেন।

একটু চুপ করে থেকে শৈলপতি বললে, বেশ ত। তারপর অনাবশ্যক হাসি হেসে বললে, আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম, ভয় ছিল পাছে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গ অপছন্দ কর, তাই কিছু বলি নি।

পাঁচটার পর নার্স এলো, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন এবং তরুণী। নাম তার জয়ন্তী। রীতিমত আধুনিক এবং শিক্ষিত নার্স। নার্সের আগমনে মলিনা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল, রোগের বোঝা এইবার অপরের ঘাড়ে নামিয়ে সে একটু বিশ্রাম করতে পারবে। শৈলপতির সেবাযত্নের পেছনে মলিনার কুণ্ঠামিশ্রিত তৃপ্তি বর্ত্তমান।

এবার সে উপভোগ করবে অকুণ্ঠিত তৃপ্তি। মলিনার চারপাশে নিয়তই দুশ্চিন্তার জাল প্রসারিত, এই নির্জ্জন গৃহকোণের নিঃসঙ্গ পরিবেশ মলিনার কাছে রোগশয্যার চেয়েও ক্লান্তিকর, ব্যথার চেয়েও দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠেছিল, সেই সময় ব্যথাটা বেড়েছে, যন্ত্রণায় মলিনা ছটফট করছে, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল, মলিনার ইচ্ছা হোল একবার উঠে দেখে, কিন্তু তার নড়বার শক্তি নেই, চীৎকার করবার সামর্থ্য নেই। মলিনার মনে হোল, তার বেদনা উপশম করবার জন্যে দোর ভেঙে পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে এমন সব সম্ভব অসম্ভব কথা সব মনে পড়তে লাগল যার কোনো মানে নেই, একবার মনে হোল হয়ত শৈলপতি আহত হয়েছে মোটর-দুর্ঘটনায়, ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে এসেছে বুঝি তার আহত দেহ! বিপদ ঘটতে কতক্ষণ, এমন তো কত হয়! তারপর, অবশেষে কড়া নাড়ার আওয়াজ থামলো, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে রইল মলিনা, কে যে কড়া নাড়লে, তা আর কোন দিন জানা গেল না।

নার্সের আগমনে মলিনা তাই সুস্থ বোধ করছে, বুকের ব্যথাটা একটু কম পড়েছে যেন, বারে কমেছে। মলিনার আর ভয় করে না। জয়ন্তী বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, গল্প বলে, মাঝে মাঝে আবার মৃদুকণ্ঠে গান গায়। মলিনাকে ভুলিয়ে রাখে জয়ন্তী—নার্স ও সখীর সমন্বয়। মলিনার নির্জ্জনতার কষ্ট, নিঃসঙ্গের দুঃখের অবসান হয়েছে। সূর্য্যদেবের গতিপ্রকৃতি নদীর উচ্ছল স্রোতের হিসাব-নিকাশ আর সে তেমন রাখে না। মানুষ ও সমাজের কথা শুনতে মলিনার আবার ভাল লাগে।

মলিনা আবার নতুনভাবে জীবন সুরু করেছে, ভুলে যেতে চায় এই কয়মাসের গ্লানিকর জীবনের ইতিহাস।

নার্সকে মলিনা জয়ন্তী বলেই ডাকে, শৈলপতি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মিস্ সেনের নীচে নামতে পারেনি, তার এই অর্থহীন ভদ্রতা মলিনার ভাল লাগে না। মলিনা চায় জয়ন্তীকে আত্মীয়ের মতো নিবিড় করে টেনে নিতে, তার করুণায় সে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। জয়ন্তীর সংস্পর্শে এসে আজ মলিনার বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার তার অসীম আগ্রহ। জীবনের যা কিছু রমণীয়, বিছানায় শুয়ে আঙুলের ফাঁকে তা আর গলে যেতে দেবে না মলিনা। শৈলপতির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও প্রাধান্য যেন ইদানীং কমে এসেছে, সে আর এখন মলিনার রুগ্ন জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজন নয়, কিন্তু জয়ন্তী এখন অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

মলিনা দেখাতে চায় সে যেন সেরে উঠেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে আসে ব্যথার প্রকোপ। এবারকার আক্রমণ আরো গভীর—আরো ব্যাপক, ফলে মর্ফিয়া দুদিন মলিনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে, এর পর মলিনা আরো দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হয়ে পড়লো। সেরে ওঠবার বাসনা ভেঙে গেল, জয়ন্তীকেও আর সব সময় ভাল লাগে না, সেই সময় মলিনার মনে হয়, আর এ জীবনে কি প্রয়োজন, বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই।

ক্রমশঃ এ ভাবও কাটলো, আবার জয়ন্তীর কাছে মলিনা শোনে হাসপাতালের গল্প, ডাক্তারের কাহিনী, মেট্রনের মেজাজ, আরো কত কি—মলিনা অবাক হয়ে যায়। ডাক্তার আর নার্স, মলিনার কাছে এদের আসন অনেক উঁচুতে, কিন্তু জয়ন্তীর গল্পে অনেক রহস্যের যবনিকা উঠলো।

শৈলপতির মনে আর তেমন আনন্দ নেই, জয়ন্তী ঘরে থাকলে সে মলিনার কাছে আসতে কুণ্ঠিত হয়, মলিনা মনে মনে ভাবে—ঈর্ষা, শৈলপতি এলে তাই জয়ন্তীকে ইসারা করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর শৈলপতি মলিনার লিক্‌লিকে সরু হাতখানা তুলে নিয়ে আদর করে, দুটো মিষ্টি কথা বলে—আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। মলিনা শীগগির সেরে উঠবে।

কিন্তু এও বাঁধা ফর্ম্মুলা, মলিনা যে সেরে উঠবে সে বিশ্বাস তার নেই।

আজকাল শৈলপতির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। গলার আওয়াজ ভারী, প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে ওঠে। একবার ফিরে আসে—আবার কোথায় বেরিয়ে যায়, কপালের কুঞ্চিত রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মলিনা সবই বোঝে। বাক্যের অসংযম, ব্যবহারে দীপ্তির অভাব—সবই তার চোখে ধরা পড়ে। তবু সে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চুপ করে থাকে।

মলিনার বিরক্তি বেড়ে যায়, জয়ন্তীকে কি শৈলপতি মলিনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। শৈলপতির স্বার্থপরতায় মলিনা যতই উত্তেজিত হয়—ততই তার জয়ন্তীর ওপর নির্ভরতা বেড়ে চলে।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মলিনার মনে হয়, জয়ন্তী যেন স্বর্গের দেবী, মলিনাকে সুস্থ করবে বলে নেমে আস্‌ছে স্বর্গ থেকে, মাথার চারপাশে বিকিরিত স্বর্গীয় জ্যোতির্ব্বলয়, হাতে অমৃতভাণ্ড, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ মলিনা সবিনয়ে অমৃত প্রার্থনা করছে, কিন্তু অদৃশ্য লূতাতন্তুর বাধা অতিক্রম করে

কিছুতেই আর জয়ন্তীর কাছে পৌঁছতে পারছে না, শৈলপতিই সেই অদৃশ্য সূত্রের এক প্রান্ত ধরে আছে, বিশ্রী চীৎকার করে গাত্রবস্ত্রের ঘনতর সংস্পর্শের কৃত্রিম অন্ধকারে মুখ ঢাকলে মলিনা। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, কিন্তু সেই যে মলিনার ঘুম ভাঙলো, কিছুতেই আর ঘুম আসে না, অবশেষে জয়ন্তীকে ঘুমের ওষুধ দিতে হ'ল।

শৈলপতির সেদিন শহরে যাবার কথা, ঘুম ভেঙে মলিনা কিন্তু পাশের ঘরে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা শুনতে পেলে, কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে কথা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটেনি, তবুও ঘুম ছাড়িয়ে কথা কানে ছড়িয়ে পড়ছে। মলিনার দক্ষিণের জানলা দিয়ে নদী দেখতে পাওয়া যায়, নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর দিকে চেয়ে নিস্পন্দ মলিনা ক্ষণকাল চুপ করে পড়ে রইল, কান রইলো পাশের ঘরের নর-নারীর গুঞ্জনে। কোনো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবু পুরুষের কণ্ঠ পরিচিত, শৈলপতির চিরপরিচিত হাসি মলিনার ভোলবার কথা নয়। হাস্যরত শৈলপতির মুখখানি মলিনার স্পষ্ট মনে পড়লো।

প্রকম্পিত হ'ল পৃথিবী, এক মুহূর্ত্তে সব শেষ হ'ল, মূর্ত্তি গেল ভেঙে, সুর হ'ল ম্লান। যে দুজনকে ও বিশ্বাস করে, যাদের ওপর একান্ত অসহায়ের মতো নির্ভর করে আছে মলিনা, তারাই পাশের ঘরে রয়েছে। ভীত, চকিত মলিনা উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বস্‌লো। রুগ্নকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—জয়ন্তী, জয়ন্তী, নার্স!

রাজ্যহারা অনাথার আকুল আর্ত্তনাদ!

ছুটে এলো জয়ন্তী, একি আপনি উঠেছেন কেন দিদি? সে কথার উত্তর না দিয়ে যেন বিকারের ঘোরে মলিনা চীৎকার করে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কে কথা কইছে, ওঘরে ওরা কারা?

—ও, ওঘরে, ইলেক্‌ট্রিকের মিটার দেখতে এসেছিল। চলে গেছে। জয়ন্তী দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলে। এই দরজার সাম্‌নে দিয়েই বাইরে যাবার রাস্তা।

মলিনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লে—খুলে দাও শীগগির, খুলে দাও দরজা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, একটু হেসে জয়ন্তী দরজা খুলে দিলে। লোকটি ইতিমধ্যে চলে গেছে।

বিছানা থেকে উঠতে গেল মলিনা, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠলো, সেই যন্ত্রণার মধ্যেই মলিনা সদর-দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলে।

জয়ন্তী মলিনার কাছে দৌড়ে এলো, মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে। বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এখুনি কমে যাবে, সেরে যাবে, ভয় নেই দিদি, আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

মলিনা জানে, এ ব্যথা আর সারবে না, খেলা শেষ হ'ল, এবার ভাঙার পালা। যন্ত্রণায় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে মলিনা, অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জয়ন্তীর মুখের দিকে, এ ব্যথার অংশ নিক জয়ন্তী, তবু মনে মনে সে আর তাকে বিশ্বাস করে না। জয়ন্তী যেন আর সে জয়ন্তী নয়। মলিনার কাছে আজকের এই ব্যাপারের পর সেবাপরায়ণা নার্স যেন অন্য রূপে দেখা দিলে।

কিন্তু মলিনার ব্যথা কমলে দেখা গেল, জয়ন্তী ফুলে ফুলে কাঁদছে। জয়ন্তী বল্লে, অনেকের

সেবা করেছি, কর্ত্তব্য বলেই করেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট আর দেখতে পারি না, আপনি সেরে উঠুন দিদি।

খাটের পাশে বসে মাথাটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী গভীরতম বেদনায়, বিশীর্ণ আঙুল দিয়ে মলিনা সস্নেহে তার মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি ঠিক করে দেয়। এ সংসারকে ভালবাসবার ক্ষমতা আজো মলিনার বর্ত্তমান, এই আনন্দেই সে আত্মহারা হয়ে রইল।

বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে জয়ন্তী পড়ে ছিল, মলিনার আঙুলের শান্ত স্পর্শে জয়ন্তীর কঠোর মনোভাব ক্রমশঃ কোমল হতে লাগল।

মলিনা বল্লে, তোমার কাছে যা পেয়েছি তা আমি ভুলতে বসেছিলুম। এর পর মলিনাও কেঁদে ভেঙে পড়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের গতি-প্রাবল্যের ঝড়, রঙ ও লাস্য সব সে হারিয়েছে, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে শরতের সোনালি রোদ, জানলার সার্সীতে আছাড় খায় নদীর ঢেউ, বর্ষার বৃষ্টিধারা। আর এই নির্জ্জন গৃহকোণে রোগশয্যায় শুয়ে আছে রোগজীর্ণ মূর্ত্তিমতী অশান্তি, মৃত্যুর নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনবার আকুল আশায় পড়ে রয়েছে মলিনা।

যথারীতি পরদিন সকালে শশিশেখরবাবু এলেন, সেদিন মলিনাকে দেখে তিনি খুশি হলেন। এতদিনে তবু একটু আশা হ'ল। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মলিনা ঘুমিয়ে পড়লো—গভীর ঘুম। দুতিন ঘণ্টা পরে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকালে পৌঁছেছে। শান্ত হয়ে শুয়ে রইল মলিনা, নদীর গতিবিভঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগল। ওপরে অশান্ত ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, অথচ অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি। জয়ন্তী বলে—সেরে উঠুন দিদি, সেরে উঠতে কার না সাধ! মাটির ভেতর থেকে উদ্ভিদের উদ্ভব, তারপর একদা নীলবৃন্তে একদিন কুঁড়িতে ফুল ফোটে—সেই তার সার্থকতা, নদীর জল তট-ভূমিতে আছাড় খেয়ে আহত আনন্দে অভিভূত হয়—সেই তার সার্থকতা।

জলতরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তরে অনুভব করলে মলিনা। সেই মুহূর্ত্তেই মনে হলো যেন তার নিশ্বাস আটকে আসছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলো মলিনা। জয়ন্তী, জয়ন্তী!

কোনো সাড়া নেই, রুদ্ধ ঘরের বাইরে পৌঁছলো না সে আওয়াজ; প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, জয়ন্তী, জয়ন্তী!

আর একটু অপেক্ষা করলে মলিনা, কোনই সাড়া নেই। হয়ত জয়ন্তী কলঘরে আছে। খাট ধরে আস্তে আস্তে মেঝেয় নেমে এলো মলিনা, তারপর দেয়াল ধরে ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘর ছেড়ে বেরুলো মলিনা।

জয়ন্তী! রুগ্ন কণ্ঠে জোর নেই, অবসন্ন হয়ে মলিনা আবার ডাকলে, জয়ন্তী!

মৃত দেয়ালের গায়ে আহত হয়ে ধ্বনি ফিরে এলো। রান্নাঘরে, দালানে, কলঘরে কোথাও জয়ন্তী নেই, কেউ নেই।

মলিনার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। মলিনা শেষবার ডাকলে, জয়ন্তী! অসীম শূন্যে

মিলিয়ে গেল ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। শুধু দুরন্ত নদীর জল-কল্লোল সেই নির্জ্জন গৃহকোণে ভেসে এলো।

প্রবল হয়ে উঠলো বুকের ব্যথা, সজোরে দুর্ব্বল আঙুল দিয়ে বুকটা চেপে ধরলে মলিনা, এখনই ঘরে ফিরতে হবে, কিন্তু এটুকু পথ ফিরে যাবার ক্ষমতা তার আর নেই, কান্নায় মলিনার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল মলিনা। কুঁড়িতেই শুকিয়ে গেল ফুল, পাপড়ি ঝরে গেল, ফোটার অবসর নেই।

বিছানার ধারে মলিনা পৌঁছতে পারলে না, দক্ষিণের জানলার ধারে ক্ষীণ মুঠিতে চেয়ারটা ধরে মলিনা বসে পড়লো, ব্যথায় যন্ত্রণায় সারা দেহ তার এখনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মলিনার চোখে আর জল নেই, ব্যথার যন্ত্রণায় কাঁদবারও তার শক্তি নেই, আতঙ্কের কেন্দ্র থেকে ব্যথার দুঃসংবাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে স্নায়ু-শিরায় সংঘর্ষ সুরু করেছে। অসহ্য বেদনায় শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লো মলিনার সারা দেহ। বাইরে গর্জ্জন করছে বর্ষা-বিস্ফারিত নদী। কোনো সংযোগ নেই ওদের মলিনার জীবনের সঙ্গে, তবু যেন ওরা একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে সদর-দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল, জয়ন্তী ফিরলো তাহলে, পরম নির্ভরতায় সাময়িকভাবে বেদনার তীব্রতা কমলো। অর্দ্ধ-অচেতন মলিনা নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে।

পায়ের ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে এল,—রাণী, কি খবর?

জয়ন্তী নয়, শৈলপতি ফিরলো। মুখে কথা বেরোল না, নড়বার ক্ষমতা নেই মলিনার।

শৈলপতি ঘরে ঢুকে দেখলে—চেয়ার ধরে মেঝেয় পড়ে আছে মলিনা, তার ধূসর রুক্ষ চুলগুলি পিছনে ভেঙে পড়েছে, লুটিয়ে পড়েছে তার বিস্রস্ত কাপড় আর দেহ, রক্তহীন পাংশু মুখে তীব্র ব্যথা ও অসহ্য বেদনার চিহ্ন বর্ত্তমান। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা অবশেষে সেই নির্জ্জন গৃহকোণে এনেছে পরম প্রশান্তি।

জীবন ও মৃত্যুর প্রান্তসীমায় মলিনা মাথা খুঁড়ে মরেছে, ইচ্ছা শক্তি ও সামর্থ্য তার প্রাণহীন দেহ থেকে নির্গত হয়ে নিরাকার সান্ধ্য বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ধূসর অন্ধকারের নিবিড় ছায়ায় হারিয়ে গেছে মলিনা—শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণশক্তি মুক্তি পেয়েছে। আজ আর শৈলপতির নয়, মৃত্যুর তুহিন-শীতল স্পর্শে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে মলিনা।



স্বপ্ন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রভাতে বাহিরে চাহি—
সিন্ধুর মত সুনীল আকাশ চলিয়াছে পরবাহি'।
মেঘের তরণী মোহন লীলায় চলে দিগন্ত পানে,
তারি সাথে মোর উধাও পরাণ কোথা যায় কেবা জানে ?
কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আজিকে একটি প্রভাত জাগে,
একটি তপন উদিয়াছে আজি কল্পনা-অনুরাগে ;
বদ্ধ তীরের তরী—
স্বপ্নের স্রোতে কোথা ভেসে যায় অজানায় অনুসরি'।

সে গেছে কোথায় দূরে
নদী ও আকাশ মিশে আছে যেথা দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে।
তারি কূলে কোন্ নিভৃত কুটিরে পল্লীপ্রান্তে একা
হেরিছে তোমায় বাতায়ন-পাশে, আননে অরুণ-লেখা।
দু'টি চোখ ভরি' জাগে বিস্ময়, যেন দুই উড়ো পাখী
স্বপন-পাথার ঠেলিয়া চলেছে ফেনিল আলোক মাখি'।
···নগরীর কারা ছাড়ি'
তোমার আমার দু'টি মন আজ সুদূরে দিয়েছে পাড়ি।

মোদের কল্পলোকে
আর কেহ নাই, তুমি আর আমি চলেছি মুগ্ধ চোখে।
জুড়ায়ে গিয়েছে জীবনের তাপ, ফুরায়েছে সব ব্যথা,
আকাশে বাতাসে ভাসে সৌরভ, কুসুমের কোমলতা।
মন্থর বায়ু শিশির-শীতল, ওঠে মৃদু নিঃশ্বসি'
মুহূর্ত্তগুলি পাপড়ির মত ধীরে ধীরে যায় খসি' ;
দু'টি পলাতক মন,
ছায়ায় মায়ায় স্বপনের পথে করিছে সঞ্চরণ।

আলিবর্দ্দী খাঁ ও বাঙ্গালার শাসন-বন্দোবস্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে নওয়াজিস্ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া হোসেনকুলী খাঁকে আপনার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই মুর্শিদাবাদে বাস করায় হোসেনকুলী খাঁর দেওয়ান রায় গোকুলচাঁদ ঢাকা প্রদেশ শাসন করিতেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম ঢাকা প্রদেশের অন্তর্ভূ্ত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর শ্যালক কাসিমআলি খাঁ * রঙ্গপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি তথায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যে সময়ে বাঙ্গলা দেশে আলিবর্দ্দী খাঁর আধিপত্য দূরীভূত হয়, সেই সময় সৈফুদ্দীনআলি খাঁ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সৈফুদ্দীন নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর সময়ে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দী খাঁকে বলপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিতে দেখিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী আলিবর্দ্দীর দমনের জন্য অগ্রসর হইবেন এইরূপ এক ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে চৈতন্য উদয় হইলে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে গমন করা ধৃষ্টতা বিবেচনা করিয়া সৈফুদ্দীন স্বীয় ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ঘোষণা অধিক দূর প্রচারিত না হওয়ায় তিনি উন্মাদের ভান করিয়া উক্ত কার্য্যকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে দমন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বিশেষতঃ সম্রাট-দরবারে সৈফুদ্দীনের অনেক আত্মীয়, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা আমীর খাঁ থাকায় এবং আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়, সৈফের উক্ত ব্যবহার তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যে সময় আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে জৈনুদ্দীন আহম্মদ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পাটনা বা আজিমাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তৎকালে মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের পিতা হেদাৎআলি খাঁর উপর কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। জৈনুদ্দীন পাটনার শাসন-কর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলে, হেদাৎআলিকে সমগ্র বিহারের বক্সীর পদে নিযুক্ত করেন, এবং উভয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে সৈন্যরক্ষা, সমস্ত প্রদেশের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান। হেদাৎআলি জৈনুদ্দীনের সাধু ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার লিখিতমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় তিনি দেওয়ান রায় চিন্তামণি দাসকে উন্নীত করিবার জন্য আবেদন করিয়া পাঠান এবং তাঁহার আদেশানুসারে চিন্তামণি দাস সমগ্র বিহারের রাজস্বসচিব নিযুক্ত হইলেন। জৈনুদ্দীনের এইরূপ কার্য্যদক্ষতায়

---

* কাসিমআলি খাঁ মিরজাফরের রাজত্বকালে নিহত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অন্তঃপুরে এক কোটী টাকা লুকাইয়া রাখেন; মীরণ উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দুইটি অবিবাহিতা কন্যাকে হতশ্রী করিয়া দেয়।

Matakherin (Foot note) Vol. I. p. 386

সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন। তিনি কার্য্যদক্ষ, সাহসী এবং অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর পাটনা পরিত্যাগের সময় মগ প্রদেশের ব্রাহ্মণ জমিদার সুন্দর সিংহ ও ত্রিহুত শুমাই প্রদেশের দুইজন জমিদার তাঁহার সহিত বাঙ্গালা-বিজয়ে যাত্রা করেন। তাঁহারা আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে বহুমূল্য হীরকাদি, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পুরস্কার লাভের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলে জৈনুদ্দীন তাঁহাদিগকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেও উপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি যত্ন করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যে যেরূপ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইত। তাঁহারা কি আত্মীয় কি পর সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য সকলেই তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। এই সমস্ত কারণে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সর্ব্বত্র আদর্শ নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন।

আলিবর্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয় করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ স্বীয় কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের সন্তোষবিধান করিতে না পারায় এক ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা হয়। তিনি কাহারও কাহারও পরামর্শে ব্যয়লাঘবের উদ্দেশ্যে সৈন্যগণের ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস করিলেন। যাহারা বিদেশে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের আশায় আলিবর্দ্দী খাঁর আদেশমত উড়িষ্যার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই একে একে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের স্থান উড়িষ্যাবাসীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। * যে সমস্ত কর্ম্মচারী মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কটকে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার হওয়ায় এবং সৈয়দ আহম্মদ তাহাদিগের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা গোপনে মুর্শিদকুলী খাঁ ও মির্জ্জা বাখরের সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে সা এহিয়া নামে একজন কুচরিত্র ফকীর কটকে উপস্থিত হয়। এহিয়া দিল্লীতে সৈয়দ আহম্মদের সহপাঠী থাকায় পূর্ব্বপরিচয়ানুসারে এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সৈয়দ আহম্মদ তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। সে তাঁহাকে যে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিত, তিনি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কুপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। মুর্শিদকুলীর অর্থ অধিকার করিয়াছে বলিয়া ধনী ব্যক্তিদিগকে যার-পর-নাই কষ্ট দেওয়া হইত, এবং তাহাদের অন্তঃপুরে সেই সমস্ত অর্থ রক্ষিত আছে, এই ছল করিয়া স্ত্রীলোকগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচারের আদেশ দিতেন। ফলতঃ ধনী ব্যক্তি অথবা সুন্দরী রমণীর কথা শ্রুত হইলে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইত। এহিয়া এই সকল কার্য্যে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। তাহার ভবন অত্যাচারাগার হইয়া উঠে এবং দিবারাত্র লোকের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। সে সৈয়দ আহম্মদকে

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, সৈয়দ আহম্মদ ব্যয়লাঘবের জন্য সলিম খাঁ, দরবেস খাঁ, নেয়ামত খাঁ ও মীর আজিজ উল্লা প্রভৃতি মুর্শিদকুলী খাঁর সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে অল্প বেতনে নিযুক্ত করেন এবং গুজর খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু মুতাক্ষরীণে গুজর খাঁর মুর্শিদাবাদে প্রেরণের কথা নাই।

এরূপ বশীভূত করিয়াছিল যে, তাহার আদেশ প্রতিপালনে কেহই পরাঙ্মুখ হইতে সাহসী হইতেন না। কতিপয় সম্ভ্রান্ত রাজস্ব-কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার সময়ে আপনাদিগের দেয় অর্থ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ধৃত হইয়া উক্ত দেয় অর্থের জন্য অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতে লাগিল। এই প্রকারে লোকের ধন ও মানের উপরে হস্তক্ষেপ করায় উড়িষ্যার যাবতীয় লোক তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই এইরূপ শাসনকে অত্যন্ত ঘৃণিত বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং তাহারা ভয়ে ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। সমস্ত উড়িষ্যাবাসী একমনে একপ্রাণে ইহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। গুজর খাঁর অধীনে কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য ছিল। বেতন হ্রাসের জন্য তাহাদের অনেকে প্রস্থান করিয়াছিল। সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসী। তাহারা মুর্শিদকুলী খাঁকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত, এবং মির্জা বাখরের উপরও তাহাদের বিশিষ্টরূপ সহানুভূতি ছিল। সাধারণ ও সৈনিক যাবতীয় লোক মির্জা বাখরের উপর সন্তুষ্ট থাকায়, সৈয়দ আহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিছু গুরুতরই হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কটকে এক বৎসর বাস করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সুখের অবসান হইয়া আসিয়াছে।

তৎকালে মির্জাবাখর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার আশা তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁকে সরফরাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু বহুদর্শী মুর্শিদকুলী খাঁ আলিবর্দ্দীর সহিত বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন না, সেইজন্য মির্জাবাখরের উত্তেজনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। মির্জাবাখর মুর্শিদকে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া নিজেই উড়িষ্যা অধিকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় উৎসাহ ও কৌশল-প্রভাবে কতিপয় দাক্ষিণাত্যবাসীর সহিত বিশিষ্টরূপ আনুগত্য স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা কটকের সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন। সৈনিক ও রাজস্ব-বিভাগের এমন কি সৈয়দ আহম্মদের গার্হস্থ্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, এবং তদ্ভিন্ন উড়িষ্যাবাসী সকলেই সৈয়দ আহম্মদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জানিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সকলের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা গুজর খাঁর সৈন্যদিগকে আক্রমণ না করিবে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইবে, ততদিন এই সমস্ত পরামর্শ সফল হইবে না। এই সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া সকলেই আপনাদিগের পথ পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল। একদিন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া রাজপথে "অত্যাচার অত্যাচার" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। বহুসংখ্যক লোক তাহাতে যোগ দিয়া সমস্ত নগরকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। সৈয়দ আহম্মদ আপনার মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গুজর খাঁকে আদেশ দিলেন। কিন্তু গোলযোগ এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, গুজর খাঁ কিছুই করিতে পারিলেন না। নগরের সমস্ত পথে ও অন্যান্য স্থানে সকলেই চীৎকার করিয়া বিদ্রোহের অবতারণা করিল। কি সম্ভ্রান্ত, কি সাধারণ সকলেই একবাক্যে বর্ত্তমান শাসনের অত্যাচার ঘোষণা করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ ও মির্জা বাখরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের মধ্যে মুর্শিদের পরিবারবর্গের উদ্ধারকর্ত্তা সা মোরাদ তৎপরতার সহিত সকলকে সৈয়দ

আহম্মদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। সা মোরাদ কটক প্রদেশে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অনেকে তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। এইরূপে বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল। পরদিবস প্রাতঃকালে যখন গুজর খাঁ সৈয়দ আহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে বিদ্রোহীগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হইল যে, মির্জাবাখর নগরের বর্হিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। বস্তুতঃ মির্জাবাখর তৎকালে নগর-প্রান্তেই ছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোরণদ্বার উন্মুক্ত না হইলে তিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বিদ্রোহীরা তোরণ-রক্ষকদিগকে অল্পসংখ্যক জানিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তোরণদ্বার মোচনের জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিল। রক্ষকেরা আপনাদিগের জীবনের আশঙ্কায় সৈয়দ আহম্মদের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। মির্জা বাখর স্বীয় অনুচরগণের সহিত নগরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলে, তাহাদের মধ্যে উল্লাসের স্রোত প্রবাহিত হইল। মির্জা বাখর সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পরিবারকে বারাবতী দুর্গে * বন্দীস্বরূপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর মসনদে উপবেশন করিয়া আপনাকে উড়িষ্যার অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। †

এই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যার যাবতীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। এক্ষণে তিনি মির্জা বাখরের উড়িষ্যা অধিকার, গুজর খাঁর মৃত্যু ও সৈয়দ আহম্মদের কারাবাস শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল্-মুল্কের প্ররোচনা ব্যতীত মির্জা বাখর কদাচ এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হন নাই। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপন কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈয়দ আহম্মদের মাতা সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের মুক্তির আশায় মির্জা বাখরকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিতে পরামর্শ দিলেন, হাজী আহম্মদও ঐরূপ মত প্রদান করেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মির্জা বাখরের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করা কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। আলিবর্দ্দী স্বীয় দেশব্যাপী সুনাম ও আপনার রাজ্য-শাসনকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অবশেষে এইরূপ জোর প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যদি সৈয়দ আহম্মদকে আনয়ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর মুখ দেখাইবেন না। মুস্তাফা খাঁও আলিবর্দ্দীকে

---

* এই দুর্গ কটকের নিকটবর্ত্তী ; ১৮০১ খৃঃ ইংরাজেরা ইহা অধিকার করেন। Vide Stewart.

† সালাতীনে লিখিত আছে যে, সলিম খাঁ প্রভৃতি বিদ্রোহের সূচনা করিলে সৈয়দ আহম্মদ তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ কাসেম বেগ ও কটকের ফৌজদার সেখ হেদায়েত উল্লাকে তাহাদের নিকট পাঠাইলে তাহারা কাসেম বেগকে নিহত করে। তাহার পর নগরবাসিগণের সহিত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহারা সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করে এবং চিল্কা হ্রদের পরপার চিকাকল হইতে মির্জাবাখরকে আনাইয়া মসনদে স্থাপিত করে।

যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবার জন্য বারংবার উত্তেজিত করিতেছিলেন। এক্ষণে আলিবর্দ্দী খাঁ মির্জা বাখরকে দমন করিবার জন্য সুসজ্জিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। মির্জা বাখরের সহিত নিজাম-উল্-মুল্‌কের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া তিনি আপনার সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপে মুস্তাফা খাঁর অধীন পঞ্চ সহস্র; সমসের খাঁ, মীর খাঁ প্রত্যেকের অধীনে তিন সহস্র; সর্দার খাঁ ও আতাউল্লা খাঁর অধীনে দুই সহস্র; আমানত খাঁর অধীন সার্দ্ধ সহস্র; হায়দার কুলী খাঁ, ফকিরউল্লা বেগ খাঁ এবং মীরজাফর খাঁ প্রত্যেকের অধীন এক সহস্র; মীর সেরিফউদ্দীন, সা মহম্মদ মসুক, বাহাদুর আলি খাঁ প্রত্যেকের অধীনে পঞ্চ শত; মীর কাসেম খাঁর অধীনে দুই শত সৈন্য এবং ফতেরায় ও অন্যান্য হিন্দু সেনাপতির অধীন পঞ্চাশৎ সহস্র বন্দুকধারী সমবেত করা হইল।* নবাব নওয়াজিস্ মহম্মদকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক প্রদান করিয়া, মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, অগণ্য পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্য সহিত উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি বর্দ্ধমান অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে, সৈয়দ আহম্মকে যে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। যদি কোন সৈনাধ্যক্ষ উক্ত কার্য্য করিতে পারে, তাহাকে কথিত পারিতোষিকের উপর তাহার প্রত্যেক সৈন্যকে দুই মাসের অতিরিক্ত বেতন প্রদান করা হইবে।

এদিকে মির্জা বাখরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আলিবর্দ্দী খাঁর আগমন-সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। যদিও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দীর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি তিনি এই ভীষণ বিপদসমুদ্রে আপনার জীবনতরী ভাসমান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কটক হইতে কিছু দূরে মহানদীর তীরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। মহানদীকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের সমক্ষে পরিখা নিখাত হইল, এবং তথা হইতে প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে তাঁহার শিবিরে খাদ্যদ্রব্যাদি সঞ্চিত হইল। সৈয়দ আহম্মদও তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সৈয়দ আহম্মদ শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত রথে† উপবিষ্ট ছিলেন, দুইজন ইরাণী মোগল প্রহরীরূপে তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল।‡ মোগল-দ্বয়ের প্রতি এইরূপ আদেশ ছিল যে, শত্রুপক্ষকে উপস্থিত হইতে দেখিলে, তাহারা সৈয়দ আহম্মদের উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি চালনা করিবে। পাঁচ শত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য রথের চারিপার্শ্বে অবস্থিত ছিল। তাহারাও এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল যে, বিপক্ষগণকে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহারা আপন আপন বর্শা শকটের প্রতি চালিত করিবে, পরে প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হইবে। অথবা যেরূপে হউক আত্মরক্ষা করিবে। আলিবর্দ্দী খাঁ মির্জা বাখরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আপন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে

---

* Vide Mutakherin Vol. I. p. 394-95.

† চতুশ্চক্রযুক্ত গো-শকট।

‡ রিয়াজে লিখিত আছে যে, উক্ত দুইজন মোগল ব্যতীত মুর্শিদকুলী খাঁর ভ্রাতা মহম্মদ আমীন উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সৈয়দ আহম্মদের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।

কতিপয় সুদক্ষ ব্যক্তিকে* আদেশ দিলেন যে, যখন তাঁহারা শত্রুসৈন্যগণকে বিচলিত হইতে দেখিবেন, তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ বেষ্টন করিয়া তাহাদের শিবির আক্রমণ করিবেন ও যাহাতে সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিবেন। এইরূপে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া নবাব নিজে গভীর রজনীযোগে সমস্ত সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন ও প্রাতঃকালে পরিখাবেষ্টিত বিপক্ষ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা সহসা তাঁহার আগমনে ও তাঁহার বিপুল বাহিনী দর্শনে ভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগের প্রতি দুই একটি গোলাবৃষ্টি হইতে না হইতেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। তাহাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নবাবের সৈন্যগণ পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এই সময়ে মুস্তাফা খাঁ ও মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধারের জন্য শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পথে উপস্থিত হইলে, নবাবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মীরজাফর খাঁর শ্যালক মহম্মদ আমীন খাঁ এবং আসলৎদ্দৌল্লা খাঁ এই দুইজন দক্ষ কর্ম্মচারী আরও কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া শিবির অভিমুখে অশ্বারোহণে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত রথের নিকট উপনীত হইলে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা শকটের উপর বর্শা চালনা আরম্ভ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে আপন আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তাহাদের বর্শা চালনায় দুইজন মোগল রক্ষকের মধ্যে একজন নিহত ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আহত হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নিজ দেহ অবনত করিয়া রাখায় সেই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।† এই সময় উক্ত কর্ম্মচারীগণ অগ্রসর হইয়া রথমধ্যে সৈয়দ আহম্মদকে অক্ষত শরীরে জীবিত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এবং তাহাকে তাঁহাদের একটি অশ্বে আরোহণ করাইয়া‡ নবাবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য সকলে সাবধানে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইয়া তাঁহারা মীরজাফর খাঁকে সমাগত হইতে দেখিলেন। মীরজাফর স্বীয় হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে তদুপরি উপবেশন করাইয়া তাঁহার রক্ষকস্বরূপে গমন করিতে লাগিলেন। কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দ্বারা নবাবের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তাহার অল্পক্ষণ পরে সৈয়দ আহম্মদ আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর সৈয়দ আহম্মদ স্নান করিয়া গাত্রে গন্ধদ্রব্য অনুলেপনপূর্ব্বক

---

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, উক্ত যুদ্ধে মীরজাফর খাঁ সৈন্যাপত্যে বৃত হইয়াছিলেন।

† রিয়াজে লিখিত আছে যে, গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ আমীন আসন পরিবর্ত্তন করেন এবং উক্ত রক্ষীদ্বয়ই বর্শা চালনা করিয়া মহম্মদ আমীনকে আহত করে। সৈয়দ আহম্মদ অক্ষতই থাকেন।

‡ রক্ষী আহত মোগল অতীব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিল। মহম্মদ আমীন খাঁ প্রথমতঃ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় অশ্ব সৈয়দ আহম্মদকে প্রদান করিবার সময় যেমন তাহার সহিত সকলে কথোপকথন করিতেছিলেন, অমনি সেই আহত মোগলটি একলম্ফে উক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। আমীন খাঁ প্রভৃতি সকলে আপনাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। অবশেষে দীলার খাঁ সৈয়দ আহম্মদকে স্বীয় অশ্ব প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। রিয়াজে উক্ত মোগলের পরিবর্ত্তে মহম্মদ আমীনের অশ্বারোহণের কথা আছে।

নবাবপ্রদত্ত খেলাৎ ও হীরকাদিতে ভূষিত হইয়া মসনদে উপবিষ্ট হইলে, নবাবের আদেশানুসারে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে নজর প্রদান করিল। নবাব এক্ষণে সৈয়দ আহম্মদের পরিবার-বর্গকে আনয়নের জন্য বারাবতী দুর্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, দুর্গরক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ দ্বারোন্মোচন করিতে স্বীকৃত হইল, কেহ কেহ বা তাহার বিরোধী হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে তাহারা দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ সৈয়দ আহম্মদের পরিবারবর্গকে সসম্মানে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। নবাব স্বীয় কন্যা ও তাঁহার সন্তানাদি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাহার পর নবাব সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে হাজী আহম্মদ ও তাঁহার পত্নীর সন্তোষবর্দ্ধনের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর বাখর খাঁ নবাবের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। পুরুষোত্তমরাজের বক্সী মোরাদ খাঁ বাখরের সাহায্যের জন্য সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবাবের বিপুল বাহিনীর বেগ সহ্য করা অসাধ্য মনে করিয়া বাখর খাঁকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দক্ষিণাপথের দিকে প্রেরণ করেন। উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে নবাবের করায়ত্ত হইল। কিছুদিন পরে মোখলেশ আলী খাঁকে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার সহিত মুর্শিদাবাদাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি মস্তাফা খাঁর অনুরোধক্রমে মোখলেশ খাঁর পরিবর্ত্তে সা মহম্মদ মসুম নামক একজন দুষ্ট কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

যে সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয়ে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে পাটনার শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ ভোজপুরের কতিপয় বিদ্রোহী জমিদারকে শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উক্ত প্রদেশস্থ রাজা গরুৎ সিংহ ও উদ্বন্ত সিংহ নামক দুইজন প্রবল জমিদার নবাবের অধীনতা ছেদন করিয়া আপনাদিগেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বক্সী সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁর বিহার প্রদেশে অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল; তিনিও যে জৈনুদ্দীনকে সাহায্য করিবেন, ইহা সকলে বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। জৈনুদ্দীনের দেওয়ান চিন্তামণি দাস ও হেদাৎ আলির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। চিন্তামণি প্রভুর নিকট এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, হেদাৎ আলির সহিত জমিদারগণের অত্যন্ত প্রণয়; তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অনেক বিষয়ে আশা করিয়া থাকে। জমিদারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে যখন তাহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তখন হেদাৎ আলির নিকট তাহারা নিষ্কৃতির জন্য আগমন করিলে হেদাৎ আলির অনুরোধ কখনও অবহেলা করিতে পারা যাইবে না। সুতরাং অর্থব্যয় করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। তাহারা মৌখিক অধীনতা স্বীকার করিবে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে ক্রটি করিবে না। অতএব যাহাতে হেদাৎ আলি কিছু দূরে অবস্থান করেন, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জৈনুদ্দীন চিন্তামণির প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া হেদাৎ আলিকে দূরে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে ত্রিহুত-সুমাই প্রদেশ শাসন ও তাহার রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে হেদাৎ আলিকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন ত্রিহুত প্রদেশ ও মগধ প্রদেশস্থ রাজা কুঞ্জর সিংহকে দমন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা যেরূপ দুর্দ্দান্ত, তাহাতে তাহাদিগকে দমন করিতে

হইলে একজন দক্ষ লোকের যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং হেদাৎ আলির তথায় যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এদিকে তাঁহারা সাহাবাদ ও রোটাসের জমিদারগণকে দমন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। হেদাৎ আলির ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থানের সময় জৈনুদ্দীন তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেহেদী নেসার খাঁকে বক্সীর পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। হেদাৎ আলি চিন্তামণিকে ইহার একমাত্র কারণ জানিয়া বিনা আপত্তিতে আদেশ প্রতিপালনে অগ্রসর হইলেন। এদিকে জৈনুদ্দীনও সাহাবাদের জমিদার-গণের দমনার্থ যাত্রা করিলেন। ভোজপুরের জমিদারেরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা কৃষক, ব্যবসায়ী, পথিক যাবতীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিত। যে কেহ তাহাদের রাজ্য দিয়া গমন করিত, তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইত। জৈনুদ্দীন একদল সুশিক্ষিত সৈন্য ও কতিপয় গোলন্দাজের সহিত তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলেন। দুইটি যুদ্ধ ও কয়েকটি অবরোধের পরে জমিদাররা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের দুর্গ ও বাসস্থানাদি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবশেষে জৈনুদ্দীন তত্তদ্দেশবাসী কৃষক ও সাধারণ লোকদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ও রাজস্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিয়া পাটনায় উপস্থিত হন।

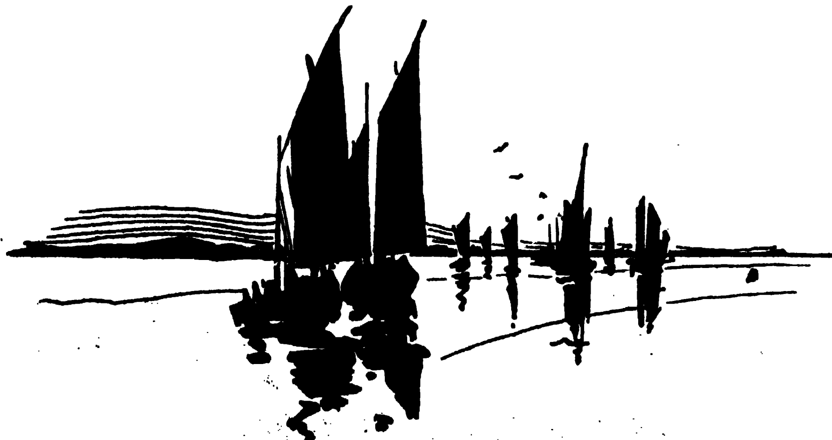
এই সময় রোসেন খাঁ তরাই নামক একজন আফগান কর্ম্মচারী সাহাবাদ ভোজপুরের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত ছিল। এই সাহসী আফগান আজিমাবাদ ও এলাহাবাদ প্রদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত থাকায় তদ্দেশস্থ জমিদারগণের সহিত ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। জমিদারগণের যাবতীয় অনুরোধ রক্ষার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। তজ্জন্য রোসেন খাঁ সাহাবাদের জমিদারগণের উচ্ছেদসাধনের বিরোধী হয়। সে নূতন শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীনের নিকট প্রতিনিয়ত গতায়াত করিত। প্রথমতঃ সে তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া জমিদারগণের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার প্রদানের জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে থাকে। জৈনুদ্দীন তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু রোসেন তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিত। একদিন সে ক্রোধান্ধ হইয়া জৈনুদ্দীনের প্রতি কিছু রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে। জৈনুদ্দীন তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি এইরূপ দুঃসাহসী লোককে দমন করিবার জন্য মীর কোদরৎ উল্লা ও দুর্গের অধ্যক্ষ হোসেন বেগকে নিযুক্ত করিলেন। ইহার পর সন্ধ্যাকালে রোসেন খাঁ জৈনুদ্দীনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র কোদরৎ উল্লা ও হোসেন বেগের সুতীক্ষ্ণ তরবারি তাহার উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেহেদী নেসার খাঁকে বক্সীর পদে নিযুক্ত করা হয়। মেহেদী নেসার খাঁ জমিদারগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করায়, তাঁহাকে খেলাৎ হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। মেহেদী নেসার খাঁ উক্ত পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত পাত্রই ছিলেন। তিনি যেরূপ যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সেইরূপ স্বীয় আত্মীয় ও স্বদেশবাসিগণের মঙ্গলের জন্যও সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি লোকের সহিত সাধু ব্যবহারে, সত্যপালনে এবং জীবনকে পবিত্রভাবে চালিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রের লোক তৎকালে অল্পই দৃষ্ট হইত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁ ত্রিহুত ও পার্ব্বত্য প্রদেশের কতিপয়

জমিদারকে শাসন করিবার জন্য গমন করেন। তিনি প্রথমতঃ রামগড়ের রাজাকে দমন করিবার চেষ্টা পান। উক্ত রাজা পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। এতদ্ভিন্ন পালামৌ প্রদেশের জমিদার সুন্দর সিংহ ও রাজা জয়কৃষ্ণ রায় ও সেবেয়া কুটুম্বা প্রদেশের কতিপয় জমিদারও রামগড়ের রাজার পথানুসরণ করেন। হেদাৎ আলি রামগড় অধিকার করিয়া যখন পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্যান্য জমিদারগণকে দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সংবাদ পাইলেন যে, বিরারের মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা স্বীয় প্রধানকে চল্লিশ হাজার সৈন্যের সহিত বঙ্গবিজয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাহারা অচিরকালমধ্যেই তাঁহারই নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া বাঙ্গালাভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিহারের শাসন-কর্ত্তাকে তাহা অবগত করাইলে জৈনুদ্দীন নবাবের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া জৈনুদ্দীনকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার চিন্তার কোন কারণ নাই। যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা সত্য সত্যই উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে রীতিমত অভ্যর্থনা করা যাইবে। হেদাৎ আলি নবাবের মনোভাব অবগত হইয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিলেন ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রান্তভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের বাঙ্গালায় আগমনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অল্পকাল পরে আপনার সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় রাজত্বের শান্তি তাহাদিগের দ্বারা এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, দ্বাদশ বৎসর তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হয়। তজ্জন্য তিনি রাজ্যশাসনের অবসর পান নাই। *

---

* স্বর্গীয় পূজনীয় পিতৃদেব রচিত আলিবর্দ্দীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংঘর্ষের ইতিহাসের অধিকাংশই ১৩৪৫ সালের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।



চিরবিস্ময়

শ্রীবিভাবতী দেবী

সে যে কতকাল আগে—
পথের পাগল বাহিরিল কোন
অজানার অনুরাগে !
কবে কোন্ দিন উতলা বাতাসে
কার ইঙ্গিতখানি
উন্মনা করি মদির চিত্ত
দিয়েছিল হাতছানি।
চঞ্চল তার রঙিন পরাণে
লেগেছিল শিহরণ,
কোথাকার কোন অজানা ব্যথায়
কেঁপেছিল তনু মন !
কত গিরি দরি বন কান্তার
পার হল পরে পরে,
সেই অজানারি প্রতি ছায়া দেখি
নিখিলের ঘরে ঘরে।
কোন্ বেদনায় অদ্রি-অশ্রু
নির্ঝর-রূপ ধরি'—
নামিল ধরার উষর বক্ষ
সরস শ্যামল করি'।
সৌর ভুবন, অন্ধ আকাশ
করিয়া দীপ্যমান
ব্যোমচারণের পন্থা বহিয়া
কেন ঘোরে দিনমান !
মুক্ত বিহগ সম অন্তর
কল্প পাথার ভরে,
ঊর্দ্ধভিযান করিছিল যবে
গগন-বর্ত্ম ধরে,
তারালোক হতে এসেছিল ভেসে
কার যেন সুধা-স্বর,
নিঃসীম নীল মন্থর ব্যোম
কেঁপেছিল থর থর।
গগনের বুকে হেরিয়া চাঁদের
রভসের উৎসব,
বিপুল বারিধি-বুকে কেন জাগে
তরঙ্গ-বিক্ষোভ।
মেরু হতে মেরু প্রান্তর পারে
চলেছিল অভিযান,
ইঙ্গিতই শুধু এল হাসে ভাসে
নাহি পেল সন্ধান।
চকিতে কখনও হয়েছিল মনে
ওই বুঝি তার ছায়া।
আতপ্ত মরু বক্ষেতে হায়,
সে যে মরীচিকা-মায়া।
মানব-রচিত দেউলে দেখিয়া
মানবের গড়া দেবে,
প্রতি রূপে রূপে কোন্ অপরূপে
মরিল সে ভেবে ভেবে !
শুনিল অনেক শাস্ত্র-কাহিনী
পুরাণের কথা কত,
সৌরী, শৈব অনেক দেখিল,
বৈষ্ণব কত শত।
বহু পথ তবু পন্থা কোনই
দেখিল না কিবা আছে,
বিমূঢ় চিত্তে ঘুরে ম'ল শুধু
গোলকধাঁধাঁর মাঝে।
এখন সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে
নেমেছে অন্ধকার,
আয়ুবিহঙ্গ অচিরে হইবে
মৃত্যু-তোরণ পার
তবু কৌতুক নাহি হল শেষ—
নব নব বিস্ময়,
সেই চিরচেনা সেই সে অজানা
দেখাইল বরাভয়।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সুপ্রাপ্য করেছেন—তাতে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকসমাজের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বহু লোকে এ-গ্রন্থগুলি পড়বেন না, কেননা এখন শুনি আমাদের যুগ হচ্ছে রসসাহিত্যের যুগ—অর্থাৎ বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকারা এখন রসসাহিত্যই গলাধঃ করতে প্রস্তুত। সে রসসাহিত্যের অর্থ যাই হোক।

এঁদের পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র দুখানি পুস্তিকা আছে, যাকে এ যুগের নব আলঙ্কারিকরা রসসাহিত্য বলবেন। একখানির নাম 'নববাবুবিলাস'—অপরখানির 'নব বিবি বিলাস'। এ-দুখানির বিষয়ে আমি কিছু বলব না, কেননা এর রস আমার মুখরোচক নয়। এদের অন্তরে যদি কোন রস থাকে ত সে চিটেগুড়ের রস। তার ঘ্রাণেই অর্দ্ধবমন হয়ে যায়।

বাকিগুলি আর যে শ্রেণীর সাহিত্য হোক, রসের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর জের টানেনি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রসসাহিত্য নয়—কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন'ও প্রেমের কথায় ভর্ত্তি নয়। এ সত্বেও আমাদের জনকতকের পক্ষে এগুলি খাঁটি দলিল —কিসের তা পরে বলছি। আমাদের মত যাঁদের বাঙলার নিকট অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, তাঁরা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার প্রকাশককে বাহবা দিতে বাধ্য। বাঙলার আদি গদ্য গ্রন্থগুলি খুঁজে বার করাও পরিশ্রমসাপেক্ষ। প্রতি লেখকের নাম ধাম কাল আবিষ্কারও সহজে করা যায় না। এ যুগে আমরা অধিকাংশ সাহিত্যিকরা অলস। Facts উদ্ধার করবার জন্য আমরা খাটতে প্রস্তুত নই। আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্ণয় করতে ব্যস্ত—যদিচ সে কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তা ছাড়া যাঁরা পুরাতত্ত্ব নিয়ে মশগুল, তাঁরা কেউ কেউ আবিষ্কার করেন যে নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচাকা গ্রাম আর মহাভারতের একচক্র গ্রাম একই জায়গা। এই নাকি বিলেতি Orientalistদের মত। এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, উক্ত আবিষ্কারক কোন বিষয়ে অধিক অজ্ঞ;— মহাভারত সম্বন্ধে, না বিলেতি Orientalism সম্বন্ধে? অপর পক্ষে সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উড়ে নন্, বাঙালী; আর তাঁর জন্ম মেদিনীপুরে; আর তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন নাটোরে; শেষটা কলকাতায় এসে প্রথমে Fort William কলেজের শিক্ষক হন, পরে জজ পণ্ডিত—তখন এসব fact আমরা মেনে নিতে বাধ্য। আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙলা গদ্যের আদি লেখক রামমোহন রায়। তাঁর প্রথম পুস্তকের প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, বাঙালীরা অন্বয় করতে শেখেনি, আর তার উদাহরণ দিয়েছেন "প্রত্যক্ষ কানুন"। যেকালে আইনের অনুবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সুতরাং রামমোহনের সাক্ষী আমি মেনে নিয়েছিলুম।

এখন অবগত হলুম যে, মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। রামমোহন

এর পূর্ব্বে কোন বাঙলা পুস্তিকা লেখেন নি। আর 'রাজাবলী'র বাঙলা "প্রত্যক্ষ কানুনে"র অনুবাদের মত নয়।

'রাজাবলী' সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে, সে কথা বলা বারান্তরে। 'রাজাবলী' অবশ্য একালের Text Book Committee স্কুলপাঠ্য পুস্তক বলে গ্রাহ্য করবেন না, কিন্তু তাতে এ পুস্তকের মূল্য কিছু কমে না।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে আমি বহু পূর্ব্বে রাজশাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর লেখা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পড়লুম। এ হচ্ছে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থে'র উত্তর। এ গ্রন্থ আজও মন দিয়ে পড়া যায়, আর এর প্রধান গুণ—এতে রামমোহনের উপর গালিগালাজ নেই। পৌত্তলিকতার জন্য apology আছে, এবং সে apology শোনবার মত। রামমোহন রায় সে যুগের ধর্ম্ম-সংস্থাপনকারীদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেছিলেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' তারই জবাব। পুস্তিকার লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, কিন্তু এ জবাব লিখিয়েছিলেন পাথুরেঘাটার উমানন্দন বা নন্দলাল ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর দ্বারিকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিশেষ অনুকূল ছিলেন। সুতরাং এ পুস্তক বোধহয় এ দুই পরিবারের জ্ঞাতি-কলহের এক পৃষ্ঠা। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, এবং এ পুস্তকে তিনি বেশীর ভাগ তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এ পুস্তকে অনেক কটূক্তি আছে, কিন্তু খেউড় নেই; যদিচ এ পণ্ডিতের বিচারে চাপান উতোর আছে।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' পড়ে ধারণা হয় যে, গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর বাংলা ভাষা তাঁরা লিখতে পারতেন। একালে যাঁরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অথবা দর্শন বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের বিচারের চাইতে এই সব সেকেলে টুলো পণ্ডিতের বিচার নিরেশ নয়। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু ধর্ম্মের কথা সহজ বাঙলায় বলা যায়। এঁদের গদ্য যে সহজবোধ্য, তার কারণ বিলেতি শাস্ত্র পড়ে এঁদের মাথাও ঘুলিয়ে যায় নি, ভাষাও আধা-বিলেতি হয় নি। আমি আজ আর একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করব। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'। এই পুস্তিকাই প্রমাণ যে, স্ত্রীশিক্ষার কথা অনেক দিন আগে উঠেছে। পণ্ডিত মহাশয় স্কুল বুক সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত সোসাইটির অর্থাভাববশতঃ তাঁকে কর্ম্মত্যাগ করে মুন্সেফ হতে হয়। স্কুল-মাষ্টার যে হাকিম হয়, তার দৃষ্টান্ত আজও আছে। পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ একশ বৎসরেরও আগে। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের 'বামাবোধিনী' পত্রিকার Motto—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:—" এ বিধি এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়। আর খনা লীলাবতীকে আমরা আবিষ্কার করি নি, এই পূর্ব্বাচার্য্যেরা করেছিলেন এবং তাঁদের দোহাই দিয়েছেন,—আরও অনেক বিদুষীর। এমন কি তিনি বারেন্দ্রকন্যা রাণী ভবানী, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা "হঠী" বিদ্যালঙ্কার এবং কোটালিপাড় গ্রামের কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর নামোল্লেখ করেছেন।

রাণী ভবানী যে নিরক্ষর ছিলেন না, তার প্রমাণ আমি স্বচক্ষে পেয়েছি। অনেক ব্রহ্মোত্তরের

দানপত্রের নীচে তাঁর স্বাক্ষর আমি নিজে দেখেছি। অক্ষর খুব বড় বড়—আর কালি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও টেঁকসই,—আজও তা একটুও জ্বলে যায়নি। সেকালে তারা কি দিয়ে কালি তৈরী করত? ভূষো কালি আর হীরেকষ দিয়ে?

এ পুস্তকে বলা হয়েছে যে, বেদে পুরাণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোনও নিষেধ নেই এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তার বিধি আছে; তার উপরে খনা লীলাবতী প্রভৃতির নাম দেখানো হয়েছে। কিন্তু এসব কথা পুরুষদের বলা হয়েছে, মেয়েদের নয়। সেকালে মেয়েরা শিক্ষিত হতে আপত্তি করতেন, সে কারণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন নামে একটি অংশ জুড়ে দিয়েছেন। উক্ত কথোপকথন থেকে টের পাই যে, সেকালের মেয়েদের নাকি ভয় ছিল যে লেখাপড়া শিখলে তারা বিধবা হবে। একালে অবশ্য সে ভয় কারও নেই। বরং একালে ভয় এই যে, বেশী লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নাকি সধবা হবে না।

এই কথোপকথন খাঁটি বাঙলায় লেখা, অর্থাৎ সে ভাষা Idiomএ ঠাসা। নমুনা স্বরূপ এ কথোপকথনের একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'ক' অক্ষর যার গোমাংস, এমন একটি মেয়ে বলছেন—

"ওলো। তোর আপন কথাই পাঁচ কাহন।...এমন ঘোড়ার কামড় করিলে কি কায চলে।... আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই।"

এর উত্তরে, যাঁর বর্ণ-পরিচয় হয়েছে তিনি বললেন—

"ওলো অবোধ ছুঁড়ি। ইহা জানিস্ না যে পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়।" আজকালকার উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা এ ভাষা কি বলতে পারেন, না বুঝতে পারেন? হিন্দুস্থানীরা যাকে বলে জেনানা বুলি, এখন তা লুপ্তপ্রায়।



অতিথি

(রঙ্গ-নাটিকা)

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গল্পে যাঁদের অবতারণা করা হয়েছে

নীলকণ্ঠবাবু	···	···	বাড়ীর কর্ত্তা
অন্নপূর্ণা দেবী	···	···	তাঁর স্ত্রী
শুভা	···	···	তাঁর কন্যা
পটল	···	···	ছোট ছেলে
জীবনবাবু	···	···	অভ্যাগত
অলক	···	···	তাঁর পুত্র
গোবর্দ্ধন	···	···	চাকর

[গল্পের যবনিকা যেখানে উঠলো, সেটি হচ্ছে নীলকণ্ঠবাবুর বৈঠকখানা ঘর। এক দিকে তক্তপোষ—তার ওপর শীতলপাটি এবং গোটা দুই আধময়লা তাকিয়া, অন্য দিকে খান দুই কেঠো চেয়ার এবং একটি সাধারণ টেবিল। দেয়ালের গায়ে লণ্ঠন-কোম্পানীর একটি দিন-পঞ্জী আর ঠাকুর-দেবতার খান কয়েক পট। ঘরটি রাস্তার ওপর। ভেতরকার দরজাটি দিনের বেলা বন্ধ থেকে একে অন্তঃপুর থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে, রাত্রি বেলা এটি যায় খুলে এবং ভেতরে বাইরে অকপট মিতালি ঘটে। সকালে সন্ধ্যায় টেবিল চেয়ারগুলি অধিকার করে ছেলে মেয়েরা মাস্টার মশায়ের কাছে পাঠ নেয়—আর তক্তপোষ জুড়ে বসেন কর্ত্তা, সেখান থেকে আলবোলা সেবন এবং শিক্ষক ছাত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

গ্রীষ্মের দুপুর। নীলকণ্ঠবাবুর ছোট ছেলে পটল ঘরের মেঝেয় লাট্টু ঘোরাচ্ছে। পটলের বয়স বছর এগারো, পরণে খাঁকির হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছিটের হাতকাটা সার্ট। যে আগন্তুকটি রাস্তার দিককার খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটি বারকতক সতর্ক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে সরাসরি এসে চেয়ারে বসেছেন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হবে—গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে ফিতে-বাঁধা ক্যানভাসের জুতো—হাতে একটি বিবর্ণ ছাতা। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। উভয়ের খানিক কথাবার্ত্তা হবার পর থেকে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ। এইখানে বলে রাখি আগন্তুকের নাম জীবনবাবু।]

জীবন। তাহলে তোমার বাবা বাড়ী নেই ?

পটল। আজ্ঞে না। আফিসে গেছেন।

জীবন। আজকে ছুটি নেই ?

পটল। ছুটি ছিল, কিন্তু কি দরকারী কাজ ছিল বলে বাবাকে যেতে হয়েছে।

জীবন। তাহলে আমি আসব সে কথা তিনি বলে গেছেন।

পটল। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা বলে গেছেন, আপনি এলে যেন আপনার চান আর খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তিনি পাঁচটার ভেতরই ফেরবেন।

জীবন। তা এখন বাড়ীতে কে আছে ?

পটল। মা, আর দিদি, আর আমি, আর গোবর্দ্ধন চাকর।

জীবন। তোমার দাদারা ?

পটল। আমিই ত বড়—আমার ত দাদা নেই।

জীবন। ও বটে বটে, তাই তা তা তোমার কাকা টাকা…

পটল। এখানে ত কেউ থাকে না। মেজ কাকা থাকে পাটনায়, আর ছোট কাকা বরিশালে।

জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি যেন তাদের নাম ? কি বলে…

পটল। মেজ কাকার নাম হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, আর ছোট কাকার নাম নরেন্দ্রনাথ…

জীবন। ঠিক ঠিক হরু আর নরু। ছোট বেলায় দেখেছি তাদের, এখন বোধ হয় বেশ বড় সড়ো হয়েছে।

পটল। হ্যাঁ, মেজকাকা প্রফেসারী করেন, ছোটকাকা করেন ওকালতী।

জীবন। বেশ বেশ। তা তোমার বাবার…কি বলে গিয়ে…

পটল। বাবার নাম ? ধীরেন্দ্র—

জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ…জানি জানি খুব জানি। তোমার বাবা যে আমার বিশেষ বন্ধু গো।

পটল। জানি। বর্দ্ধমানে ত আপনার সঙ্গে বাবা পড়তেন।

জীবন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এইত জানো দেখছি। তা একবার…

[অন্দর থেকে দরজায় ঘা এবং চাবির আওয়াজ এলো। অর্থাৎ নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী পটলকে ডাকছেন—অতিথির সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না করে, তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা আগে করবার জন্যে। পটল বাবার অনুপস্থিতিতে বড় ছেলেরূপে কর্ত্তৃত্ব করছিল, সে বিরক্ত হয়ে ভেতরে গেল। সেখানে মায়ের সঙ্গে তার কি কথাকাটি হ'ল, জীবনবাবু তা শুনতে পেলেন না—দরজার ব্যবধান এড়িয়ে শুধু এগিয়ে আসতে লাগলো একটা চাপা ফিসফাস।]

জীবন। [আপনা আপনি] কর্ত্তা ফিরবে পাঁচটায়, এখন বড় জোর আড়াইটে—ঢের সময় রয়েছে। কলকাতা বিষম জায়গা বাবা—পয়সা ফেললে এখানে যে কোন সময় যেখানে-সেখানে খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু পায়খানার দরকার হলেই গিয়েছো আর কি। আঃ কি মুস্কিল! ছোঁড়াটা যে কিছুতেই ফেরে না দেখছি…

[পটলের পুনঃপ্রবেশ]

পটল। কাকাবাবু, মা বললেন, আপনি চানটান সেরে নিন—এক্ষুনি খাবার হয়ে যাবে। এতটা রাস্তা গাড়িতে এসেছেন…

জীবন। আরে রাম রাম। চান খাওয়া সব আমি গাড়িতেই সেরে এসেছি। ও নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত হতে বারণ করো। হ্যাঁ, আমি একবার শুধু পায়খানায় যাবো—সেই ব্যবস্থাটা শীগ্রী করে দাও ত বাবা।

পটল। আচ্ছা, আপনি বসুন—আমি ঠিক করে আসছি।

জীবন। [আপন মনে] যা ব্যাটা, শীগ্রী যা। নারায়ণ, নারায়ণ।

পটল। [দরজার ওপিঠ থেকে] আসুন কাকাবাবু—এই দিকটা দিয়ে চলে যান, ঐ চৌবাচ্চাটার পাশে ঐ যে…

[জীবনের প্রস্থান। নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সুবি, ও সুবি, সেলাই রেখে একবার এদিকে আয়। দিন রাত্রি শুধু ও নিয়ে থাকলেই চলবে ?

[মেয়ে শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি বলছো ?

অন্নপূর্ণা। বঙ্কিমবাবু এসেছেন। বাথরুমে গেছেন—তুই এই ফাঁকে স্টোভটা ধরিয়ে চট করে খান আষ্টেক লুচি আর আলু বেগুন ভাজা করে ফেল দিকি। আমি গোবর্দ্ধনকে দিয়ে কিছু মিষ্টি আনিয়ে নিচ্ছি।

শুভা। আমি এখন পারবো না বাবু। আর আধঘণ্টার মধ্যেই অলকদা আসবে—আমরা বলে মেট্রোয় যাবো। তাই আমি তাড়াতাড়ি টেবিল ক্লথটা সেরে নিচ্ছি···এখন···

অন্নপূর্ণা। পোড়ার মুখো মেয়ে! ঘরের কোন কাজ করতে বললেই মুখ হাঁড়িপানা হয়। খালি মেট্রো, আর নভেল, আর অলকদা। বিয়ে-থাওয়া করে অলকের সঙ্গে বিদেয় হয়ে যা বাপু, আর জ্বালাতন আমার ভালো লাগে না।

শুভা। কেন, আমি করেছি কি, তাই শুধু শুধু বকছো ?

অন্নপূর্ণা। বকবো না? জানিস বঙ্কিমবাবু কেন এসেছেন, আর তিনি কর্ত্তার কত বড় বন্ধু? আমাদের দরকারে কাজ কর্ম্ম ফেলে বর্দ্ধমান থেকে ছুটে এসেছেন। ওঁর আদর যত্নের কোন ত্রুটি হলে, কর্ত্তা এসে আর কারুকে আস্ত রাখবেন না।

শুভা। অ্যাঁ! আজকে বলে টার্জ্জানের সেকেণ্ড পার্টটা আছে—অলকদা ল' কলেজ থেকে ফিরেই আমায় নিয়ে যাবেন কথা আছে, তা না, বসে বসে তোমার বঙ্কিমবাবুর লুচি ভাজিগে!

অন্নপূর্ণা। তা সে ত তিনটের পর। এ আর কতক্ষণের কাজ? চটপট সেরে নে, নিয়ে যেখানে খুসী যা বাপু—আমি আর এখন পারছি নে।

শুভা। হ্যাঁ—এতগুলো কাজ করে, তারপর আবার জামা কাপড় বদলে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে যা, এখনি গিয়ে বসে থাকগে যা। লক্ষ্মীছাড়ী ধিঙ্গী কোথাকার!

শুভা। বাবারে বাবা, করছি গে। সব তাতেই আবার রাগ!

[শুভার প্রস্থান]

অন্নপূর্ণা। খোকন!

পটল। [দরজার ওপিঠ থেকে] কি মা?

অন্নপূর্ণা। গোবর্দ্ধনকে কর্ত্তার ঘরে বিছানাটা তৈরি করে দিতে বলেছি। ওঁর মুখ-হাত ধোয়া হলে, একেবারে ওপরে নিয়ে যাবি—বুঝলি? আর ছাখ, বিছানা হল কিনা, যদি হয়ে গিয়ে থাকে ত গোবরাকে নিচে আসতে বল—দোকানে যাবে।

পটল। আচ্ছা। কাকাবাবুকে কি তামাক সেজে দোব মা?

অন্নপূর্ণা। দে না। ওঁর গড়গড়াটা ওপরে নিয়ে যেতে বল।

পটল। মা, আমায় সেই লটাইয়ের পয়সা ?

অন্নপূর্ণা। দোব দোব। আজ সন্ধ্যের সময় নিস, এখন যা। বাড়িতে লোক এসেছেন, আদর যত্ন করতে হয়। এই যে তোর বিছানা করা হয়েছে রে, তাহলে একবার দোকানে যা—দাঁড়া আসছি।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান]

পটল। বুঝেছিস, সেই ঝালঝাল আর নেবুর রস দেয়া। এনে দিদির হাতে লুকিয়ে দিবি—মা যেন জানে না, বুঝলি। পাছ দোর দিয়ে আসিস।

[আধ ঘণ্টার অবকাশ। ইতিমধ্যে জীবনবাবু বাথরুমকৃত্য শেষ করে সুস্থ হয়েছেন এবং দোকানের আনীত মিষ্টান্ন ও শুভা দেবী ভর্জ্জিত লুচি ও ভাজি সেবনান্তে পান মুখে নীলকণ্ঠবাবুর বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়ি টানছেন। পটল তাঁর মাথার শিয়রে বসে পাকা চুল তুলছে এবং কাকা বাবুর সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলেছে। আর শুভা মাতৃআজ্ঞা পালনান্তে ক্ষুণ্নমনে আয়নার সাম্নে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে—সায়া, সেমিজ, শাড়ী, ব্লাউজ, বস্ত্র পর্ব্বের সব কটা অঙ্গই শেষ হয়েছে, এখন বাকী চুলটা ঠিক করা, ঠোঁট, গাল, গলা ইত্যাদির অনুরঞ্জন এবং জুতো। ব্যস্ত দৃষ্টিতে সে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, আর দ্রুত হাত চালাচ্ছে। ওপর তলা এবং নীচের তলার এই কর্ম্মচাঞ্চল্যের ফাঁকে অন্নপূর্ণা এসে আবার বিছানা নিয়েছেন—কলে জল আসতে এখনও একটু দেরী আছে, ঝিও আসে নি, সুতরাং বিশ্রামটা মারা যায় কেন ?

বাইরের ঘরে সহসা নীলকণ্ঠবাবুর আবির্ভাব হল। তিনি তক্তপোষে বসে হাঁক দিলেন, পটলা! সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল গোবর্দ্ধন, উড়ে চাকর—নিটোল কালো চেহারা, গলায় মালা, ট্যাঁকে পানের বটুয়া, বয়স তেইশ চব্বিশ। নীলকণ্ঠবাবুর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, গায়ে চীনে কোট—পায়ে আলবার্ট স্যু, চোখে বাইফোকাল লেন্সের চশমা।]

নীলকণ্ঠ। ওরে তোর মা কোথায় ?

গোবর্দ্ধন। মা শুই আছেন।

নীলকণ্ঠ। একবার ডাক দিকি।

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান]

এখনই আবার ভ্যাজ ভ্যাজ আরম্ভ হবে। মেজাজ তো সপ্তমেই চড়ে আছে।

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। কি হুকুম ? একটু শোবার জো নেই।

নীলকণ্ঠ। আরাম করেই শোও গে। বাঁকু আজ আসতে পারবে না—তার ছোট মেয়ের কলেরা হয়েছে, অফিসে গিয়েই টেলিগ্রাম পেলাম। তাই তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম, নইলে আবার রান্নাবান্না করে ফেলবে।

অন্নপূর্ণা। বেশ করেছো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা বিভ্রাট যাহোক। আমারই কপাল—নইলে যেমন করছি তাড়াতাড়ি, তেমনই একটা না একটা ব্যাগড়া পড়বে কেন ?—ভালোয় ভালোয় বেচারীর মেয়েটা সেরে গেলে হয়—এদিকেও আর সময় নেই, হঠাৎ দর পড়ে গেলেই ব্যবসার দফা রফা হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। [মৃদু হেসে] ন্যাকামি রেখে ওপরে যাও দিকি। ভদ্রলোক একা পড়ে আছেন, পটলা ভ্যান ভ্যান করে জ্বালাতন করছিল বলে তাকে নীচের বসিয়ে রেখেছি।

নীলকণ্ঠ। ভদ্রলোক ?

অন্নপূর্ণা। ভদ্রলোক কি ছোটলোক, তা তুমিই জানো। তোমারই বন্ধু।

নীলকণ্ঠ। কি বলছো পাগলের মতো ?

অন্নপূর্ণা। আমার তো সব কথাই পাগলের মতো। তোমার সেই বঙ্কিমবাবু না কোন যম এসেছেন, গিলে কুটে ওপরের ঘরে পড়ে আছেন—গিয়ে দেখো গে।

নীলকণ্ঠ। তার মানে কি ? বেলা আটটায় টেলিগ্রাম করেছে, আমি পেয়েছি এগারোটায়—এর মধ্যে সে বর্দ্ধমান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা কি ?

অন্নপূর্ণা। তা আমি কি করে জানবো ? ঠাট্টা রাখো বাপু, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে, মাগো, ও আবার কি !

নীলকণ্ঠ। আরে এই তো টেলিগ্রাম—Last daughter's Cholera, can't go—Bankim.

অন্নপূর্ণা। তাহলে রসিকতা করেছেন আর কি।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু রসিকতা করার মানুষ তো সে নয়—আর এমন ভয়ানক কথা নিয়ে রসিকতা।

অন্নপূর্ণা। তা বাবু ওঠোই না—গিয়ে দেখে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর গে।

নীলকণ্ঠ। তাই যাই—তুমি বলছো কি গো !

[নীলকণ্ঠের প্রস্থান]

অন্নপূর্ণা। সব তাতেই আবার আদিখ্যেতা। পনেরো দিন আগে থেকে আসবার কথা রয়েছে—ভদ্রলোক ঠিক সময়ে এসেওছেন, এখন তাই নিয়ে ঢং হচ্ছে। বুড়ো কালে এতও ভালো লাগে !

[যথারীতি কেতাদুরস্ত শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি আশ্চর্য্য ! অলকদার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আর তো আছে মোটে দশ মিনিট—এর মধ্যে যাওয়াই বা হবে কি করে, টিকেটই বা কেনা হবে কখন ? শুধু শুধুই এত করে সাজ গোজ করলাম···আচ্ছা আসুক, তারপর দেখাচ্ছি মজাটা।

[পটলের প্রবেশ]

পটল। বেশ হয়েছে। আমায় নিয়ে যেতে বললাম, তা হল না। এখন যা না টার্জ্জান দেখ গে··· অলকদা একাই চলে গেছে, তোকে নিয়ে যাবে, না কচু !

শুভা। ভালো হচ্ছে না কিন্তু খোকন।

পটল। বা রে আমি কি করেছি ?

শুভা। তোকে টিপ্পনি কাটতে কেউ ডেকেছে ?

পটল। টিপ্পনি কাটলাম কোথায় ? আমি তো শুধু বলেছি অলকদার সঙ্গে তোর বিয়ে···

শুভা। হতভাগা কোথাকার !

[পটল দৌড়ে পালালো, তার পেছু পেছু ছুটলো শুভা]

[বিব্রত মুখে অন্নপূর্ণা এবং নীলকণ্ঠবাবুর প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। ওমা, সে আবার কি ?

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ। আমি বাঁকুকে চিনে নে ? আমার ছেলেবেলার বন্ধু—বছরে অন্ততঃ বিশ বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়—তার রং ধপধপে ফর্সা, এটা কালো মোষ—তার মাথায় কোঁকড়া চুল, এর মাথায় টাক—সে রোগা, আর এ কেঁদো মোটা। এ কেন সে হবে ?

অন্নপূর্ণা। তা কি করলে তুমি ?

নীলকণ্ঠ। উপস্থিত ও ঘরে ছেকল দিয়ে রেখেছি। ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, তারপর যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি ? লোক জন ডাকো—ঘরের ভেতর একটা বাইরের বদমায়েস পোরা থাকবে!

নীলকণ্ঠ। থামো থামো। সব তাতেই উদ্ব্যস্ত হলে চলে না। আমি বাড়ী ছিলাম না, বাড়ীতে কোন ব্যাটাছেলে নেই—এর মধ্যে একটা বাইরের লোক এসে নাইছে, খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, এসব শুনলে লোকে তোমায় কি বলবে জানো ?

অন্নপূর্ণা। কি ঘেন্নার কথা মা।

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, লোকে সেই কথাই বলবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে কি করবে ? রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে—ঘরে ঢোকার জো নেই!

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও অলক আসুক—সে ল' ট' পড়ছে, চালাক চতুর ছেলে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে যাহোক করবো।

অন্নপূর্ণা। জানিনে বাবু।

[অলকের প্রবেশ। অলকের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—গোঁফ কামানো, লম্বা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে, চোখে সোনার চশমা—ব্যাক ব্রাস করা চুল। মুখটি হাসি হাসি।]

নীলকণ্ঠ। এই যে এসো বাবা। তোমাকেই দরকার। মহা বিভ্রাটে পড়েছি, এখন যা হয় একটা মতলব বার করো দিকি।

অলক। কি হয়েছে ?

নীলকণ্ঠ। চলো, ভেতরে চলো, বলছি। এসো গো সব কথা অলককে বলো—তা হলে ও বুঝতে পারবে।

[সকলের প্রস্থান]

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বাবার সবতাতেই অনাছিষ্টি। বাইরের লোক আবার কখনো পরের বাড়ী ঢুকে নির্ভয়ে ঘুমুতে পারে ? হৈচৈ করে শুধু আমার সিনেমা দেখাটা মাটি করলেন। এলো অলকদা, তাকে টেনে নিয়ে গেলেন—পরামর্শ করতে। দরকার কি বাপু ? না হয় ধরেই নিন, এই বঙ্কিমবাবু। তাতে আর কি যেতো আসতো ?

পটল। দিদি, কি মজা হয়েছে জানিস ?

শুভা। জানি জানি, যা। যত সব বাজে·· দেখিস শেষে ঠিক হবে, ইনিই বঙ্কিমবাবু। মধ্যে থেকে কেবল আমার সিনেমা দেখাটা ভেস্তে গেল।

পটল। যা যা, আর সিনেমা দেখে না। বাড়ীতে বলে চোর ঢুকেছে, আর উনি সেজেগুজে সিনেমায় যাবেন।

নীলকণ্ঠ। [ভেতর থেকে] পটলা, এদিকে আয় ত।

[পটলের প্রস্থান]

শুভা। শেষ পর্য্যন্ত এরা কি করছে কে জানে। বেশ ত বাপু, যদি এ লোক না হয় তাড়িয়ে দিলেই হল—তা নিয়ে এত হট্টগোলে দরকার কি? শুধু শুধু সময় নষ্ট, আর অলকদাটাও যেন কি, হুজুগ পেলে হয়।

[প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠ এবং অলকের প্রবেশ]

অলক। আপনি যান, তুলে নিয়ে আসুন—আমি নীচেয় আছি।

নীলকণ্ঠ। সাহস হচ্ছে না যে।

অলক। কিচ্ছু ভয় নেই—বরং একগাছা লাঠি হাতে করে যান, আর আমিও একগাছা নিয়ে অপেক্ষা করি। তেমন তেমন দেখলে পিটিয়ে সোজা করে দিলেই হবে।

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও বাবা, আগে তদন্তটা করে নিই। কে জানে কি মতলবে এসে ঢুকছে, সঙ্গে কি হাতিয়ারপাতি আছে, তাও জানিনে। পটলা, এই পটলা।

[পটলের প্রবেশ]

হ্যাঁরে, তুই ভালো করে দেখেছিস তো, পিস্তল বন্দুক কিছু নেই টেই তো?

পটল। না বাবা। জামাটা খুলে হুকে রেখে গেঞ্জি গায়েই তো গেল—কোমরে কাপড়ের কষি ছিল, আর কিচ্ছু না।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু জামার পকেটে, কিংবা ট্যাঁকে তো কিছু থাকতে পারে। তা তুই কি করে জানবি?

পটল। সে আমি জানিনে। কিন্তু নেই বাবা কিচ্ছু, তুমি বরং দেখগে—বেশ সুন্দর গল্প বলে বাবা, ও কি কখনো বন্দুক ছুঁড়তে পারে?

নীলকণ্ঠ। তুই তো ভারী মানুষ চিনিস। তা এক কাজ কর—রান্নাঘর থেকে তিনখানা চেলা কাঠ নিয়ে আয়, একখানা আমায় দে, একখানা গোবরাকে দে, একখানা তুই নে—চল তিনজনে একসঙ্গে ওপরে যাই, আর অলক নীচেয় থাকুক···কি বলো বাবাজী?

অলক। [মৃদু হেসে] তাই করুন।

[নীলকণ্ঠ এবং পটলের প্রস্থান]

[অলক জামার আস্তিন গুটালো, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরলো, তারপর দরজার খিলটা খুলে নিয়ে সেটা কাঁধে ফেলে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলো। ইতিমধ্যে শুভা এসে উপস্থিত। অলকের এই রূপান্তর দেখে সে হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।]

শুভা। সেলাম জমাদার সাহেব।

অলক। সেলাম বিবিসাহেবা। কি করবো বলো, তোমার বাবা যে কাণ্ডটি বাধালেন।

শুভা। যান, আপনি ভারী ইয়ে। বাবা আসার আগে এলে কি হত? তাহলে কোন্ কালেই চলে যাওয়া যেতো। তা না…

অলক। একটু বিশেষ কাজে দেরী হয়ে গেল। সত্যি সুবু, আমার দোষ হয়ে গিয়েছে।

শুভা। হ্যাঁ, দোষ হয়ে গিয়েছে। তা সাড়ে ছ'টার শো'তে যাওয়া হবে, না তাও হবে না?

অলক। নিশ্চয় হবে। জানো মা'র মত হয়েছে, কিন্তু মুস্কিল বাবাকে নিয়ে, তিনি যে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা ঘরে তুলবার ফন্দী আঁটছেন কিনা।

শুভা। আমি তার কি জানি?

অলক। তোমাকে জানতে হবে না—যা করার আমিই করবো। একটা কোন কায়দায় না ফেলতে পারলে তো বাবাকে রাজী করানো যাবে না, তাই সেই ফিকিরে আছি—দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, একটা মজা হয়েছে জানো, আচ্ছা যাক, সিনেমায় গিয়ে বলবো।

শুভা। আচ্ছা। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি—এখন চললাম। আপনি ততক্ষণ দারোগাগিরি সেরে নিন।

[প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠবাবু, পটল এবং গোবর্দ্ধনের কাঠচেলা হাতে বীরদর্পে প্রবেশ। সঙ্গে কাঁচা ঘুমে উঠে আসা জীবনবাবু, কাপড়চোপড় অসামাল, ঘন ঘন হাই উঠছে, কিন্তু মুখে একটি কৌতুকের হাসি। এঁদের সাড়া পাবা মাত্র অলক মিলিটারী কায়দায় তড়াক করে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, আর হুঁড়কোটা কাঁধে তুলে নিল।]

নীলকণ্ঠ। ও সব কথা শুনতে চাইনে। আপনি কি জন্যে ভরা দুপুরে ভদ্দর লোকের বাড়ীতে ঢুকছেন, তাই শুনি। জানেন, আপনাকে…বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেয়েছেন।

অলক। [হঠাৎ তাকিয়ে] অ্যাঁ…বাবা?

জীবন। তুই…এখানে…কি সর্ব্বনাশ।

অলক। আমি যে এই বাড়ীতে পড়াই, ইনিই তো নীলকণ্ঠবাবু।

জীবন। রক্ষে হোক, আমি ভাবছিলাম বুঝি বাপব্যাটা দু'জনেই এক জালে…

নীলকণ্ঠ। ব্যাপার কি? বাবাজী, ইনি তোমার…

অলক। আজ্ঞে, আমার বাবা।

[আস্তে আস্তে খিলটি নামিয়ে রাখল, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়লো। পটল এবং গোবর্দ্ধন পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।)

নীলকণ্ঠ। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

জীবন। ব্যাপার অতি সহজ। এসেছিলাম সিমলা ষ্ট্রীটে—বড্ড পায়খানার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কি করি, কাছে ভিতে কোন পার্ক নেই, চেনাশুনো লোক নেই, বেগতিক দেখে ঢুকেছিলাম আপনার এই ঘরে—ছোট ছেলেটি খেলা করছিল, ভেবেছিলাম তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে একটা ব্যবস্থা করে নেবো, তা আমি ঢুকতেই ছেলেটি খুব অভ্যর্থনা করলে, বললে, বাবা

বলে গেছেন আপনি এলে যেন নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়—আর বললে, বাবা ফিরবেন পাঁচটায়। বুঝলাম কারুর আসার কথা আছে, তিনি আসেন নি—সুতরাং এই ফাঁকে কার্য্য সেরে সরে পড়বো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে পরিমাণ জলযোগ এবং আদর যত্নের আয়োজন হল, তাতে বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি···আর তাইতেই আপনি আসার আগে পালাতে পারি নি।

নীলকণ্ঠ। হাঃ হাঃ হাঃ! করেছেন ত বড় মন্দ নয়! যাকে বলে কমেডি অব এরার্স···তা ওরা কেউ ধরতেও পারলো না? পারবেই বা কি করে? আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল—বাড়ীতে বলে গেছলাম, ওরা সেই জন্যে তৈরি ছিল। এদিকে সে আসতে পারলো না—অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ীতে খবর দিতে এসে শুনি সে এসেছে। বুঝুন তখন আমার অবস্থটা···তা না চিনে বড়ই···

জীবন। কিছু না, কিছু না। আমিও একটু রঙ্গ করেছি, তার উত্তরে আপনারাও একটু···

নীলকণ্ঠ। নইলে দেখুন অলককে আমরা ছেলের মতোই দেখি—আপনি তার বাবা, আপনি ত আমাদের আপনার জন।

জীবন। বটেই ত, বটেই ত। আপনাদের কথা রোজই শুনি। তা বেশ, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল!

নীলকণ্ঠ। দেখুন আপনার সঙ্গে আরো নিকট আত্মীয়তা হবে বলেই দৈব এই যোগাযোগ ঘটালেন। নইলে ঠিক এক সঙ্গে এতগুলো জিনিষ ঘটলো কেন—বাঁকু আসতে পারলো না, আমাকে বেরুতে হল, আপনার পায়খানার প্রয়োজন হল! এ থেকে বিধাতার একটা গভীর উদ্দেশ্যের আভাষ পাচ্ছেন না আপনি?

জীবন। না ত।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা চলুন, ওপরে সব বুঝিয়ে বলছি। অনেক দিন থেকেই ভাবছি আপনার কাছে একবার যাবো, তা আর হয়েই ওঠে না! সত্যি বলতে কি, সাহসই পাইনি। আজ যখন যোগাযোগটা আপনা থেকে ঘটে গেল, তখন বুঝতে হবে বিধাতা নিজে থেকেই ব্যবস্থাটাকে এগিয়ে এনেছেন।

জীবন। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনে মশাই।

নীলকণ্ঠ। চলুন, চা খেতে খেতে বলছি গে।

জীবন। ভোম্বল কোথায় গেল?

নীলকণ্ঠ। কে অলক? সে ঠিক আছে, তার কাকীমার সঙ্গে গল্প করছে বোধ হয়···আসুন আপনি ওপরে আসুন। ওরে ওপরে চা দে, তামাক দে।

জীবন। চলুন। কিন্তু বাড়ী ফেরবার দরকার ছিল—অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

নীলকণ্ঠ। আহা হা, যাবেনই ত। আমার বাড়ীতে কি আর থাকবেন? দৈব নিয়ে এসেছিল, নইলে কোন দিনই কি পায়ের ধুলো পড়তো!

জীবন। [মনে মনে] মার বাঁচলো, কিন্তু তার বদলে কপালে কি আছে কে জানে। নইলে এত খাতির করছে—ব্যাপার কি? পড়েছি প্যাঁচে, ঘাড় পাততেই হবে।

নীলকণ্ঠ। নিয়ে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অন্নপূর্ণা এবং পটলের প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সত্যি ?

পটল। হ্যাঁ মা। সেই জন্যেই ত অলকদা পালালেন।

অন্নপূর্ণা। কি লজ্জার কথা। ভাগ্যি কেউ মারাধরা করে নি। তাই মানুষে বলে…তা না। আচ্ছা লোক যাহোক। তা এখন কি কথা হচ্ছে ?

পটল। জানি নে, তা একটু একটু শুনলাম, দিদির বিয়ের কথাটথাই আর কি…

অন্নপূর্ণা। মিন্সে মত করেছে তা হলে ? মধুসূদন মুখ তুলে চান—নইলে মেয়ের আমার খোয়ারের শেষ থাকবে না।

পটল। ইস, মত করবে না ? তাহলে ঠেঙিয়ে এক্ষুণি…

অন্নপূর্ণা। চুপ চুপ, গাধা ছেলে। ওকথা বলতে আছে ?

[গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন। মা, বাবু ডাকিছেন ?

অন্নপূর্ণা। ওমা সে আবার কি ? আমি কোথায় যাবো ?

গোবর্দ্ধন। কি বিয়া ঘরের কথা হবো।

পটল। হ্যাঁ মা, চলো মা, বেশ মজা হবে।

অন্নপূর্ণা। তুই যা না বাপু—তুই ত আর মেয়েমানুষ নস।

[ওপর থেকে]

নীলকণ্ঠ। কৈ গো, এসো একবার। ওঁর ত আরো কাজকম্ম আছে।

অন্নপূর্ণা। পারি না বাপু। চ খোকন, আমার সঙ্গে। নারায়ণ, নারায়ণ।

[তিন জনের প্রস্থান]

[অলক এবং শুভার প্রবেশ]

অলক। চলো। চটপট বেরিয়ে পড়ি, নইলে হয়ত ডাক পড়বে।

শুভা। ভালোই ত। সামনাসামনি কথা পাকা হয়ে যাবে।

অলক। য্যাঃ, তাই কখনো পারা যায় নাকি ?

শুভা। কেন, তখন যে বড় বলছেন, সত্যের জন্যে, বাপ হোক, মা হোক, ঈশ্বর হোক, কারুর বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে আপনার ভয় নেই। এখন তবে সামনে যেতেই যে বড় সাহস হচ্ছে না।

অলক। মুখে বলা এক, কাজে করা আর।

শুভা। তা আমি জানতাম। তাই ভয়ে রাত দিন আমার বুক দুরদুর করতো।

অলক। এখন ভয় ভেঙেছে ?

শুভা। তা ভেঙেছে। কৈ চলুন…সন্ধ্যের শো'ও যদি দেখা না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার সঙ্গে…

অলক। সুবু?

শুভা। কি?

অলক। আমার একটা কথা রাখবে বলো?

শুভা। কি?

অলক। আমাকে 'তুমি' বলবে।

শুভা। না, ভীষণ লজ্জা করে।

অলক। বেশ। রেখো না আমার কথা।

শুভা। রাগ করলেন? আচ্ছা আচ্ছা তুমি…হল তো? এবার চলা হোক।

[দুজনের প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠবাবু, জীবনবাবু এবং অন্নপূর্ণা দেবীর আলোচনা একঘণ্টা আন্দাজ চললো। চা এবং মিষ্টান্ন সহযোগে আলোচনাটা অধিকতর মনোজ্ঞ হয়েছিল নিঃসন্দেহ। জীবনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারপর উভয়ে নেমে এলেন যখন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়।]

জীবন। আচ্ছা, আসি তাহলে। বেয়ান, একবার পায়ের ধুলো দেবেন যেন।

অন্নপূর্ণা। [সলজ্জভাবে ঘাড় হেঁট করে] যাবো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা। আচ্ছা।

[জীবনবাবুর প্রস্থান]

যাক, কার্য্য উদ্ধার হল। এখন ভালোয় ভালোয় মামলা খতম করতে পারলে হয়।

অন্নপূর্ণা। কারে না পড়লে কঞ্জুস মিন্সে কখনো ঘাড় পাততো ভেবেছো?

নীলকণ্ঠ। আরে সবই তাঁর ইচ্ছে—মুখের মধ্যে নইলে শিকার আপনা থেকে এসে পড়ে? এই বাজারে অলকের মতো ছেলে…এক রকম বিনা খরচেই…। ও ভেবেছিল আমাদের ঠকাবে—কেমন চালটি খেললাম, বলো তো।

অন্নপূর্ণা। আমার মেয়েও তো বাপু ফেলনা নয়। ওরা কটা মেয়ে ও রকম পাবে……টাকা কিছু হয়ত পেতে পারে।

[তিনি ভেতরে চলে গেলেন। নীলকণ্ঠ আলো জেলে, রাস্তার দিককার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।]



ফ্যান

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ না থাকা একটা বড় দুর্ভাগ্য এবং সে দুর্ভাগ্য আমাদের এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়িকার পুরোমাত্রায় ছিল। লোকে তাকে দেখলে ঘৃণায় নাক সিঁটকাত। কিন্তু তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সুন্দরকে আদর আর অসুন্দরকে অনাদর মানবমনের চিরন্তন প্রকৃতি। কোনখানে যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় ত সে হচ্ছে মনের ওপর বুদ্ধির মুরুব্বিয়ানা। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, যার কথা লেখা হচ্ছে সে তোমার আমার মত মানুষ নয়—সামান্য একটি কুক্কুরী। গায়ের রংটা যে তার মুখ্যত কি ছিল, তা এখন জানবার উপায় নেই। কারণ কোন এক বর্ষীয়সী রমণী অসাবধানতাবশতই হোক বা বিদ্বেষবশতই হোক তার গায়ে একবার গরম ফ্যান ফেলে দেওয়ায় তার লোমগুলো যায় উঠে আর রংটা যায় ঝল্‌সে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখন সে রংটা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে রামধনুর বর্ণসপ্তকের কোন সাম্য কষ্টকল্পনার সাহায্যেও আবিষ্কার করা দুষ্কর। পিটুলির সঙ্গে খানিকটা ভুসো ও খানিকটা চিটেগুড় মিশুলে যে রকম দেখতে হয় এ কতকটা সেই রকম।

কিন্তু কুৎসিত হ'লেও সে জীব। বাঁচবার অধিকার তার আছে এবং প্রাণীর সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম—উদরধর্ম্ম—তার পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, যার তাড়নায় সহস্র দুর্ব্যবহার মাথায় পেতে নিয়েও মানুষের দরজায় দয়ার প্রার্থী হ'য়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। কাজেই সে, যে গ্রামে জন্ম নিয়েছিল এবং যেখানে কোন গতিকে এতদিন কাটিয়ে আসছিল, সেখানকার লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিলে সে গ্রামান্তরে আবার মানুষের আশ্রয় খুঁজতেই বেরুল।

রাস্তা দিয়ে একখানা খড় বোঝাই গরুর গাড়ী যাচ্ছে দেখে সে তার পিছন পিছন চললো। দু'ধারেই খালি মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে বাব্‌লা গাছ। গরুর গাড়ীর চাকায় চাকায় আল ভাঙ্গা আঁকা বাঁকা মেঠো রাস্তা। হাওয়ায় রাস্তার ধুলো উড়ে গিয়ে কতক বা পড়ছে আশেপাশের গাছগুলোর পাতায় আর কতক বা গাড়ী চালকের নাকে মুখে। সারা দিনটা গাড়ীর পেছনে পেছনে এসে যখন সে একটা গ্রামে পৌঁছল তখন রাত্রি প্রথম যাম অতিক্রমোন্মুখ। গাঢ় অন্ধকারে গ্রামের পথ ঘাট আচ্ছন্ন, নিকটেই একটা মেটে বাড়ী দেখতে পেয়ে সে চোরের মত আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল সেখানে। পল্লীগ্রাম, সন্ধ্যার পরেই যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ীটি নিস্তব্ধ নিঝুম। সে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে একবার চারিদিক ঘুরে এলো। খিড়কির ঘাটের রাস্তায় খড়ের পালুইএর গায়ে একটা ছোট গর্ত্ত আছে। ঘর তৈরীর সময় মাটির দরকার হওয়ায় এর উৎপত্তি। পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড চাল্‌তা গাছের একটা ডাল নুয়ে পড়ে স্থানটীকে দিয়েছিল প্রচুর ছায়া ও নির্জ্জনতা। এদিকে বাড়ীর বড় একটা কেউ আসত না। এই জায়গাটাই সে তার মাথা গুঁজে থাকার পক্ষে যথেষ্ট বলে ঠিক করলে। তা ত হ'ল। এখন খাবার কি হবে! গত পরশু বৈকালে সে একজনদের বাড়ীর হেঁসেল থেকে একখানা রুটী না কি নিয়ে পালিয়ে ঘোষেদের পুকুর পাড়ে গিয়ে সবে খেতে যাচ্ছিল

এমন সময় ঘোষ-গিন্নি দেখতে পেয়ে হৈ চৈ করে উঠে। পাড়ার দুরন্ত ছেলেগুলো তারপর তার যে নাকালটাই না করলে। সেই জন্যই ত তাকে না সে গ্রাম ছাড়তে হ'ল। তারপর থেকে এখনও পর্য্যন্ত সে কিছু খাবার জোটাতে পারেনি। ক্ষিদেয় পেট তার ভীষণ ধুঁকছিল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। সে আর পারে না থাকতে। কিছু খাওয়া তার চাই-ই। রাত্রি অনেক হয়েছে। বাড়ীর লোকেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বেরলো দেখতে যদি কিছু খাবার জিনিষের সন্ধান মেলাতে পারে। আনাচ, কানাচ, ছেঁছতলা, কুলুঙ্গি, জল রাখবার জায়গা, ঢেঁকশাল, গোয়াল, আঁস্তাকুড়, আবর্জ্জনার স্তূপ, ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি, তৈলাক্ত একটা ভাঙ্গা ডেরকো, এমন কি বহু দিনের পরিত্যক্ত এক জোড়া ছেঁড়া জুতোও সে অনাঘ্রাত রাখেনি, যদি কোথাও তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ইঙ্গিত মেলে। অবশেষে সে দেখতে পেলে গোয়াল ঘরের পেছনে একটা ছোট মাটির গামলায় একটু ভাতের ফ্যান রয়েছে। নাকের সমস্তটা সে গামলার ভিতর পুরে দিয়ে নিমেষের মধ্যে ফ্যানটুকু উদরসাৎ করলে, সে রাত্রে তাকে সেইটুকু মাত্র আহার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। এর অধিক আর কিছুই সে জোটাতে পারলে না। সে তার পূর্ব্বনির্ব্বাচিত আশ্রয় স্থলটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব সকালে উঠেই সে আর একবার তার নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয়টা একটু নিবিড় ক'রে নেবার জন্যে যেমন বেরিয়েছে অমনি ভুলোর সঙ্গে তার চোখোচোখি। ভুলো এ বাড়ীর পোষা কুকুর। প্রকাণ্ড চেহারা, রংটা কটা ও হলদেতে মেশানো। কান দুটো লোটানো। ল্যাজের আধখানা কাটা। হঠাৎ এই অপরিচিত স্বজাতীয়টিকে দেখে ভুলো বিস্ময়বিজড়িত উষ্মার সহিত তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কি জানি কি মনে করে শত্রু ভাবে আক্রমণ না করে করে ফেললে ঠিক তার উল্টো। নবাগত কুকুরটির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সে তার নাসিকার দ্বারা একবার আঘ্রাণ করে নিলে, তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নখে করে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে আনন্দ প্রকাশ করে জানিয়ে দিলে যে সে তার শত্রু নয়—মিত্র। অপর কুকুরটিও যেন সে কথা বুঝতে পেরে ল্যাজ নেড়ে ভুলোকে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। এইরূপে আমাদের গল্পাংশ কুকুরীটি তার নূতন আবাস স্থলে জীবনযাত্রা সুরু করলে। পূর্ব্বের নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাকে যতদূর সম্ভব লোকের চক্ষু এড়িয়ে যেতে সচেতন করে দিত। তা হ'লেও একদিন সে লুকিয়ে গোয়াল ঘরের ভিতর ঢুকে গোবৎসের জন্য রক্ষিত ফ্যান পান করার সময়ে বাড়ির ঝি মোক্ষদা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। মোক্ষদার অনতিমধুর সম্ভাষণে ও ততোধিক তাহার অমৈত্রী আচরণে সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ ঘটনায় তার একটা মস্ত লাভ হয়ে গেল। মোক্ষদার মুখে এই ব্যাপার শুনে, বাড়ীর মেয়েরা তাকে দেখলেই "ঐ ফ্যানখাগী আসছে" বলত। পরে এই "ফ্যানখাগী" নামটা তার অপভ্রংশে "ফ্যান"এ পরিণত হ'ল। অতঃপর আমরাও তাকে ফ্যান বলেই উল্লেখ করবো। এমনি করে ফ্যানের দিনগুলো সুখে ও দুঃখে কেটে যেতে লাগল। এ বাড়ীতে তার চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর সে দেখতে তত কুৎসিত নয়। এ কথাটা কিন্তু লক্ষ্য করে প্রথম এ বাড়ীর ছোট বউ। সে একদিন ফ্যানকে দেখিয়ে তার মেজজাকে বললে, "দেখ দিদি, এটার এখন কেমন ছিরি হয়েছে।" উত্তরে মেজ বউ বললে, "তাইত দেখছি—এর যে দশা জোরই

মতন।" ছোট বউ এই রকম উত্তরের আশা করেনি। কুকুরের অবস্থা যে তার মতন হ'তে পারে সে কথাটা সে তলিয়ে দেখেনি, তা হ'লে বোধ হয় সে কখনও এ রকম কথা পাড়তে যেতো না। ফ্যানের আগেকার সেই ভয় ভয় ভাবটা গেছে। আগে আগে সে বাড়ীর বাইরে বড় রাস্তার ওপরে যেতে সাহস করত না, এখন সে বড় রাস্তার ওপরে তো যায়ই এমন কি একদিন গ্রামের হাটতলাতেও গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল। একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করেছিল এবং তার অবস্থা নিতান্তই সঙ্গীন হয়ে পড়ত যদি না হঠাৎ ভুলো সেখানে এসে উপস্থিত হ'ত। ভুলোর সে গ্রামের সারমেয়-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল খুব। সে তাদের এক রকম সর্দ্দার ছিল বললেই হয়। ভুলোর ভয়ে গ্রামের অপর কোন কুকুরই ফ্যানের উপর অত্যাচার করতে সাহস করত না। মোটের ওপর ফ্যান এখানে এসে এক রকম আছে মন্দ নয়। কিন্তু হায়, কেউ বলতে পারে না কোন দিনে কার ভাগ্যে কি লেখা আছে।

সে দিন গ্রামে যে ঘটনা ঘটল সে রকম ঘটনা এর পূর্ব্বে সেখানে কখনও ঘটে নি। প্রকাণ্ড জুতো পায়, গায়ে লাল রঙের ফতুয়া, মাথায় লাল পাগড়ী এবং হাতে ৫।৬ ফুট লম্বা মাথার দিকটা লোহা দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে কাল মত এক দীর্ঘাকার লোক হাটতলায় দেখা দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় গ্রামের যে সব বেকার কুকুরগুলো কোন অচেনা বা অদ্ভুত গোছের লোক দেখলে চীৎকার করে তাকে আক্রমণ করবার উপক্রমে নাস্তা-নাবুদ করে দেয়, সেই কুকুরের দল লোকটার পিছনে তো লাগেই নি, বরং একে দেখে কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে তারা দূরে পালাবার জন্য সন্ত্রস্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ফ্যান এই লোকটার সামনে পড়ে গেল। তার মুখের দিকে একবার চেয়েই সে ভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। লোকটাও ছুটল তার পিছন পিছন। আর একটু হ'লেই ফ্যানের মাথায় তার লাঠির অগ্রভাগ সগৌরবে অবতীর্ণ হ'ত, কিন্তু ফ্যান দ্রুত বেগে বেড়ার নীচে দিয়ে একেবারে বাড়ীর অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ায়—তা তার হয়ে উঠল না।

এই রূপে বিফলমনোরথ হয়ে লোকটা ঘুরে বাড়ীর সামনের দিকে আসতেই তার সঙ্গে গৃহস্বামী নড়ু ঘোষের দেখা। "কী খুড়ো, তুমি এখানে?" নড়ু জিজ্ঞাসা করলে তাকে। "জানইত সরকারী কাজ ভিন্ন আমি বেরুই না,"—উত্তর দিলে সে। এবং এ কথাও বললে যে, এ বাড়ীর ভিতর এই মাত্র যে মাদী কুকুরটা ঢুকেছে সেটা ক্ষ্যাপা। তাকে এখুনি বাড়ীর ভিতর থেকে বের করে দেওয়া হোক। নড়ু আশ্চর্য্য হয়ে পড়ল। ক্ষ্যাপা কুকুর। আবার তারই বাড়ীর মধ্যে। তবে কি ফ্যানটা একেবার ক্ষেপে গেছে। কি ভয়ানক কথা। না, এখুনি বিহিত করতে হবে এর। ছুটল সে বাড়ীর ভিতর হন্তদন্ত হয়ে। তার স্ত্রী তাকে ঐরকম ভাবে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে "কী হয়েছে তোমার? ও রকম করছো কেন?" নড়ু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে "কী হয়েছে?" কোথায় গেল তোমার সেই আহ্লাদী কুকুরটা? সেটা ক্ষেপে গেছে জান?" তার স্ত্রী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বললে "ক্ষেপে গেছে! সে ক্ষেপেছে, না তুমি ক্ষেপে গেছ? সে তো আমার পেছনেই বসে আছে।" সত্যি সত্যই [illegible] ভয়ে কখনও যা সে করেনি তাই করে বসেছে। সে এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত ঘরের দা[illegible] উঠতে কোন দিনই সাহস করেনি, কিন্তু আজ প্রাণের দায়ে যখন সে দৌড়ে এসে একেবারে যেখানে মেজ বৌ তার ঘরের [illegible]মনের দাওয়াটিতে মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে পা

ছড়িয়ে বিশ্রামের চেষ্টায় ছিল, সেইখানে প্রায় মেজ বৌএর কোলের কাছে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। তার তৎকালীন অবস্থা দেখে মেজ বৌয়ের মনে দয়া হ'ল, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, কোন ভীষণ অত্যাচারের তাড়নাই এই নিরীহ জীবটিকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে বাধ্য করেছে। নড়ু কুকুরটাকে তার স্ত্রীর পেছনে শুয়ে থাকতে দেখে একেবারে ভয়ে আঁৎকে চীৎকার করে বলে উঠল "মেজ বউ, মেজ বউ, শীগ্‌গির কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও। হারু খুড়ো বলেছে ওটা ক্ষেপে গেছে। তার চেয়ে কি তুমি কুকুরের বিষয় বেশী জান? সরকার থেকে তাকে ক্ষ্যাপা কুকুর ধরার জন্যে রেখেছে। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির তুমি ওখান থেকে সরে এসো।" নড়ু দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়েই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। কুকুরটার ভয়ে সে দাওয়ার উপরে উঠতে সাহস করছে না। তার স্ত্রী তার এই রকম অবস্থা দেখে না হেসে থাকতে পারলে না। সে বললে "কে সেই কুকুর-মারা হেরো বাগ্দীটা এসেছে বুঝি? আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে তার বাড়ী, আমি আর তাকে চিনি না?" নড়ু গরম হয়ে বললে "তাতে হ'য়েছে কি?" তার বউ স্বাভাবিক স্বরে বললে 'দ্যাকো, না জেনে শুনে হ্যাঁদার মত চেঁচিও না বলছি। ওর বৌয়ের সঙ্গে আমার গঙ্গাজল মাসীর সই পাতান। আমি গঙ্গাজল মাসীর মুখে শুনেছি যে, তার কাছে হেরোর বউ গল্প করেছে যে মাসে তার সোয়ামী ক্ষ্যাপা কুকুর মারতে না পারে সে মাসে তাদের পেট চলে না। তা ফি মাসেই কি আর ক্ষ্যাপা কুকুর মেলে গা—ভাল কুকুর গুলোকেই কাজেই মারতে হয়। কী অন্যায় কথা—জলজ্যান্ত কুকুরগুলোকে মেরে ফ্যালা! ওসব লোকের মুখ দেখতে আছে?" এই বলে সে সত্য সত্যই কুকুরটাকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। পাছে হারু বলে, লোকটা ও তার স্বামী কুকুরটাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। স্ত্রীর এরূপ আচরণের পর নড়ু তাকে আর কিছু বলতে সাহস করলে না। সে তার স্ত্রীর স্বভাব ভাল রকমই জানে। সে বাইরে এসে হারুকে বললে "না খুড়ো, আমার স্ত্রী কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী হলো না।" কথাটা শুনে হারু অবশ্য মোটেই খুশী হ'ল না। সে নড়ুকে নানা রকমে বুঝাতে চেষ্টা করেও যখন পারলে না, তখন একটু রেগে বললে "জান, সরকারের হুকুম ক্ষ্যাপা কুকুর মারা। আমি সরকারী চাকর, আমার কাজে বাধা দেওয়া কি ঠিক? সরকারের কানে এ খবর পেঁাছুলে তোমায় থানায় তলব করতে পারে।" নড়ু তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বললে "তবে আর তুমি রয়েছো কি করতে খুড়ো? নাও এখন তামাক খাও।" এই বলে নড়ু তার হুঁকো থেকে জ্বলন্ত ক'লকেটা নামিয়ে হারুর দিকে এগিয়ে দিলে। হারু কলকেটা তুলে নিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করবার সময় তার চক্ষু দুটি গিয়ে পড়ল নড়ুর উঠানের লাউমাচার ওপর। সেখানে নধর লাউগুলো ঝুলছে দেখে বললে "ভাইপো, তোমার ত খাসা লাউ হয়েছে। এবার আমি কিছুতেই লাউ গাছ করতে পারলুম না।" এ কথা শুনে ভাল লোক মাত্রেরই যা করা উচিত নড়ুও আমাদের তাই করলে। সে একটা লাউ ও কিছু লাউ শাক কেটে নিয়ে এসে হারুকে দিয়ে বললে "নাও খুড়ো, তুমি খেও।" এতক্ষণে হারুর মুখে যা সহজে কেউ দেখতে পায় না তাই দেখা দিল। সত্যি সত্যি হারু একগাল হেসে বললে "তা ভাইপো, বেশ! লাউটা আমি বড় ভালবাসি আর তোমার খুড়ী হচ্ছে লাউডগার যম। তা যাগ্‌গে তুমি কিছু ভেবো না—যাতে তোমায় থানায় টানায় না যেতে হয় আমি তার ব্যবস্থা

করব 'খর্ন।" এইরূপে হারু সর্দার তার সরকারী কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করল।

এই ঘটনার পর ২।৩ দিন ফ্যানকে বাড়ীর কেউ দেখতে পায়নি। মেজ বউ কুকুরটার কি হ'ল ভেবে বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠছিল, এমন সময় তার ভাশুরপো কুড়ন এসে বললে "খুড়িমা খুড়িমা, শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস। তুমি ফ্যান কোথায় গেল ফ্যান কোথায় গেল ভেবে সারা হচ্ছ। ফ্যান এদিকে কি করেছে দেখবে এস।"

কুড়ন যাই বলুক ফ্যান এমন কিছু করেনি যাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে। মেজ বৌ দেখলে গোয়ালের পিছনে একটা গলির মতন জায়গায় যেখানে আগে হাঁস থাকত সেখানে ফ্যান কুঁকড়ীশুকড়ী হয়ে শুয়ে আছে। তার কোলের কাছে একটা দুটো তিনটে, হাঁ তিনটেই ত কি সুন্দর ছানা! ছানাগুলি দেখতে ঠিক ভুলোর মত। ছানাগুলিকে দেখে মেজ বৌএর ইচ্ছা হ'ল তাদের বুকে করে নেয়, কিন্তু ফ্যান তাদের এমন করে কোলের মধ্যে নিয়ে মাই দিচ্ছে যে তার কোল থেকে ছানাগুলোকে কেড়ে নিতে মেজ বৌএর প্রাণ চাইলে না। সন্তানচ্যুতা জননীর যে কী বেদনা সে যে জানে। আজ চার মাস হ'ল তার বুক থেকে নিষ্ঠুর কাল তার সোনার শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে—সে ব্যথা যে তার এখনও মেলায় নি!

মেজ বৌকে দেখে ফ্যান লজ্জায় যেন মরে গেল। সে মাথাটি নীচু করে কেবল আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়তে লাগল। মেজ বৌ অতি যত্নে ফ্যানের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

শুধু মেজ বৌ কেন বাড়ীর ছোট বড় সকলেই এখন ফ্যানকে খুব যত্ন করতে আরম্ভ করেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার মুখের কাছে খাবার এনে দেয়। তার গায়ে ঢাকা দেবার জন্য ছেঁড়া কাপড় ও পেতে শোবার চট জোগাড় করে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা যাতে তার কোন কষ্ট না হয় সে দিকে সকলেই সচেষ্ট।

ফ্যান বোধ হয় ভাবে, অদৃষ্টের এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! সে কিছু ঠিক করতে পারে না। সে মানুষ হ'লে হয়ত ভাবত যে, এ সম্মান তার না তার মাতৃত্বের।





সম্পাদকীয়

আজ ১৯শে অক্টোবর, বাঙলা ২রা কার্ত্তিক, সপ্তমী পূজার দিন।

এই তারিখ বিশেষ করে উল্লেখ করবার আমার একটি ব্যক্তিগত কারণ আছে।

আমাদের স্কুলকলেজের আসল উদ্দেশ্য নাকি আমাদের superstition নষ্ট করা। তাই যদি হয় ত ইংরাজী শিক্ষার ফল এ ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়েছে। আমি যথেষ্ট পরিমাণে superstition-মুক্ত হলেও, দু-একটি superstition-এর বশীভূত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, ১৭ই অক্টোবর তারিখে আমি একটু অসোয়াস্তি বোধ করি,—এমন একটি খবর পাবার ভয়ে, যা শুনে আমার মন খুসী হবে না।

এবার ঘটেছেও তাই।

দুদিন আগে বড়লাট তারস্বরে ঘোষণা করেছেন যে, ইংলণ্ড ভারতবাসীদের পলিটিকালি আর এক পাও এগোতে দেবে না। এ কথা শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না।

প্রস্তুত ছিলুম না এই জন্য যে, ভেবেছিলুম আমাদের দেশের নেতাদের সঙ্গে বড়লাটের "গুফ্‌তগু"র ফলে কিছু সুফল ফলবে। লোকে আশা করেছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দিল্লী থেকে স্বরাজের চাঁদ ধরে নিয়ে আসবেন;—কিন্তু লাভের মধ্যে তিনি আর তাঁর দলবল পেয়েছেন শুধু অর্দ্ধচন্দ্র। আমি গত মাসে বলেছিলুম যে, গান্ধীজি এ-ফেরা অন্ততঃ হাতের পাঁচ রাখবেন। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, কংগ্রেসের শুধু মুখ আছে, কোনও হাত নেই।

বড়লাটের মন্তব্য সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাবের কথা কিছু বলব না; কেননা এমন কোন কথা বলতে পারিনে, যা আর পাঁচজনের কথার পুনরুক্তি হবে না। এ মন্তব্য শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, এর ফলে অনেকের চোখের ছানি কেটে গিয়েছে। ইংলণ্ড আমাদের চোখের মধ্যে পলিটিকাল জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা পুরে দিয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, ইংলণ্ড আমাদের ডিমোক্রাসি কস্মিনকালেও দেবে না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। ভাল কথা, Chamberlain কি ঘুণাক্ষরেও বলেছেন যে, তিনি ভারতবর্ষকে ডিমোক্রাসি দেবেন?—অর্থাৎ যে দেশে ডিমোক্রাসি নেই, সেই দেশে ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠা করবার

জন্ত কি তিনি প্রাণপণে জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন?—এত বড় Idealist ইংলণ্ডের জনগণ নয়,—তাদের অধিনায়কও নন।

যে দেশে ডিমোক্রাসি আগে ছিল, সে দেশের ডিমোক্রাসি ধ্বংস করে জার্ম্মাণীর অধীন করবার অনুমতি তিনি ত সেদিনই দিয়েছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ত Hitler Munich Agreement এর ফলেই অবাধে হরণ করেছে।

ভারতবর্ষের অধীনতা ইংরাজী Imperialism-এর প্রধান সম্বল। সুতরাং তাকে মুক্তি দেওয়া সে Imperialism-কে মূলে হাবাৎ করা।

Chamberlain যে ডিমোক্রাসি রক্ষার কথা বলেছেন, সে হচ্ছে ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসি, অপর কোন দেশের নয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, কেননা জার্ম্মাণী প্রবলপ্রতাপান্বিত হলে ফ্রান্সের আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স Communism ভয় করে, কারণ ফ্রান্সে বহু লোক এখন Communism-এর মতামত গ্রাহ্য করে।

ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসির স্বরূপ এই যে, ইংলণ্ডের নিজের দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র অপর সকল দেশের চাইতে বেশী Democratic এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধে Imperialist। Imperialism-এর অর্থ যাই হোক, Democracy নয়।

কিছুদিন থেকে বিদেশী ডিমোক্রাসি Totalitarian রাজপুরুষদের কোন কোন রাজ্যশাসন-প্রণালী গ্রাহ্য করেছে। কারণ শাসনকর্ত্তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে হলেই শাসিতদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করা দরকার। এই কারণে ব্রিটিশ ডিমোক্রাসি দো-মনা। সুতরাং ভারতবর্ষকে ডিমোক্রাসির পথে অগ্রসর করতে ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা যে ইতস্ততঃ করছেন, এতে আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু বিস্মিত হইনি। ইংরেজ যে উপায়ে ভারতবর্ষ করতলগত করেছেন, সেই একই উপায়ে তাকে হস্তগত রাখবেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ অবস্থায় আর পাঁচজনে যা বলছেন, আমিও তাই বলি। তবে তাঁদের কথার সঙ্গে আমার কথা যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, তা অবশ্য নয়।

কংগ্রেসের সরস্বতী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন যে, ভারতবর্ষকে এই সঙ্কটের সময় স্বরাজ্য না দিয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পলিটিকাল সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। এ কথা ঠিক নয়। ইংরাজ রাজপুরুষদের আর যে বুদ্ধিরই অভাব থাকুক, পলিটিকাল বুদ্ধির অভাব নেই। প্রমাণ—আজকে অর্দ্ধেক পৃথিবী তাঁদের শাসনাধীন।

তবে না দেবার যে সব কারণে তাঁরা দেখিয়েছেন, সে সব কথায় তাঁরা সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। আমরা ভারতবাসীরা অবশ্য নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পৃথিবীর সব দেশেই ডিমোক্রাসির আদর্শ হচ্ছে, এই সব সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও স্বদেশের লোককে পলিটিকাল হিসাবে এক করা। মানুষের যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য আছে। এ সত্ত্বেও France ও ইংলণ্ডে Democracy আছে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি থেকে জাতিকে মুক্ত করাই Democracyর অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আছে, কিন্তু কবে যে মনের মিল হবে বলা অসম্ভব। একটি মানুষ ঠিক আর একটি মানুষের মত নয়;—কস্মিনকালেও ছিল না, কস্মিনকালে হবেও না।

এ কারণে যদি ভারতবাসীদের পক্ষে আত্মবশ হওয়া অসম্ভব হয় ত পলিটিকাল মুক্তির কথা আমাদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

এ অনৈক্য অবশ্য বিরোধ নয়, কিন্তু এই সূত্রে বিরোধ সৃষ্টি করা অতি সহজ। আমরা যে ঐক্যের কল্পনা করি, তা এই অনৈক্যকে অঙ্গীকার করেই করি। কিন্তু এই অনৈক্যকে যদি মারাত্মক বিরোধ বলে ধরে নিই, তাহলে আমাদের পলিটিকাল ঐক্যের আদর্শ আকাশকুসুম মাত্র।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য থেকে আমরা মুক্ত নই। তা সত্ত্বেও বহু লোক সমাজ বলে একটা অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আর আমরাও বর্ত্তমানে একটি পলিটিকাল সমাজ গড়ে তুলতে চাচ্ছি। এ কথা ইংরাজ রাজপুরুষরা জানেন, এবং তাতে বাধা দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায়।

ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীরা যা করেছেন, তার নাম রাজনীতি। মনে রাখবেন যে, আমাদের দেশেও নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এক শাস্ত্র নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, Chamberlain-এর উক্তি স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট কথা বলা কিন্তু পলিটিসিয়ানদের ধাতে নেই। বিশেষতঃ আজকের দিনে; কারণ রাজপুরুষরাও বিশ্বমানবের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী। এর চেয়ে স্পষ্ট কথা বললে অপর জাতের কানে তা ভয়ঙ্কর বেসুরো লাগত। Hitler বর্ব্বরোচিত, সাফ সাফ কথা বলেই আজকে বিশ্বমানবের কাছে এত ঘৃণ্য হয়েছেন। হিটলার চান স্বাধীন দেশকে অধীন করতে, সুতরাং তিনি স্পষ্ট কথা বলতে বাধ্য। Chamberlain চান অধীন দেশকে অধীন রাখতে, সুতরাং তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সেকালের কথার পুনরুক্তি করাতে বাধ্য।

আমার বিশ্বাস Chamberlain-এর কথা যথেষ্ট স্পষ্ট; অস্পষ্টতা আছে শুধু আমাদের মনে।

আজ পূর্ণিমা, যদিচ পাঁজির হিসেবে কোজাগরী পূর্ণিমা গতকল্যের সঙ্গেই গত হয়েছে।

আজ কাগজে দেখছি যে, মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উক্তি যথেষ্ট স্পষ্ট। সে উক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে "না"। অর্থাৎ কংগ্রেস যা চায়, ইংরাজ রাজমন্ত্রীরা তা দিতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেছেন যে, যার নাম Dominion Status, তারই নাম Independence। বাঢ়ং! তবে এ যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা আমরাও জানিনে, ইংরাজরাও জানেন না। তাঁরাও যে জানেন না, তার প্রমাণ ইংরাজ দার্শনিক Joad সম্প্রতি লিখেছেন যে, "The mind operates in a vacuum of complete nescience."

শেষের কথা থাক্, ইংরাজ ও জার্ম্মাণে কি যুদ্ধ আরম্ভই হয়েছে? পোলাণ্ড অবশ্য ধ্বংস হয়েছে; এবং সে দেশের গর্ভে যে গুপ্তধন আছে (petrol) তা জার্ম্মাণী ও রুসিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কিন্তু পোলাণ্ডের অধিবাসীদের কেউ রক্ষা করতে অগ্রসর হননি। যুদ্ধের যখন এই অবস্থা, তখন ভবিষ্যৎ শুধু জ্ঞানের নয়, কল্পনারও বহির্ভূত। তারপর ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তারা বলেছেন যে, ইতিমধ্যে ভারতবাসীরা যদি Majority ও Minority-র মিলনসাধন করেত পারে, তাহলে তাদের

Democracy দেওয়া যাবে। পলিটিক্স্ ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অথচ হিন্দু মুসলমান পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অভেদাত্মা হয়ে যাবে—এটা কি একটা অদ্ভুত কথা নয়?

যখন সমগ্র জাতির উপর দেশের শাসন-সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্ত্তাবে, তখন এ-দুই দলের ভিতর Minority ও Majority-র বিরোধ থাকবে না।—এই বিশ্বাসের উপরেই সকল দেশে Democracy দাঁড়িয়ে আছে।

সুতরাং Congress যে Council-এর মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করবার সংকল্প করেছেন—সেই সংকল্পই হচ্ছে কাজের কথা।

ইংলণ্ড বর্ত্তমানে ভারতবাসীদের moral support চান। কিন্তু রাজ্যশাসন হতে আলগা হওয়াতেই প্রমাণ হবে যে, কংগ্রেস সে moral support দিতে পারবে না; যদিও আমরা সকলেই হিটলারের ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

যদি moral support-এর কোন অর্থ থাকে, Chamberlain-এর মন্ত্রিসভা এ ক্ষেত্রে তা লাভ করতে পারেন না।

এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতার কাছে আমাদের আরজি এই—

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৩।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত